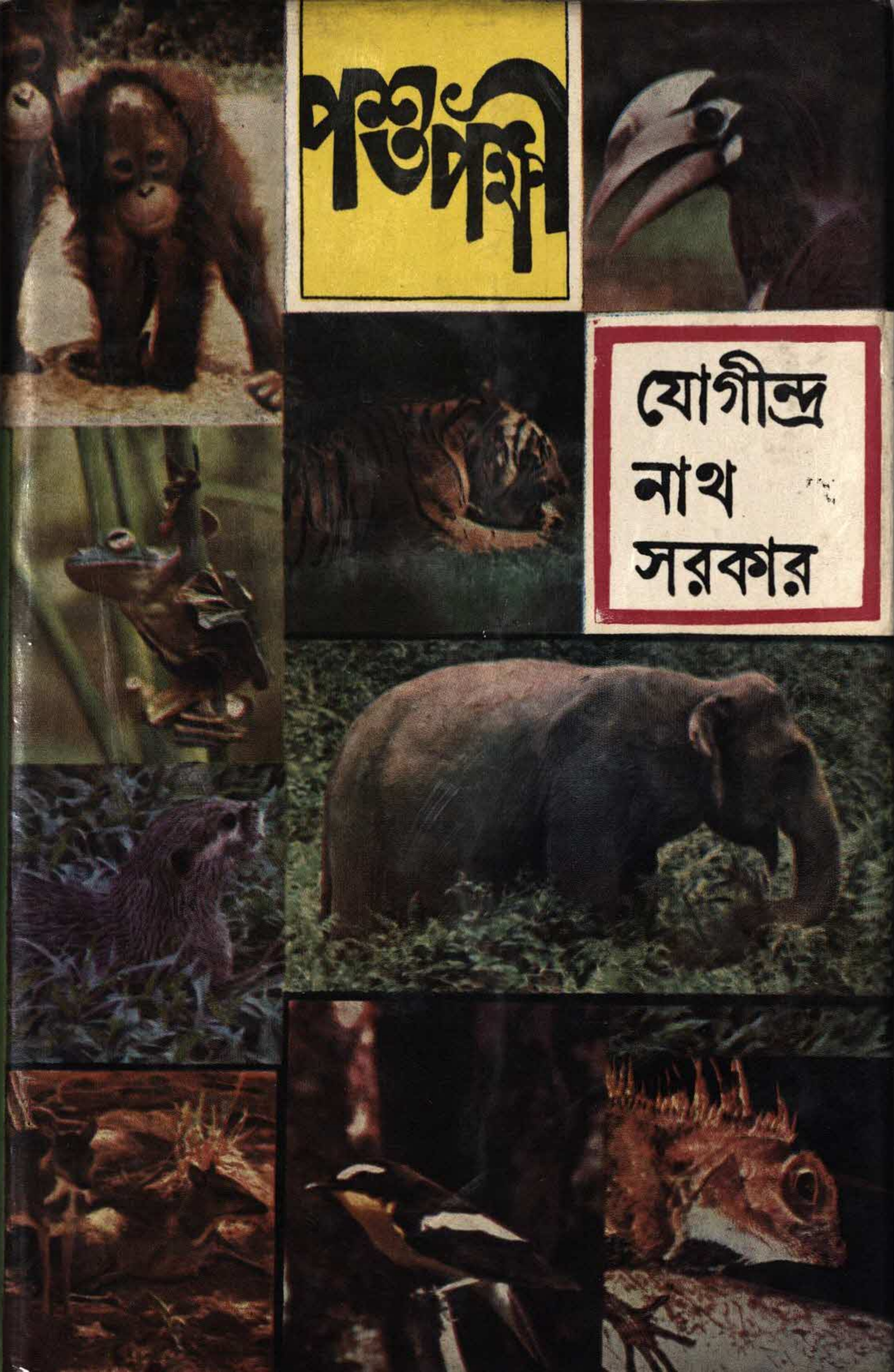


পশুপক্ষী

যোগীন্দ্র নাথ সরকার

পশু-পক্ষী



প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'পশু-পক্ষী' প্রকাশিত হইল। Royal Natural History, Cassell's Concise Natural History, Wood's Popular Natural History, Smith's World of Animal Life, W. F. Kirby's Mammals of the World প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রায় রামব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুর প্রণীত Hours with Nature, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'জীবজন্তু' হইতেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অশেষ যত্ন সহকারে ইহার বিষয় ও ভাষার নানা ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাকে যারপরনাই উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য ইহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি — যোগীন্দ্রনাথ সরকার

পঞ্চম সংস্করণের ভুমিকা

যে বইটি পড়ে ছোট বেলায় আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুধীন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক সেই 'পশু-পক্ষী' বইটিকে দেখে দেবার ভার যখন পেলাম, তখন প্রাণে সত্যিই বড় আনন্দ হল।

বইখানি আজ প্রায় ২০ বছর হল ছাপা নেই। লেখাও হয়েছিল ৪০ বছর আগে। ইতিমধ্যে জীবজগতে শ্রেণীবিচারে ও তথ্যে অনেক কিছুই রদবদল হয়ে গেছে। দেখতে গিয়ে বারে বারে একটি কথাই কেবল মনে হয়েছে যে, এই বইখানি লিখতে শ্রদ্ধেয় ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার-মহাশয় কতখানি শ্রম স্বীকার করে তবে এই অমূল্য সম্পদ বাঙলার শিশু-বুড়ো সবার হাতে তুলে দিয়েছেন। যতদূর সম্ভব মূল বজায় রেখে বইখানিকে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ করতে চেষ্টা করেছি।

পশু-পক্ষী সম্বন্ধে সাধারণত বাঙ্গালীর দৌড় খুবই অল্প—বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, গাধা, আর কাক, চিল, চড়াই, শালিক পর্যন্ত। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বালক-বালিকাদের প্রশ্নে ও অনুসন্ধিৎসায় অভিভাবকদের বিব্রত হতে দেখেছি। শিশুদের সঙ্গে তাঁদেরও এই বই থেকে কিছু কম উপকার হবে না। বইখানি ঘরে ঘরে আদৃত হলে তবেই শিশুসাহিত্যের অগ্রদূত ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার-মহাশয়ের স্মৃতি অটুট হয়ে থাকবে বাঙ্গালীর মনে। শ্রেণীবিচার, পুরাতন ও নূতন, দুয়েরই সমাবেশ রেখেছি ইচ্ছে করেই, যাদের জন্যে বইখানি লেখা কেবল তাদের বোঝার সুবিধের জন্য। ল্যাটিন, ইংরিজি ও হিন্দি নাম ও শব্দ ব্যবহার করেছি বয়স্ক ও অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক যোগানো হিসেবে।

পুরাতন সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে ৪০ পৃষ্ঠা বাড়ল এবং শ্রেণীবিচারের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কিছু নতুন পশু-পক্ষীর নামেরও সমাবেশ করা হল। ছাপা এবং অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু ভুল রয়ে গেল; তার জন্য মার্জনা চেয়ে রাখলাম। —অজয় হোম

শিশুবর্ষে গৃহীত
পরিকল্পনার
৪৪তম গ্রন্থ
পশুপক্ষী

প্রথম প্রকাশ
১৩১২
শৈব্যা সংস্করণ
১৩৮৭

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রকাশক :
শ্রীরবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অসীম দে
প্রিন্টএণ্ড ব্লক
কনসার্ন
২৮ বি. টি রোড
কলি—২

পশু পক্ষী



যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত

শ্রীঅজয় হোম কর্তৃক পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ



যে চিরকালের রহস্যময় প্রাকৃতিক জগতে মানুষ আর পশুপাখির জন্ম সেই জগৎ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল চিরকালের। কিন্তু পশুপাখির সম্পর্কে বয়স্ক মানুষের কৌতূহল একরকম, ছোটদের কৌতূহল আর একরকম। প্রকৃতির অন্দর মহল থেকে যে বিচিত্র চেহারা, হাবভাব, রংবাহার, বীভৎস হিংস্রতা বা কমনীয় কারুণ্য নিয়ে পশুপাখিরা বেরিয়ে আসে তাদের সঙ্গে ছোটদের সম্পর্ক দারুণ রোমাঞ্চকর। ছোটদের কাছে এই পশুপাখিদের কেউ কেউ মানুষের মতোই সহজ, কেউ কেউ ভয়ংকর বা রঙীন কল্পনার উত্তেজক। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত ছোটদের কাছে এই বিরাট পশুপাখির জগৎ বিশেষ-ভাবেই পাঠ্য বইএর বাইরের জগৎ ছিল। পশুপাখির সম্পর্কে ছোটবেলাকার কৌতূহল যে ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক এমনকি পুরাতাত্ত্বিক তৈরি করতে পারে এই সহজ সত্যটা আমাদের মাথায় ছিল না। সামান্য দুচারটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু বনজঙ্গল পশুপাখির খবর থাকতো। বড় শহরে বা মফস্বলের কোনো শিশুর হাতে হঠাৎ কখনো প্রদীপ, সন্দেশ, সখা বা মুকুলের মতো পত্রিকার এক আধটি সংখ্যা আসতো। কিংবা ওই জাতীয় এক আধটা বই বেরোলে তাই হাতে হাতে ঘুরতো। পাঠ্য বইএর বাইরের ব্যাপার বলে কোনো ক্ষিপ্ত অবিভাবকের তর্জনী শাসনে অনেক সময় এই জাতীয় বই অনাদরে অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতো, হারিয়ে যেতো। গত শতাব্দীর কেউ কেউ এই রকম অপাঠ্য কেতাব লিখে ছোটদের মন ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন প্রাকৃতিক জগতে পশুপাখিদের পাড়ায়। পশ্বাবলির মতো পত্রিকা বেরিয়েছিল। পশুপাখি জীবজন্তুদের হাবভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো মনীষীরাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই শতাব্দীতে যিনি প্রথম সচিত্র বই লিখে পশুপাখির দিকে ছোটদের মন ফেরাতে চেয়েছিলেন তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার।



পশুপাখির আচার ব্যবহার সম্পর্কে কৌতুহল এখনকার ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিক পাঠ্যবিষয়ই মেটায়। এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সূচনা তো এই যোগীন্দ্রনাথই করেছিলেন এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে। কাজেই পশুপাখি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক চর্চার দেশীয় চেষ্টার সূচনা সূত্রে যোগীন্দ্রনাথই এই শতাব্দীর প্রথম স্মরণীয় নাম। পশু-পাখির পরিচয় সূত্রে প্রকৃতির সাড়াশব্দ যোগীন্দ্রনাথ যেমন নিখুঁত ও বিচিত্রভাবে শুনেছেন তেমনিভাবেই পরিবেশন করেছেন।

'পশুপক্ষী' বইটিতে যোগীন্দ্রনাথ বিদেশী পশুপরিচায়ক বিভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই থেকে সহজ ঝরঝরে বাঙলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্তু-জানোয়ারের স্বভাবচরিত্র আকার প্রকারের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন—পশু জগতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বর্গ অনুযায়ী। সমস্ত পৃথিবীর জীব-জন্তুর বিভিন্ন বর্গ ও বর্গের মধ্যেকার বৈচিত্র্যগুলিকে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাঘ ভালুক সিংহ থেকে শুরু করে কীট পতঙ্গের পরিচয় তো ছিলই তার সঙ্গে ছিল দুর্লভ কিছু প্রজাতির পরিচয়—চাক্‌মা বেবুন, বাঘডাঁস, সিংহ-বাঁদর, লেপার্ড, সীল, চিঞ্চিলাস, হংস-ছুছুন্দরী, কেরানী-শকুন, ইত্যাদি। তেমনি মজাদার বাঙলা নামের কিছু প্রাণী—তিলে ঘুঘু, রামঘুঘু, ঠুকঠুকিয়ার কথা।

'পশুপক্ষী' বইখানি আবার ছেপে বেরোলো। বইটিতে সে আমলের সেইসব চেনা-অচেনা পশুপাখির পরিচয় তো আছেই সেই সঙ্গে তাদের ছবি বহুবর্ণ অফসেটে ছেপে আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে পরিবেশন করা হলো। আশা করা যায়, যে পশুপাখির কথা ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের বইতে পড়ছে তাদের কাছে অনেককালের এই পুরোনো বই সমান নিখুঁত, রঙীন ও বৈজ্ঞানিক বলেই মনে হবে। আর যেসব বাবা-মার মধ্যে সেই অসাধারণ ছেলেবেলাটি আজও হারায়নি তাঁরাও খুশি হবেন।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গভাষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



"ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্যরস পরিবেশনের এক আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করে যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা শিশুসাহিত্য রচনায় পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ প্রণীত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যা ৪৪। 'পশুপক্ষী' ও 'বনেজঙ্গলে' তাঁর সঙ্কলিত অন্যতম কিশোর ক্লাসিক্‌স্। যোগীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত সচিত্র 'হাসি ও খেলা' গ্রন্থটিই বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম শিশুসাহিত্য।"

* * *

"হাসি ও খেলা বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালাভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্যে যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণ উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণে উপকার হয় না।......আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা বাঙালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।...বইখানি সঙ্কলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের ও শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।..."

(সাধনা, ফাল্গুন, ১৩০১)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

পশু

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাণিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : দন্ত পরিচয়	১—৩
বানরবর্গ	
বনমানুষ, গিবন, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংউটান	৪—১১
হনুমান, নাকেশ্বর হনুমান, সাদা হনুমান	১১—১৩
মর্কট বা বাঁদর, এশিয়ার মর্কট, বনেট মাঙ্কি, সিংহ বাঁদর বা নীল বাঁদর, আফ্রিকার মর্কট, মোনা, ডায়না	১৩—১৫
বেবুন, হলদে বেবুন, গিলেডা বেবুন, চাক্‌মা বেবুন, ম্যানড্রিল, ড্রিল	১৫—১৮
আমেরিকার বানর, সাপাজু, মাকড়সা বানর, মারমোসেট্, লিমারাদি, লাজুক বানর, উড়ো লিমার	১৮—২০
করপক্ষবর্গ	২০
বাদুড়, চামচিকা, ফলাহারী বাদুড়, ভ্যাম্পায়ার	২১—২৩
কীটভুকবর্গ	
ছুঁচা বা ছুছুন্দর, মোল, কাঁটচুয়া, গেছো-ছুঁচা	২৩—২৫
মাংসাশীবর্গ	
ভল্লুকাদি, মেটে ভালুক, কালো ভালুক, হিমালয়ের কালো ভালুক, আমেরিকার কালো ভালুক, ভারতবর্ষীয় ভালুক, গ্রিজ্‌লি ভালুক, সাদা ভালুক	২৫—৩১
রেকুন বংশ, কিংকাজু, কোয়াটি, পাণ্ডা	৩১—৩২
উদ্বিড়াল বংশ, গেছো নেউল, মার্টেন, সেবল, আর্‌মাইন, উইসেল, ব্যাজার বা ভালু শূয়ার, গ্লটন, মধুভুক, উদ্বিড়াল	৩২—৩৬
বিড়ালাদি, সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, কালো চিতাবাঘ, সাদা চিতাবাঘ, জ্যাগুয়ার, পুমা, বিড়াল, বনবিড়াল, গৃহপালিত বিড়াল, মেছো বিড়াল, কাবুলি ও এঙ্গোরা বিড়াল, লিঙ্কস্, তিব্বতীয় লিঙ্কস্, শিকারী চিতা	৩৬—৪৯
হায়না, ডোরদার হায়না, চিতা হায়না	৪৯—৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
নকুলাদি, বাঘডাঁস, খট্টাস, সড়েল বা ভাম, বেজী, কাঁকড়াখেকো বেজী	৫০—৫৩
কুকুরাদি, নেকড়ে বাঘ, ইউরোপের নেকড়ে, শিয়াল, বন্য কুকুর, ডিঙ্গো, সাইবিরিয়ার বন্যকুকুর, গৃহপালিত কুকুর, এ্যালসেসিয়ান, স্প্যানিয়াল, নিউফাউণ্ড্‌লাণ্ড কুকুর, সেণ্ট্‌বার্ণাড্‌ কুকুর, গ্রে হাউণ্ড্‌ বা ডালকুত্তা, ব্লাড্‌ হাউণ্ড্‌, ম্যাষ্টিফ বুলডগ্‌, টেরিয়ার, মেষরক্ষক কুকুর, এস্কিমো কুকুর, খেঁকশিয়াল, ডেজার্ট ফক্স, ফেনেক খেঁকশিয়াল	৫৩—৬৩
সীলবংশ, কর্ণহীন সীল, লেপার্ড সীল, হস্তী সীল, কর্ণযুক্ত সীল, সিন্ধু সিংহ, সিন্ধু ভল্লুক, সিন্ধু ঘোটক	৬৪—৬৬
তিমিবর্গ	
তিমি, দন্তহীন তিমি, গ্রীন্‌ল্যাণ্ডদেশীয় তিমি, দন্তবিশিষ্ট তিমি, শিশুক, সামুদ্রিক শিশুক বা নারহোয়াল, ডলফিন, ক্যাচেলট, অন্ধ শিশুক	
সিন্ধুগব বংশ, মানাটি বা সমুদ্রের গরু, ডুগং,	৬৬—৭১
তীক্ষ্ণ-দন্তবর্গ	
কাঠবিড়াল, উড়ো কাঠবিড়াল	৭১—৭৩
বীবর	৭৩—৭৪
ইঁদুর, ঘোরো ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, জোলো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর	৭৪—৭৫
জারবোয়া, লাফানো ইঁদুর	৭৫
সজারু, চিঞ্চিলাস, ক্যাপিবরা	৭৫—৭৬
খরগোস, দীর্ঘকর্ণ খরগোস, হিসপিড্‌ হেয়ার, পাইকা	৭৭—৭৮
শুণ্ডধারীবর্গ	
হাতী, ভারতবর্ষীয় হাতী, আফ্রিকাদেশীয় হাতী	৭৮—৮১
সশফ বা খুরীবর্গ	
অযুগ্মখুর ঃ	
ঘোটকাদি, ওয়েলার, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, শিকারী ঘোড়া, আরবদেশীয় ঘোড়া, সেট্‌ল্যাণ্ড টাট্টু, ব্রহ্মদেশীয়	

বিষয়	পৃষ্ঠা
টাট্টু, এশিয়ার বুনো ঘোড়া, গাধা, কিয়াং, ঘোড়খুর, পারস্যের বুনো গাধা, জেব্রা, কোয়াগা	৮১—৮৫
টেপির	৮৬
গণ্ডার, কালো গণ্ডার, আফ্রিকার গণ্ডার, শ্বেত গণ্ডার	৮৭—৮৯
যুগ্মখুর অরোমন্থক	
শূকর, বুনো শূয়র, ইউরোপের বুনো শূয়র, বেঁটে শূয়র, পেকারী	৮৯—৯১
জলহস্তী, বেঁটে জলহস্তী	৯১—৯৩
ঘোড়খুর : রোমন্থক	
গবাদি, গরু, গৌর বা গেরী গাই, গয়াল বা মিথুন, চমরী মহিষ, বন্যমহিষ, বাইসন, কস্তুরী বৃষ	৯৩—৯৯
ছাগাদি, ভেড়া, দুম্বা ভেড়া, বার্বারি ভেড়া, আর্গালি ভেড়া, মেরিণো	৯৯—১০০
ছাগগোষ্ঠী, এঙ্গোরা, রামছাগল, মার্খোর, আইবেক্স, টাহ্র, নীলগিরির বন্যছাগল, গোরাল, শ্যাময়	১০০—১০৪
অ্যান্টিলোপ বা কৃষ্ণসারাদি, ইহু, কৃষ্ণসার, গ্যাজেল বা কুরঙ্গ স্প্রিং বাক, জেমসবাক্, কুডু, ইংল্যাণ্ডচৌশিঙ্গা, নীলগাই	১০৪—১১১
হরিণাদি : কস্তুরীমৃগ, রেডডিয়ার বা লাল হরিণ, হেঙ্গুল কাকার, সম্বর, চিতা হরিণ, এল্ক, মৃজ, বল্গা হরিণ ক্যারিবু	১১১—১১৭
উষ্ট্রাদি, আরবী উট, তিব্বতী উট, লামা, আলপাকা	১১৭—১২০
জিরাফ	১২১—১২২
অদন্তবর্গ	
শ্লথ	১২২—১২৩
পিপীলিকাভুক, আমেরিকার পিপীলিকাভুক, বনরুই	১২৩—১২৫
আর্মাডিলো	১২৫
দ্বিগর্ভবর্গ	
ক্যাঙ্গারু : ওয়ালাবী	১২৫—১২৮
কোয়ালা	১২৮—১২৯

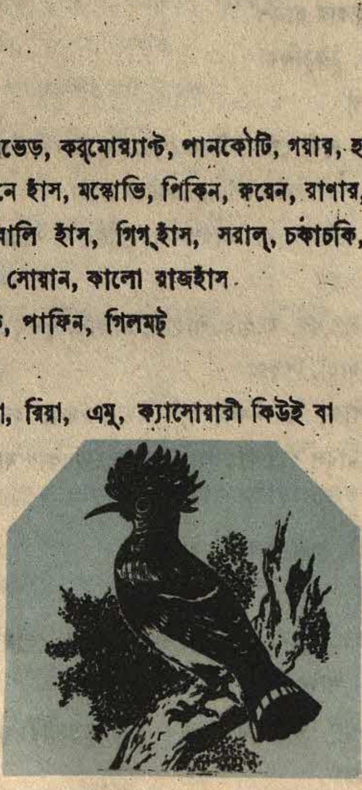
বিষয়	পৃষ্ঠা
অপোসম, উড়ো অপোসম	১২৯—১৩০
ডিম্বপ্রসবকারী বর্গ	
হংস-ছুছুন্দরী	১৩১—১৩১

পক্ষী

পক্ষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পক্ষীর পূর্বপুরুষ	১৩১—১৩৪
দণ্ডচারীবর্গ	
বায়সাদি, পাতিকাক, দাঁড়কাক, জ্যাকৃড, ডোমকাক ম্যাগপাই, নীলকান্ত, হাঁড়িচাচা, নন্দন পক্ষী, বাওয়ার বার্ড, মালী বাওয়ার বার্ড, স্যাটিন বাওয়ার বার্ড	১৩৪—১৪০
ছাতারিয়া বা সাতভাই, গোলাব চসম্	১৪০—১৪১
বুলবুলি, সবুজ বুলবুলি, হারেয়া, ফটিকজল, কালো বুলবুলি, সিপাহি বুলবুলি	১৪১—১৪২
নাইটিঙ্গেল, পারস্যদেশীয় নাইটিঙ্গেল	১৪২—১৪৩
দোয়েল আদি, দোয়েল, শ্যামা	১৪৩—১৪৫
থ াস, গায়ক থ াস, দাঁমা, অনুকারী পক্ষী, লায়ার পাখী	১৪৫—১৪৮
সদাসোহাগী, আমেরিকার সদাসোহাগী, শাঁ বুলবুলি, নীল কট্‌কটিয়া	১৪৮—১৫০
ফিঙ্গা আদি, ফিঙে, ভীমরাজ, কৃষ্ণরাজ বা কেশরাজ	১৫০—১৫২
টুনটুনি, রেন্	১৫২—১৫৩
ওরিওল বা হলদে পাখী, কালোগলা ওরিওল, মেরুণ ওরিওল, গোল্ডেন ওরিওল, গৃহস্থের খোকা হোক্ বা বেনেবৌ	১৫৩—১৫৫
ময়না, রূপাকানী, সোনাকানী, ভাট শালিক গাং শালিক, গো শালিক	১৫৬—১৫৮
বাবুই আদি, বাবুই, মুনিয়া, নকলনুর, শাঁখারি মুনিয়া, তেলে মুনিয়া, সর মুনিয়া, লাল মুনিয়া, চড়াই, ক্যানারি	১৫৮—১৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাতক, মার্টিন, নাকুটি, তাল চাটা	১৬২—১৬৪
হামিং বার্ড, মধুপায়ী, ফ্লাওয়ার পেকার	১৬৪—১৬৫
খঞ্জন	১৬৫—১৬৭
ভরত পাখী, চণ্ডুল, বাগেরী, আগ্‌গিন	১৬৭—১৬৮
কাঠ-ঠোক্‌রা, বসন্ত বউরি, বড় বসন্ত বউরি	১৬৮—১৭০
বৌ কথা কও, পাপিয়া, কোকিল	১৭০—১৭৩
শুক আদি, টিয়া, চন্দনা, কাজ্‌লা, ফুলটুসী, মদনা, ফৈরিদি, ম্যাক, ধূসর তোতা, কাকাতুয়া, লাল মোহন, হীরা মোহন, লাভ বার্ড, লটকন, বদরিকা	১৭৩—১৭৭
নীলকণ্ঠ	১৭৭—১৭৮
মাছরাঙা, ছোট মাছরাঙা, সাদা বুক মাছরাঙা, ফুট্‌কি মাছরাঙা	১৭৮—১৭৯
ধনেশ, আফ্রিকার ধনেশ	১৭৯—১৮০
টুকান, হুপো, ঠুকঠুকিয়া	১৮১—১৮৩
মাংসাশীবর্গ	
পেচক আদি, লক্ষ্মী পেঁচা, ঈগল পেঁচা, ঝুঁটিধারী ঈগল পেঁচা, হুতুম পেঁচা, কাল পেঁচা, কোটরে পেঁচা	১৮৩—১৮৭
শকুন আদি, বাজ শকুন, ভারতবর্ষীয় শকুন বা সাধারণ শকুন, সাদা শকুন	১৮৭—১৯০
বাজ আদি, লগ্‌গর, বহেরি, শাহনি, শ্যাকার, তুরম্‌তী, ধুতি, পোকামারা, শিক্‌রে	১৯০—১৯২
ঈগল, তিলেবাজ, স্বর্ণ ঈগল, ইম্পিরিয়াল ঈগল, হার্পি ঈগল, মাছ মৌরল বা কোড়াল, উত্তর আমেরিকার মাছ মৌরল	১৯২—১৯৬
চিল, কাপাসী, শঙ্খ চিল, গোদা চিল	১৯৬—১৯৮
কপোতবর্গ	
হরিয়াল, পায়রা, বুনো পায়রা, পোষা পায়রা, হোমার দেশভ্রমণকারী পায়রা	১৯৮—২০০
ঘুঘু, তিলে ঘুঘু, রাম ঘুঘু, শ্যাম ঘুঘু, চূড়াধারী ঘুঘু, নিকোবর পায়রা	২০০—২০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ষকবর্গ	
ময়ূর	২০২—২০৩
ফেঝ্যান্ট, স্বর্ণ ফেঝ্যান্ট, কালিজ ফেঝ্যান্ট, মুরগী, বন মুরগী, গৃহপালিত মুরগী, লাল ও ধূসর-বন মুরগী	২০৩—২০৬
তিতির, কালো তিতির, বটের, পিয়র্জা, লোয়া, গিনি ফাউল, টার্কি বা পেরু	২০৬—২০৯
দীর্ঘজঙ্ঘবর্গ	
ডাহুক, পানমোরগ, কায়েম, জল পিপি, জল ময়ূর স্নাইপ বা কাদাখোচা, খৈরি	২০৯—২১২
সারস, ষ্টর্ক, হাড়গিলা, মাণিকজোড়, জাংহিল, আইবিস, সাদা আইবিস, কালো আইবিস, সবুজ আইবিস, লাল আইবিস	২১৩—২১৬
বড় বক বা কাঁক্, লাল কাঁক্, গো বকা, বক, বাচকা কানঠুঁটি	২১৬—২২০
সন্তরকবর্গ	
অ্যাল্বাট্রস্	২২০—২২৫
গাং চিল, গগনভেড়, করমোর‍্যান্ট, পানকৌটি, গয়ার, হংস পাতিহাঁস, চিনে হাঁস, মস্কোভি, পিকিন, রুয়েন, রাণার, বুনো হাঁস, বালি হাঁস, গিগ্‌হাঁস, সরাল্, চকাচকি, রাজহংস, সাদা সোয়ান, কালো রাজহাঁস	২২৫—২২৮
পেঙ্গুইন, অক, পাফিন, গিলমট্	২২৮—২৩০
ধাবকবর্গ	
উটপাখী, মোয়া, রিয়া, এমু, ক্যাসোয়ারী কিউই বা আপটেরিক্স	২৩০—২৩৬



পশু-পক্ষী

—···:০*০:···—

প্রাণিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তোমাদের মধ্যে যাহারা মাছ ও চিংড়ি খাও, তাহারা একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। মাছের শরীরে কাঁটা অর্থাৎ হাড় আছে, কিন্তু চিংড়ির তাহা নাই। মাছও এক রকম প্রাণী, চিংড়িও এক রকম প্রাণী; অথচ একটির হাড় আছে, অন্যটির তাহা নাই। এইরূপ কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, পাখী, সাপ, ব্যাঙ, প্রভৃতির শরীর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের সকলেরই হাড় আছে; কিন্তু মশা মাছি, পিঁপড়া, ফড়িং, কেঁচো, শামুক প্রভৃতির শরীরে হাড়ের কোন চিহ্নই নাই। এখন বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, পৃথিবীতে যত রকম জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে মোটামুটি দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের শরীরে অস্থি অর্থাৎ হাড় আছে, আর এক দলের তাহা নাই।

সম্প্রতি আমরা কেবল হাড়ওয়ালা জন্তুদিগের কথাই বলিব। ইহাদের সকলেরই পিঠে লম্বালম্বি একটা অস্থিমালা থাকে; উহা অনেকগুলি ছোট ছোট অস্থিখণ্ডে গ্রথিত। ঐ অস্থি-মালার নাম **মেরুদণ্ড** বা পিঠের দাঁড়া। যে কোন জন্তুর দেহে হাড় আছে তাহারই এই মেরুদণ্ড আছে; আর যাহার হাড় নাই, তাহার মেরুদণ্ডও নাই। সুতরাং জন্তুগণের এক দলকে **মেরুদণ্ডবিশিষ্ট** এবং অপর দলকে **মেরুদণ্ডহীন** বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে—

কাহারও কাহারও একেবারে ছানা হয়; আর সেই ছানা শৈশবে কেবল মায়ের স্তনের দুগ্ধ পান করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। ইহাদিগকে **স্তন্যপায়ী** বলে। যেমন :—মানুষ বানর, কুকুর, বিড়াল, বাঘ ভালুক, গরু, ছাগল বাদুড়, তিমি প্রভৃতি।

কোন কোনটার সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। ইহাদের একেবারে ছানা হয় না; প্রথমে ডিম হয়, পরে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগকে **পক্ষী** বলে। যেমন :—কাক, চিল, শালিক, ময়না, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি।

কোন কোনটা বুকে ভর দিয়া চলে। ইহারাও পাখীদের মত ডিম পাড়ে। পরে সেই ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ইহাদিগকে **সরীসৃপ** বলে। যেমন :—টিক্‌টিকি, কুমীর, সাপ, গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি।

কোন কোনটা নিতান্ত ছোটবেলা মাছের মত জলের মধ্যে বাস করে এবং মাছেরই মত ফুল্‌কা দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে; কিন্তু কিছুকাল পরে ইহাদের আকার একেবারে বদলাইয়া যায়; তখন ফুস্‌ফুস্ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাদিগকে **উভচর** বলে। যেমন :—ব্যাঙ, নিউট্

কোন কোনটা বরাবর জলেই বাস করে। জল ছাড়া বেশীক্ষণ বাঁচে না। ইহাদের কানকুয়ার নীচে লাল রঙের ফুল্‌কা থাকে। সেই ফুল্‌কা দিয়াই ইহারা জলের মধ্যে নিশ্বাস গ্রহণ করে। ইহাদিগকে **মৎস্য** বলে। যেমন :—রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি।

১। **স্তন্যপায়ী** ২। **পক্ষী** ৩। **সরীসৃপ।** ৪। **উভচর** ৫। **মৎস্য।**

এই পুস্তকে কেবল 'স্তন্যপায়ী' ও 'পক্ষী'র কথাই বলিব। স্তন্যপায়ীর সাধারণ লক্ষণ এই,—ইহাদের সকলেরই শরীরে অল্পাধিক লোম থাকে; গায়ের রক্ত গরম; হৃদপিণ্ড চারি কোটরবিশিষ্ট; একেবারে ছানা হয়; আর সেই ছানা শৈশবে মায়ের স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করে। ফুস্‌ফুস্ দ্বারা ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পক্ষীর সাধারণ লক্ষণ পরে বলিব।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানুষের আসন সকলের উপরে, কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে এই পুস্তকে কোন কথাই বলা হইবে না। কেবল জানিয়া রাখ, জীব-বিজ্ঞানে মানুষ ও বানরের একটা যোগ আছে। কিন্তু যোগটা কোথায় এবং ক্রমবিকাশের পথে কোন্ স্তরে কখন্ যে মানুষ বানর হইতে আলাদা হইয়া গেল, সে কথা কেহ বলিতে পারে না। পুরাতন মরচে পড়া শিকলের কয়েকটি মাত্র যোগসূত্র আমাদের জানা আছে, যাহাদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষ ও বানরের ন্যায় জন্তুরা পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে উপস্থিত অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছে।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুগণকে এই পুস্তকে মোটামুটি ১১ ভাগ বা **বর্গে** বিভক্ত করিব। নানা বংশ, নানা জাতির কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা এই একটি পুস্তকে কখনই সম্ভব নয়। প্রথম পরিচয়ের পক্ষে ইহার বেশী জানিবার এখন প্রয়োজন নাই।

১। বানর—বনমানুষ, হনুমান্, মর্কট প্রভৃতি
২। করপক্ষ—বাদুড়, চামচিকা প্রভৃতি।
৩। কীটভুক্—ছুঁচা, মোল, কাঁটাচুয়া প্রভৃতি।
৪। মাংসাশী—বাঘ, সিংহ, ভালুক, কুকুর, বেজী, সীল প্রভৃতি।
৫। তিমি— তিমি, শিশুক, ম্যানিটি, ডুগং প্রভৃতি।
৬। তীক্ষ্ণদন্ত—ইঁদুর, বীবর, খরগোস্, কাঠবিড়াল প্রভৃতি।
৭। শুণ্ডধারী—হাতী প্রভৃতি।
৮। **সশফ**—ছাগল, ভেড়া, গরু, হরিণ, ঘোড়া, গণ্ডার প্রভৃতি।
৯। অদন্ত—শ্লথ, পিপীলিকাভুক্ প্রভৃতি।
১০। দ্বিগর্ভ—ক্যাঙ্গারু, অপোসম্ প্রভৃতি।
১১। ডিম্বপ্রসবকারী—হংস-ছুছুন্দরী প্রভৃতি।

ইহাদের প্রত্যেক বর্গের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ তোমরা ক্রমে জানিতে পারিবে।

দন্ত-পরিচয়

(কুকুরের মুখ)



জন্তুদিগের উপর ও নীচের মাঢ়ীতে যে যে প্রকার দন্ত থাকে, এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

১। **ছেদন-দন্ত**—ইহা মুখের সম্মুখের দিকে থাকে। খাদ্যবস্তু ছেদন বা কর্ত্তন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। **চর্ব্বণ-দন্ত**—ইহা দুই কসে থাকে। খাদ্যদ্রব্য পেষণ বা চর্ব্বণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩। **শ্ব-দন্ত বা কুকুরে-দাঁত**—ইহা আকারে লম্বা ও ছুঁচল। খাদ্যবস্তু ফুঁড়িবার বা বিদীর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই সকল দাঁত কুকুরের মুখের ছবি দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বানরবর্গ

এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এই তিন মহাদেশ বানরের জন্মস্থান। ইউরোপে কেবল জিব্রাল্টারে এবং উহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় বানর নাই।

বানর নানা রকমের হইয়া থাকে। মানুষের চাইতে উঁচু এত বড় বানরও আছে, আবার আমাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের উপর বসিয়া থাকিতে পারে, এত

ছোট বানরও আছে। ইহাদের কোন কোনটা দেখিতে মানুষের মত, কোন কোনটা কুকুরের মত, কোন কোনটা বেজী বা কাঠবিড়ালের মত। লেজ কাহারো বড়, কাহারো ছোট, কাহারো বা একেবারেই নাই।



কোন জিনিস ধরিতে হইলে আমরা হাত দিয়াই ধরি, পা দিয়া কিছু ধরিতে পারি না। কিন্তু বানরের পা এমনভাবে তৈয়ারি যে, তাহা দ্বারাও ইহারা জিনিস-পত্র ধরিতে পারে; সুতরাং বানরের পা-চারিখানাকে চারিটা হাত বলিলেও চলে। সেই হিসাবে আমেরিকার বেশীর ভাগ বানরেরই হাত আরো একটা বেশী, কারণ তাহারা লেজ দিয়াও জিনিস-পত্র ধরিয়া থাকে।

বানরবর্গ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত :—

১। প্রাচীন মহাদেশের অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার বানর।

২। নূতন মহাদেশের অর্থাৎ আমেরিকার বানর।

আমেরিকার বানর আকারে তেমন বড় হয় না। বনমানুষ অথবা হনুমানের মত বড় বানর সেখানে নাই। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ বানরের গালের ভিতর থলি এবং পাছায় লোমশূন্য কড়া থাকে। ইহাদের নাসিকার ছিদ্র খুব কাছাকাছি। ইহারা হাতের বুড়ো আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের সম্মুখে আনিতে পারে। আমেরিকার বানরের গালে থলি নাই, পাছায়ও কড়া নাই; নাক চেপ্টা এবং সেই জন্য নাসিকার ছিদ্র খুব দূরে দূরে। ইহারা হাতের বুড়ো আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের সম্মুখে আনিতে পারে না।

বানর মাত্রেই চঞ্চল, বুদ্ধিমান্ ও অনুকরণ-প্রিয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা

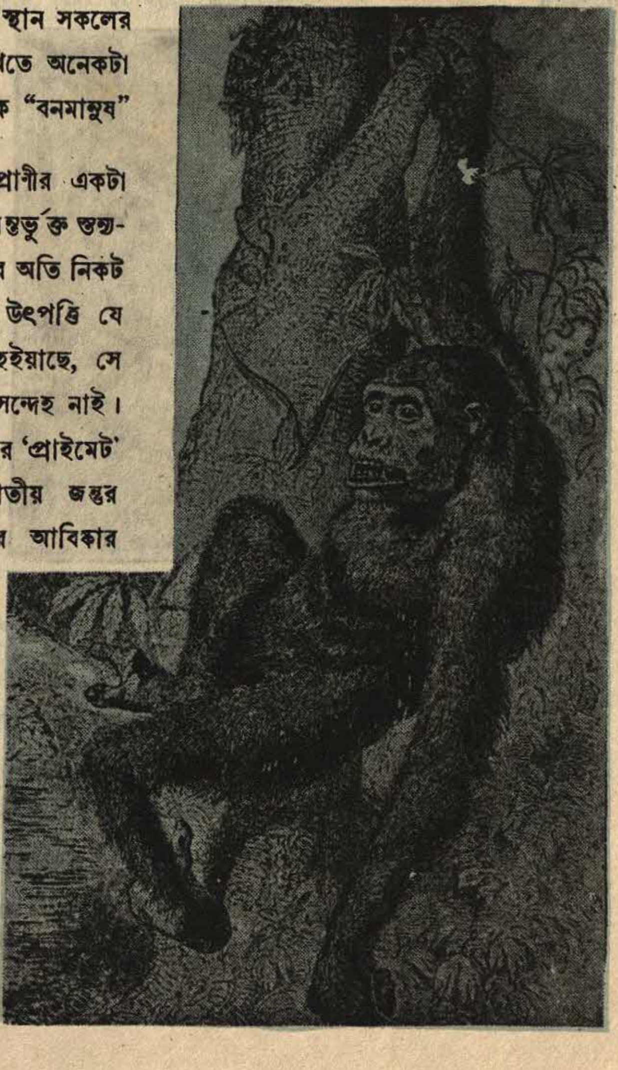
উচ্চশ্রেণীর, তাহারা প্রায়ই পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করে। বানর-শিশু শৈশবে মায়ের স্তন্যপান করিয়া বাঁচে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বানর

এই দুই মহাদেশে যত রকমের বানর আছে, তাহাদিগকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। বনমানুষ বা মানবাকৃতি বানর। ২। হনুমান। ৩। মর্কট বা সাধারণ বাঁদর।

বনমানুষ



বানরদের মধ্যে যাহাদের স্থান সকলের উপরে এবং যাহারা দেখিতে অনেকটা মানুষের মত, তাহাদিগকে "বনমানুষ" বলে।

মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণীর একটা শাখা। বানর-শাখারই অন্তর্ভুক্ত স্তন্য-পায়ী জন্তুর সহিত মানুষের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। মানুষের উৎপত্তি যে নিম্নশ্রেণীর জন্তু হইতে হইয়াছে, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য এই জাতীয় জন্তুদের 'প্রাইমেট' বলা হয়। 'প্রাইমেট'-জাতীয় জন্তুর মস্তিষ্ক বড় এবং ইহাদের আবিষ্কার করিবার শক্তি আছে। এই কারণেই 'প্রাই-মেট'-জীব প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনের সহিত অবস্থানুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ক্রমশঃ প্রকৃতির সর্ব্ব-প্রিয় প্রাণী হইয়া পড়িয়াছে।

বনমানুষ ৪ রকম

'গিবন,' 'গরিলা' 'শিম্পাঞ্জি' ও 'ওরাং উটান'। ইহাদের আরেক নিকট সম্পর্কীয় জন্তু আছে, তাহাকে 'লিমার' বলে।

ঠিক মানুষের মত না হইলেও ইহারা কতক সোজাভাবে দাঁড়াইতে ও চলা-ফেরা করিতে পারে এবং অনেক কাজই বেশ বুদ্ধি খাটাইয়া করিয়া থাকে। মানুষের মত ইহাদেরও এক এক পাটিতে ১৬টি করিয়া দাঁত দেখা যায়। অন্যান্য বানরের লেজ থাকে; খাবার পুরিয়া রাখিবার জন্য কাহারো কাহারো বা মুখের ভিতর থলি থাকে; ইহাদের কিন্তু লেজ কিংবা থলি কিছুই নাই।

গিবন্

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে—বোর্ণিও, সুমাত্রা ও মালয়-উপদ্বীপে গিবনের (Gibbon) বাস। ভারতবর্ষের মণিপুর, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ব্রহ্মদেশে এক জাতীয় গিবন্ আছে, বাঙ্গালায় তাহাদের 'উল্লুক' বা 'হুল্লুক' (H. Hooluck) বলে।


গিবন

আমাদের দেশের পুরুষ-উল্লুকের গায়ের রং মিশ্ কালো; ভ্রূর উপর কপালে সাদা দাগ। স্ত্রী-উল্লুকের গায়ের রং কাল্‌চে পাট্‌কিলে থেকে সাদাটে পাট্‌কিলে পর্য্যন্ত হয়।

গিবন্ চারি পাঁচ রকমের হইয়া থাকে। এক জাতীয় গিবন্ আছে, তাহাদের হাত ও পায়ের উপর দিক্ এবং মুখের চারিধার সাদা, কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থান ঘন কালো। আবার আগাগোড়া ধূসরবর্ণ গিবন্‌ও দেখিতে পাওয়া যায়। বনমানুষদের মধ্যে ইহারাই দেখিতে সুন্দর।

গিবন্ উচ্চে দুই হাতের বেশী হয় না। ইহাদের দেহের গড়ন-পেটন মন্দ নহে, কিন্তু হাত বড় বেশী লম্বা। খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে হাত দুইটি মাটিতে গিয়া ঠেকে।

ইহারা মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তেমন সহজ ভাবে হাঁটিতে পারে না ; দুই হাত দুই দিকে ছড়াইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে হাঁটে।

নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে এই উচ্চস্তরের বানরের দৈহিক গঠনের পার্থক্য এত অল্প যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বুদ্ধিমত্তায় ইহারা ওরাং-এর পরেই ; বাঁদর ও হনুমানের অনেক উর্দ্ধে।

গিবন্ প্রায় সর্ব্বদাই গাছের উপরে থাকে। ইহারা ডালে ডালে এত তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে পারে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়. ডাল ধরিয়া দুলিতে দুলিতে হঠাৎ লাফ দিয়া চক্ষের নিমেষে ২৫।৩০ হাত দূরে অন্য গাছে চলিয়া যায়। সে গাছ হইতে আর এক গাছে— এইভাবে লাফাইতে লাফাইতে যখন ইহারা জঙ্গলময় ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন এক ঝাঁক বড় বড় পাখী উড়িয়া যাইতেছে! সে সময় সম্মুখে হঠাৎ কোন ছোট পাখী পড়িলে তাহার আর উদ্ধার নাই ; ইহারা খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া মুখে পুরিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে না।

দলবদ্ধ হইয়া বাস করা ইহাদের অভ্যাস। এক এক দলে কমপক্ষে ৪০।৫০টা গিবন্ থাকে। দলের সকলগুলাতে মিলিয়া যখন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে, তখন দেখিতে ভারি মজা। ইহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় খুব বেশী ডাকে। ইহাদের কর্কশ হূকু 'হূকু' চীৎকার প্রায় এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়।

গিবন্ বেশ পোষ মানে। পোষা গিবন্ সাধারণতঃ ফল-মূল খাইয়া বাঁচে। কিন্তু বন্য অবস্থায় ইহারা ফল-মূল তো খায়ই, কীট-পতঙ্গ এবং ছোট ছোট পাখীও খায়।

গরিলা

মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাংশের ঘন জঙ্গল গরিলার (Gorilla) প্রধান বাসস্থান। আফ্রিকার কিভু-হ্রদের চতুষ্পার্শ্বের পার্ব্বত্যাংশ এবং টাঙ্গানাইকা-হ্রদের উত্তরে ইহাদের আবাসভূমি। পুরুষ গরিলা উঁচুতে প্রায় সাড়ে চারি হাত হইয়া থাকে এবং ওজনেও কখন কখন পাঁচ মণেরও বেশী হইতে দেখা যায়। স্ত্রী-গরিলা এত বড় হয় না। গরিলার পা অপেক্ষা হাত অনেক বড়। হাত- পায়ের আঙ্গুল খুব লম্বা ও মোটা ; কেবল হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা ছোট। গরিলা দেখিতে বড়ই কুৎসিত ; ইহাদের শরীর প্রকাণ্ড, মুখ কুচকুচে কালো, ভ্রূর হাড় উঁচু, চোয়াল লম্বা, নাক

চেপ্টা, কাণ ছোট এবং গালের ছ'পাটিতে বাঘের মত বড় বড় দাঁত। স্ত্রী-গরিলার চেহারা বরং কতক ভাল। তাহাদের ভ্রূর হাড়ও তেমন উঁচু নহে, দাঁতও খুব বড় হয় না।

সাধারণতঃ গরিলাকে দলবদ্ধ হইয়াই বাস করিতে দেখা যায়। স্ত্রী, পুরুষ এবং দুই একটি বাচ্ছা— এই চারিটি লইয়া একটি পারিবারিক দল হইতে পঞ্চাশটি গরিলা লইয়াও এক একটি দল গঠিত হয়। কখনও বা দলভ্রষ্ট হইয়া পুং-গরিলাকে একাকী জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায়। জঙ্গলের নানা প্রকার ফলই ইহাদের প্রধান খাদ্য; কচি আগাছা এবং মূলও খাইয়া থাকে। আহারের চেষ্টায় সমস্ত দিন ইহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। গরিলার পায়ের গড়ন এরূপ যে, মানুষের মত সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না; চলিবার সময় ইহারা পিছনের পায়ের তেলো এবং সম্মুখের পায়ের আঙ্গুল মুড়িয়া তাহাতে ভর দিয়া কুঁজো ভাবে চলে। দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও গরিলার স্বভাব তেমন হিংস্র নহে। মানুষ দেখিলে তাড়া করা দূরে থাক্, নিজেরাই বরং অন্য দিকে চলিয়া যায়। ইহাদের গায়ে কিন্তু ভয়ানক জোর। কেহ অনিষ্ট করিলে, ইহারা সহজে ছাড়ে না; কাম্ড়াইয়া তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে। ক্রুদ্ধ হইলে বা মানুষের হস্তে বন্দী হইলে দুই হাতে ঘন ঘন বুক চাপ্‌ড়াইতে থাকে।



গরিলার চলিবার ধরণ

ইহারা গাছের উপর ডাল-পালা বাঁকাইয়া, লতা-পাতা দিয়া এক রকম ঘর তৈয়ারি করে। স্ত্রী-গরিলা ও বাচ্ছারা সেই ঘরে রাত কাটায়; বড় বড় পুরুষেরা নীচে থাকিয়া পাহারা দেয়। সম্ভবতঃ ধাড়ী পুং-গরিলার দেহের ওজনের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহারা কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করে না। প্রত্যহ রাত্রে নূতন ঘর তৈয়ারি করে।

শিম্পাঞ্জি

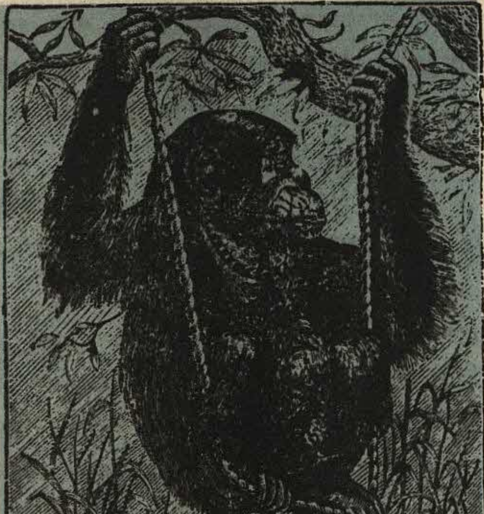
শিম্পাঞ্জিও (Chimpanzee) আফ্রিকা-দেশবাসী। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে ইহাদের বাস। শিম্পাঞ্জি নামটি আফ্রিকার আদিবাসীদেরই দেওয়া। গরিলা দেহের বলের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে পারে বলিয়া বনমানুষদের মধ্যে শিম্পাঞ্জির স্থান সকলের উপরে। ইহারা সচরাচর সওয়া তিন হাত লম্বা হইয়া

থাকে। স্ত্রীজাতি আকারে কিছু ছোট। পুং-শিম্পাঞ্জি ওজনে দুই মণ অবধি হইয়া থাকে।

গরিলার মত শিম্পাঞ্জিরও ভ্রূ উঁচু এবং চোয়াল লম্বা, কিন্তু ইহাদের চেহারা সেরূপ কদাকার নহে। কোন কোন বিষয়ে মানুষের সঙ্গে ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

শিম্পাঞ্জির হাত, পা, মাথা, ঘাড়, পিঠ এবং গলায় খুব বড় বড় ঘন লোম জন্মিয়া থাকে; বুক ও পেটের লোম পাত্‌লা; মুখ ও কাণে লোম নাই বলিলেই হয়। ইহাদের গায়ের রং কালো, তাহার উপর মাঝে মাঝে অল্প নীলের আভা। মুখের রং মেটে।

গরিলার হাত অপেক্ষা ইহাদের হাত অনেক ছোট, কিন্তু চলিবার রীতি ঠিক গরিলারই মত। ইহারাও কতকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সে ভাবে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। শিম্পাঞ্জিও পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করে। কখন কখন দুই তিন পরিবার একত্র বনে বনে ফলের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের দল গরিলার দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। খাদ্যাখাদ্য গরিলার মতই। একটা পোষা শিম্পাঞ্জির কথা শুনা গিয়াছে, ফলের পরিবর্ত্তে সে ছোট ছোট পাখী মারিয়া খাইতে বেশী ভালবাসিত।



শিম্পাঞ্জি

গরিলার ন্যায় শিম্পাঞ্জির গায়েও ভয়ানক জোর। স্বভাবতঃ ইহারা শান্ত-শিষ্ট কিন্তু কেহ অনিষ্ট করিলে, তাহার আর রক্ষা নাই; তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা তাহাকে একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে। শিম্পাঞ্জি ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে, বড় বড় গুলবাঘকেও হটিতে হয়। গরিলারা ডাল-পালার সাহায্যে বাসা প্রস্তুত করে কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, কিন্তু শিম্পাঞ্জি যে গাছের উপর মাচার মত এক রকম বাসা প্রস্তুত করে, তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। রাত্রিতে সপরিবারে সেই বাসায় ঘুমায়; গরিলার ন্যায় ইহাদেরও বৃত্তি যাযাবরী।

শিম্পাঞ্জি বেশ পোষ মানে। লণ্ডন জীবনিবাসে 'স্যালি' নামে একটা শিম্পাঞ্জি

ছিল, তাহার বুদ্ধির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কতকগুলা খড়-কুটা একত্র করিয়া, তাহাকে 'এক' হইতে 'পাঁচের' মধ্যে যে কয়টি উঠাইতে বলা হইত, সে তাহা ঠিক উঠাইতে পারিত। শুনিয়াছি, শেষে 'দশটি' পর্য্যন্ত উঠাইতেও তাহার ভুল হইত না। এই স্যালি ভয়ানক চা-ভক্ত ছিল। তাহাকে গম্ভীর ভাবে চা পান করিতে দেখিলে কেহ না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

ওরাং উটান

বোর্ণিও এবং সুমাত্রা-দ্বীপ ওরাং-এর (Orang-Utan) জন্মস্থান এবং এই বিচিত্র নাম ঐ দেশের অধিবাসীদের দেওয়া। ইহার অর্থ "জঙ্গলের মানুষ"। আকারে ইহারা গরিলা ও শিম্পাঞ্জি অপেক্ষা অনেক ছোট। খুব বড় ওরাংও তিন হাতের বেশী উঁচু হয় না



জঙ্গলের মানুষ

ইহাদের চেহারাও নিতান্ত কুৎসিত; কপাল উঁচু, নাক চেপ্টা, ঠোঁট লম্বা, কাণ বড়, পেটে মস্ত ভুঁড়ি এবং গলায় প্রকাণ্ড মাংসপিণ্ড। ওরাং-এর পা ছোট; হাত কিন্তু বেজায় লম্বা; যখন সোজাভাবে দাঁড়ায়, তখন হাতের আঙ্গুল মাটিতে গিয়া ঠেকে। ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে।

ওরাং লাফাইতে তেমন পটু নহে, ভূমিতেও ভালরূপ চলিতে পারে না; কিন্তু হাত ও পায়ের সাহায্যে ডাল-পালার উপর এত তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে পারে যে, তাহাকে ধরে কাহার সাধ্য!

গরিলা ও শিম্পাজির মত ইহারাও পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক পরিবারে স্ত্রী, পুরুষ ও তিন চারিটি বাচ্ছা থাকে। ইহারা গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতন অধিক সংখ্যকের দল কখনও গঠন করে না। নানা রকম বন্য ফলই ইহাদের প্রধান খাদ্য; অভাবে কচি কচি ডাল পাতা এবং বাঁশের কোঁড় খাইয়া থাকে। শিম্পাঞ্জির মত ইহারাও গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া তাহাতে রাত্রি কাটায়।

ওরাং-এর গায়েও ভয়ানক জোর। বাগে পাইলে ইহারা শিকারীর বল্লম ও বন্দুক কাড়িয়া লইতে ছাড়ে না। কখনো কখনো তাহাকে এমন জোরে কামড়াইয়া ধরে যে, তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। তবে হঠাৎ কাহাকেও আক্রমণ করা ইহাদের স্বভাব নহে। সাধারণতঃ ইহারা বেশ শান্ত-শিষ্ট।



ওরাং উটান

হনুমান

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে কাটিওয়ার পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত, সিন্ধু ও পাঞ্জাব ব্যতীত, ভারতের আর প্রায় সর্ব্বত্রই হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দি ও ইংরাজীতে ইহাদের 'লাঙ্গুর' বলে। বসিয়া থাকিলে, ইহারা উচ্চে সাধারণতঃ দেড় হাতের কিছু বেশী। সময় সময় দুই হাত উঁচু বীর হনুমানও দুই একটা চক্ষে পড়ে। ইহাদের লেজ অনেক সময় লম্বায় দুই হাত ছাপাইয়া যায়। হনুমানের হাত অপেক্ষা পা বড়। মর্কটের মত ইহাদের গালে থলি নাই, কিন্তু পাছায় কড়া আছে। ইহাদের গায়ের রং ধূসর: মুখ, কাণ, হাত ও পায়ের চেটো মিশ্‌মিশে কালো। হনুমানের মুখের চারিপাশে বড় বড় লোম জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মুখের

রঙ আবলুষের মত কালো বলিয়াই 'মুখপোড়া' গালাগালির উদ্ভব। ইহারা চারি পায়ে ভর দিয়া বেশ তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে পারে, কিন্তু লাফাইতে বেজায় ওস্তাদ্। এক লাফে ২০।২৫ হাত পার হওয়া ইহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। লাফাইবার সময় ইহারা প্রায়ই 'হুপ্ হুপ্' শব্দ করে।



বীর হনুমান

হনুমান সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সচরাচর এক এক দলে ১০।১২টা হইতে ৫০।৬০টা পর্য্যন্ত হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলে এক একটা ধাড়ী পুং-হনুমান সর্দ্দারের কাজ করে। কোথাও যাইতে হইলে, অথবা কিছু করিতে হইলে, সকলকে তাহারই সঙ্কেতমত চলিতে হয়। দলপতি হইবার জন্য সময় সময় অন্য পুং-হনুমানও চেষ্টা করিতে ছাড়ে না। তখন ভয়ানক যুদ্ধ বাধে।

পুরাতন সর্দ্দার পরাজিত হইলে, বলবিক্রমে যে শ্রেষ্ঠ, সে-ই দলপতি নিযুক্ত হয়। পুরাতন সর্দ্দার অন্যত্র পলায়ন করিয়া, নূতন দল গঠনের চেষ্টা করিতে থাকে।



নাকেশ্বর হনুমান

হনুমান মানুষের কম ক্ষতি করে না। নানা প্রকার ফল ও শস্য ইহাদের খাদ্য। পেটের জ্বালায় অনেক সময় ইহারা গ্রামে ঢুকিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের মধ্যে হাবড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার লোকে হনুমানের (P. Entellus) অত্যাচারে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। ইহাদের দৌরাত্ম্যে মাঠের তরি-তরকারি, গাছের ফল-মূল এবং অনেক সময় ঘরের খাদ্য-সামগ্রীও নিরাপদ নহে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আট জাতীয় হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। বোর্ণিও-দ্বীপে এক জাতীয় হনুমান আছে, তাহাদের নাক বেজায় লম্বা। সেইজন্য তাহাদের নাম 'নাকেশ্বর' হনুমান। সেখানে আর এক

জাতীয় হনুমান আছে, তাহাদের গায়ের লোম লাল্‌চে। লঙ্কাদ্বীপেও তিন চার রকম হনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে এক রকমের গায়ের রঙ সাদা—"সাদা হনুমান" (P. Albinus)।

মর্কট বা বাঁদর

এশিয়া ও আফ্রিকা মর্কট-বংশীয় বাঁদরের জন্মস্থান। ইহাদের ইংরাজী তোমরা সকলেই জান—Monkey (মাঙ্কি)। দেশ ও জাতিভেদে যেমন ইহারা ছোট, বড়, মাঝারি — নানা রকম হইয়া থাকে, তেমনি ইহাদের মুখের চেহারা এবং গায়ের রং-ও ভিন্ন ভিন্ন। চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী এবং জীবনধারণ-প্রথাও সকলের সমান নহে।

বাঁদরের মুখ অল্পাধিক ছুঁচল এবং তাহার ভিতর দুই পাশে দুইটি থলি থাকে। খুব বেশী পরিমাণে খাবার পাইলে, ইহারা অগ্রে মুখের ঐ থলি ভরিয়া লয়; তারপর খাইতে থাকে। খাওয়া শেষ হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ কোন বাধা উপস্থিত হইলে, পাছে ঠকিতে হয়, সেই ভয়ে অগ্রেই থলি ভরিয়া লয়। মর্কট ভিন্ন অন্য কোন বানরের মুখে থলি নাই।

হনুমানের মত ইহাদের পাছায়ও কড়া আছে; সেই কড়া কোন কোনটার গাঢ় লাল, কোন কোনটার লাল্‌চে। সাধারণতঃ পুং-জাতির কড়ার রং বেশী জমকালো।

পা অপেক্ষা বাঁদরের হাত লম্বা। ইহাদের চলিবার রীতি কতকটা চতুষ্পদ জন্তুরই মত। বাঁদর অপেক্ষা বাঁদরী আকারে কিছু ছোট হয়। সাধারণতঃ উহাদের এক একবারে একটি করিয়া ছানা হইয়া থাকে।

বাঁদর মাত্রেই খুব চঞ্চল। কাজের মধ্যে সমস্ত দিনই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি। ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে। কিন্তু ইহাদের স্বভাব বড় বিচিত্র; মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করিয়া দেয়। আবার পরস্পরের মধ্যে ভাব হইতেও বেশী দেরী হয় না।

ফল-মূল, পাতা, নানারকম শস্য, পোকা-মাকড়, শামুক-গুগ্‌লি এবং ছোট ছোট পাখী ইহাদের প্রধান খাদ্য।

এশিয়ার মর্কট

এশিয়ার মর্কট নানা জাতিতে বিভক্ত। শুধু ভারতবর্ষেই ছয় সাত জাতীয় মর্কট আছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশেও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মর্কট দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আমরা সচরাচর যে মর্কট (Macaca Rhesus) দেখি, ভারতবর্ষের নানা স্থানেই উহারা বাস করে! এমন কি, সুদূর উত্তর-পশ্চিম এবং বোম্বাই প্রদেশেও উহাদের অভাব নাই। এই সকল বাঁদর যেমন চালাক-চতুর ও বুদ্ধিমান, তেমনি অনুকরণপ্রিয়। ছোটবেলা হইতে পুষিলে ইহারা বেশ পোষ মানে এবং নানা



এশিয়ার মর্কট

রকম ক্রীড়া-কৌতুক শিখে। ভাল রকম শিক্ষা পাইলে ইহারা কেমন ভাব-ভঙ্গীর সহিত নাচিতে পারে, তাহা বোধ হয় কাহারো জানিতে বাকী নাই। মাদ্রাস্ অঞ্চলে যে গুলাকে নাচিতে শেখান হয়, তাহাদের নাম 'বনেট্-মাঙ্কি' (M. Pileatus) বা টুপিপরা বাঁদর। তাহাদের মাথার বড় বড় চুল এমন ভাবে সাজানো যে, দেখিলেই মনে হয়, টুপি পরিয়া আছে। ইহারা সিংহল, চীনেরও অধিবাসী। সারা পশ্চিম-ঘাট জুড়িয়া, বিশেষত কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে, এক প্রকারের অদ্ভুত বাঁদর দেখা যায়, তাহাদের মাথায় সিংহের ন্যায় কেশর এবং লেজের আগায় চুলের গুচ্ছ থাকে। ইংরাজিতে ইঁহাদের 'সিংহ বাঁদর' (Lion Monkey) এবং বাঙলায় 'নীল বাঁদর' (M. Silenus) বলে। ইহাদের মেজাজ বড় কড়া।

আফ্রিকার মর্কট

আমাদের দেশে মর্কটের সংখ্যা কম না হইলেও আফ্রিকা মহাদেশই ইহাদের প্রধান আড্ডা। সেখানে যত রকম মর্কট আছে, এশিয়ায় তাহার সিকিও নাই। এশিয়ার মর্কট সাধারণতঃ মোটাসোটা ও বেঁটে হইয়া থাকে; ইহাদের লেজ কোন কোনটার খুব ছোট এবং কোন কোনটার বেশ বড়। কিন্তু আফ্রিকার প্রায় সব মর্কটই ছিপ্ ছিপে লম্বাটে ধরণের। অনেকটা আমাদের দেশের হনুমানের মত। তাহাদের সকল-গুলারই লেজ বেশ বড়।



মোনা ও ডায়না বাঁদর

সেখানকার যে দুই রকম মর্কট লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে, আকর্ষণ করে, তাহাদের নাম 'মোনা' ও 'ডায়না'। ইহারা পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী। ইহাদের চেহারা এত সুন্দর এবং স্বভাব এমন মিষ্ট যে, দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। লুট-পাট-দাঙ্গা-হাঙ্গামাপ্রিয় মর্কট-বংশে এ রকম শান্ত-শিষ্ট প্রাণী আর নাই।

আফ্রিকার নানা স্থানে আর যত রকম মর্কট আছে, দুষ্টামি বাঁদ্‌রামিতে এসিয়ার মর্কট হইতে তাহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

বেবুন

বেবুনের (Baboon) প্রধান আড্ডা আফ্রিকা। ইহারা মর্কটদেরই নিকট জ্ঞাতি; কিন্তু আকারে সাধারণ মর্কট অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাদের দেহের বাঁধন যেমন দৃঢ়, বল-বিক্রমও তেমন অসাধারণ। অতি বড় সাহসী লোকও কাছে ঘেঁসিতে ভয় পায়।



হলূদে বেবুন

বেবুনের মুখ কতকটা কুকুরের মুখের মত লম্বা। সেই জন্য ইহাদিগকে কুকুর-মুখো বাঁদর বলা যায়। ইহাদের হাত, পা, মাথা ও গলায় বড়বড় লোম জন্মিয়া থাকে। সাধারণ মর্কটের ন্যায় বেবুনের মুখেও থলি আছে। ইহাদের পাছার কড়া খুব বড় ও উজ্জ্বল।

বেবুন গাছে চড়িতে অথবা ডালে ডালে লাফালাফি করিতে তেমন পটু নহে; সেই জন্য দলবদ্ধ হইয়া ভূমিতেই বাস করে। এক এক দলে প্রায় ৩০০ পর্য্যন্ত বেবুন দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইহারা ৮।১০টাতে মিলিয়া ছোট ছোট দলেও বিচরণ করিয়া থাকে। এক একটা পুং- বুন দলের সর্দ্দার নিযুক্ত হয়। তাহাদের আদেশ ও সঙ্কেত মতই সকলে চলে। সর্দ্দারের আদেশ লঙ্ঘন করে, এমন সাহস কাহারও নাই।

বেবুনের স্বভাব বড়ই হিংস্র। একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে, মানুষ ত দূরের কথা, বাঘ-সিংহেরও রক্ষা থাকে না। আফ্রিকায় ডোরাদার বড় বাঘ নাই, গুলবাঘ আছে। বেবুনের ছানার মাংস তাহাদের বড়ই প্রিয়। বাঘের গ্রাস হইতে ছানা-গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা প্রত্যেক দলে কয়েক জন করিয়া পাহারা নিযুক্ত করে। তাহারা উঁচু জায়গায় থাকিয়া শত্রুর খোঁজ-খবর লয়; বিপদ্ উপস্থিত দেখিলে, এক প্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ করে, অমনি সমুদয় দল ছুটিয়া নিরাপদ স্থানে

চলিয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ যদি বিপদে পড়ে, তখন বেবুনেরাও সহজে ছাড়ে না: পাঁচ সাতটাতে মিলিয়া, কামড়াইয়া, বাঘের রফা দফা করিয়া ফেলে।


গিলেডা বেবুন

ইহারা ফল-মূল খাইতে ভালবাসে। ফল-মূলের অভাবে পোকা-মাকড়, টিকটিকি গিরগিটিও খায়। পাখীর ডিম এবং কাঁকড়া-বিছা ইহাদের খুব প্রিয়। কখন কখন দলশুদ্ধ বেবুন ফলের বাগানে পাড়িয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ করে। তাড়া দিলে, পলায়ন করা দূরে থাক্, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কামড়াইতে আসে। লুটপাটে বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহারা চারিদিকে চর পাঠাইয়া সংবাদ লয় এবং লুটপাটের সময়ও চারিদিকে পাহারা রাখিয়া অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ হাসিল ক


চাক্‌মা বেবুন

করে। বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকিলে, প্রাণান্তেও ফলের বাগানে প্রবেশ করে না।

আফ্রিকাতে সাত আট জাতীয় বেবুন আছে। কোন্ কোন বেবুন, সামনের পায়ের তলা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত, দুই হাত উঁচু হয়। সেখানকার এক জাতীয় 'হল্‌দে বেবুন' (P. Cynocephalus) উচ্চে প্রায় তিন হাত। আবিসিনিয়া প্রদেশে 'গিলেডা' (Theropithecus Gelada) নামে এক জাতীয় বেবুন আছে, তাহাদের পিঠ, গলা এবং মাথার দুই ধারে কেশরের মত লম্বা লম্বা লোম জন্মে এবং লেজের ডগায়ও এক গোছা চুল থাকে। উচ্চে তাহারাও তিন হাতের কাছাকাছি। আরব দেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

চাকমা বেবুন

'চাক্‌মা' (P. Porcarius) বেবুন দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী। বেবুন জাতির ভিতর ইহারাই আয়তনে বৃহৎ। ইহারা দেখিতে কতকটা 'গিলেডা' বেবুনেরই মত। তবে ইহাদের ঘাড়ের কেশর তেমন বড় হয় না এবং লেজের ডগায়ও লোমের গোছা থাকে না। চাক্‌মার গায়ের লোম কালো, তাহার উপর সবুজের আভা ; হাত পা ও মাথা ঘোর কালো ; মুখের রং লাল, কেবল চোখের চারি পাশ সাদা। ইহারা দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে বাস করে। কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলে দল বাঁধিয়া অগ্রসর হয়।



ম্যানড্রিল

ম্যানড্রিল

আফ্রিকার পশ্চিম অংশে এক জাতীয় বেবুন বাস করে, ইহাদের নাম 'ম্যানড্রিল' (Mandrillus Sphinx)। ম্যান্‌ড্রিলের চেহারা যেমন কুৎসিত, স্বভাবও তেমনি হিংস্র। ইহাদের মাথায় শূয়রের কুঁচির মত লম্বা লম্বা লোম জন্মে ; নাকের দুই পাশ বেজায় ফোলা, সেই ফোলা অংশ লাল ও নীলের ডোরায় সজ্জিত। ম্যানড্রিল্ শূয়রের মত 'ঘোঁৎ' 'ঘোঁৎ' শব্দ করে। স্বাধীন অবস্থায় তো দূরের কথা, বন্দী অবস্থাতেও ইহাদের ত্রিসীমানায় যাইতে কাহারো সাহস হয় না।

ড্রিল



ড্রিল

আফ্রিকার 'ড্রিল্' (M. Lencophæus) বেবুনও দেখিতে কতকটা ম্যান্‌ড্রিলেরই মত, একই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাদেরও নাকের দুই পাশ ফোলা, কিন্তু ম্যানড্রিলের মত তত বেশী ফোলা নহে। ড্রিলের মুখের রং গাঢ় নীল। ইহারাও খুব দুর্দ্দান্ত।

শুনিতে পাওয়া যায়, এই সকল বড় বড় বেবুনের দুই দলে যখন লড়াই বাধে, তখন রীতিমত খুনোখুনি রক্তারক্তি না হইয়া যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধ চলিতে থাকে। হৈ-চৈ-হল্লার চোটে কাণে তালা ধরিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এই যুদ্ধে গাছ-পাথর ছোড়াছুড়িও চলে। এক পক্ষকে সম্পূর্ণ পরাস্ত না করিয়া অপর পক্ষ কিছুতেই নিরস্ত হয় না। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, বলা কঠিন।

আমেরিকার বানর

আমেরিকার বানর মাত্রেই আকারে ছোট। গরিলা, শিম্পাঞ্জি তো দূরের কথা, আমাদের হনুমানের মত বড় বানরও সেখানে নাই।

আমেরিকার বানরের মুখ বড় বেশী চওড়া, সেইজন্য নাকের ছিদ্রও দূরে দূরে। তাহাদের গালে থলি নাই, পাছায়ও কড়া নাই। এশিয়া ও আফ্রিকার বানরদের ৩২টা করিয়া দাঁত হয়, কিন্তু 'মারমোসেট্' (Marmoset) ছাড়া আর সকল জাতীয় আমেরিকার বানরেরই দাঁতের সংখ্যা ৩৬।

বানরেরা পায়ের দ্বারাও হাতের মত কাজ করিতে পারে বলিয়া, ইহাদিগকে চতুর্হস্ত (চারিহাতওয়ালা) জন্তু বলা হয়। সেই হিসাবে আমেরিকার বেশীর ভাগ বানরের হাত আরো একখানা বেশী; সেটি তাহাদের লেজ। তাহারা লেজের দ্বারাও ঠিক হাতের মত কাজ করিতে পারে; অর্থাৎ জিনিস-পত্র ধরিতে পারে, খাবার জিনিস গালে পুরিতে পারে এবং ডালে ঝুলিয়া হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া দোল খাইতেও পারে। এশিয়া ও আফ্রিকার কোন বানরেরই এ ক্ষমতা নাই।

আমেরিকার বানরদের মধ্যে 'সাপাজু' (Cebus) ও 'মাকড়সা-বানর' (Ateles প্রধান। সাপাজু আকারে নিতান্ত ছোট এবং এত ভীরু যে, সহজে নীচে নামিতে



বাঁধিয়া বাস করে। মাকড়সা-বানর দেখিতে কিছু বড়। ডালে লেজ আট্‌কাইয়া, হাত-পা ছড়াইয়া ইহারা যখন ঝুলিতে থাকে, তখন মনে হয়, ঠিক যেন একদল প্রকাণ্ড মাকড়সা ঝুলিতেছে। সেই জন্যই ইহাদের নাম হইয়াছে 'মাকড়সা-বানর'।

মাকড়সা-বানর

মারমোসেট্



দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল্ মারমোসেটের জন্মস্থান। আকারে ইহারা বড় বড় কাঠবিড়ালীর মত। এমন সুন্দর ও শান্ত-শিষ্ট প্রাণী বানরজাতিতে আর নাই। মারমোসেটের সর্ব্বাঙ্গ কোমল লোমে ঢাকা। ইহাদের কাণের দু'পাশেও গোছা গোছা লোম বাহির হয়। সেই লোম চামরের মত গলার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গায়ের রং কাহারো হল্‌দে, কাহারো সাদা, কাহারো কালো, কাহারো বা সাদা-কালোয় ডোরা ডোরা। দেহের তুলনায় ইহাদের লেজ খুব লম্বা এবং পশমের ঝাঁক্‌ড়া লোমে ভরা। আমেরিকার আর সব বানরের ৩৬টি করিয়া দাঁত, কিন্তু ইহাদের দাঁতের সংখ্যা ৩২। মার্‌মোসেট্ বেশ পোষ



মার্‌মোসেট্

মানে। অনেক সময় পালকের হাতের উপরেই বসিয়া থাকে। ফল ও পোকা-মাকড় ইহাদের খাদ্য।

লিমারাদি

LEMURIDÆ



লিমার

লিমার (Lemur) প্রায় পঞ্চাশ জাতিতে বিভক্ত। ইহারাও এক জাতীয় অতি আদিম বংশীয় বানর। ইহাদের অধিকাংশই মাডাগাস্কার-দ্বীপবাসী। আফ্রিকা ও পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জেও ইহাদের দেখা যায়। জাতি হিসাবে লিমারের আকৃতি এবং গায়ের রং-ও ভিন্ন ভিন্ন। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; স্বভাব চঞ্চল হইলেও বেশ পোষ মানে। ফল, মূল, পোকা, মাকড়, ইঁদুর, ব্যাঙ ইহারা সবই খায়। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রিকালে বাহির হয়। সেই সময় ইহারা নানারকম আওয়াজ করিয়া থাকে। সেইজন্য ঐ সব প্রদেশে ইহাদের "রাতের ভূত" বলে।

লাজুক্ বানর



লাজুক বানর

আসাম-প্রদেশ এবং ত্রিপুরা, পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম ও দাক্ষিণাত্যে (Loris Gracilis) লিমারের এক বংশ আছে, ইহাদিগকে বাঙ্গালায় 'লাজুক্ বানর' (Slow-paced Lemur) বলে। সারাদিন ইহাদের মুখে টুঁ শব্দটি নাই, একপাশে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকে। যদি নেহাৎ জ্বালাতন কর, কি গায়ে খোঁচা মারো, তবে মাথা তুলিয়াই তখনই আবার ঘাড়টি নীচু করে। ইহাদের অখাদ্য কিছু নাই। ইহারা লম্বায় আট থেকে পনের ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মালয়-উপদ্বীপে এক প্রকার 'উড়ো লিমার' দেখা যায়। উহারা কিন্তু পূরা মাত্রায় নিরামিষ ভোজী।

করপক্ষবর্গ

বাদুড়

তোমরা সকলেই বাদুড় (Bat বা Flying Fox) দেখিয়াছ ; চামচিকাও দেখিয়াছ। বাদুড় বড়, চামচিকা ছোট। চামচিকা ও বাদুড় ভিন্ন জাতীয় প্রাণী নহে ; কয়েক রকম ছোট ছোট বাদুড়কেই চামচিকা (Cynopterus Marginatus) বলে।

ইহাদের সহিত বানরবর্গের শরীরের আভ্যন্তরিক সাদৃশ্য খুব বেশী। সেইজন্য জীবজগতে বানরবর্গের পরেই করপক্ষের স্থান। প্রাণীজগতে বাদুড়ের এই উচ্চস্থান আমাদের মনে বড়ই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কী বিচিত্র না এই জগৎ !



চামচিকা ও ভারতীয় ভ্যাম্পায়ারের মাথা

তোমরা হয় তো বাদুড়কে পাখী মনে কর, কিন্তু বাদুড় পাখী নহে। পাখীর গায়ে পালক থাকে, বাদুড়ের গায়ে পালক নাই —পশুর ন্যায় লোম আছে। বাদুড়ও ডানার সাহায্যে পাখীর মত উড়িতে পারে বটে, কিন্তু সে ডানা পাখীর ডানার মত নহে— তাহাতে পালক নাই। বাদুড়ের ডানা পাতলা চামড়ায় নির্ম্মিত। ডানা দু খানা বাদুড়ের হাত হইতে পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং হাত পা ও গায়ের সঙ্গে যুক্ত। ডানার মাঝে মাঝে সরু সরু লম্বা হাড় দেখা যায়, সেগুলি বাদুড়ের হাতের আঙ্গুল। অন্য সব আঙ্গুলই বড়, কেবল বুড়ো আঙ্গুলটি ছোট ; তাহার ডগায় একটি বাঁকা নখ থাকে। ইহাদের হাতের অন্য কোন আঙ্গুলে নখ নাই ; কিন্তু পায়ের পাচটি আঙ্গুলই নখযুক্ত। ইহারা লম্বায় ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চি এবং ডানা ছড়াইলে ৪৬ হইতে ৫২ ইঞ্চি। চামচিকারা লম্বায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি ও পক্ষবিস্তারে ১৭ হইতে ২০ ইঞ্চি পয্যন্ত হয়। তারপর দেখ, বাদুড়ের দাঁত আছে, কাণ আছে ; পাখীর কিন্তু দাঁতও নাই, কাণও নাই। পাখীদের শক্ত ঠোঁট থাকে, বাদুড়ের সে রকম ঠোঁট নাই। ইহাদের মুখ ছুঁচ্‌ল— কতকটা শিয়াল-কুকুরের মুখের মত। তারপর, আর এক বিষয়েও বাদুড় ও পাখীতে প্রভেদ দেখা যায়। পাখীদের ডিম হয়, সেই ডিম ফুটিয়া ছানা হয়, কিন্তু বাদুড়ের ডিম হয় না ; বানর, বিড়াল, গরু, প্রভৃতির মত একেবারে ছানা হয়। এক- সঙ্গে সাধারণতঃ একটি বা দুইটি ছানা হয়। বাদুড়ের ছানা মায়ের দুধ খাইয়া



ফলাহারী বাদুড়

বাঁচে। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ, বাদুড় পাখী নহে— পশু। পৃথিবীতে অনেক রকম বাদুড় আছে। ছোট ছোট বাদুড় বা চামচিকা দেড় ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি মাত্র লম্বা হয়। ছোট বড় সকল জাতীয় বাদুড়ের ডানাই কিন্তু খুব বড় হইয়া থাকে। জাতি ভেদে সাদা, কালো, হল্‌দে, কটা, ধূসর প্রভৃতি নানা রকম বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোনটার কাণ ছোট, কোনটার বড়। কোন কোন বাদুড়ের কাণের মধ্যে পাতলা চামড়ায় নির্ম্মিত আর একটা কাণের মত বস্তু দেখা যায়। কোন কোনটার নাকের উপর চামড়ার একখানা পাতা উঁচু হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো বা সেই পাতার নীচে আর একটা ছোট পাতা নাকের ছিদ্র বেষ্টন করিয়া থাকে। লেজও সকলের সমান নহে; কাহারো ছোট, কাহারো বড়, আবার কাহারো বা একেবারেই নাই। বাদুড়ের স্পর্শশক্তি খুব প্রখর। ডানা, নাক ও কাণের উপরকার পাতলা চামড়া ইহাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

বাদুড় নিশাচর প্রাণী। ইহারা অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে। হঠাৎ দিনের আলোয় বাহির হইলে ইহাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়া যায়। বড় জাতীয় বাদুড় প্রায়ই দলে দলে বাস করে। পাড়াগাঁয়ে এক একটা গাছে শত শত বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়; দুই পায়ে ডাল আঁকড়াইয়া, মাথা নীচু করিয়া কেমন ঝুলিতে থাকে! বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে এই ভাবেই বিশ্রাম করে, ঘুম পাইলে এই ভাবেই ঘুমায়।

বড় ও মাঝারি বাদুড় প্রায়ই ফলাহারী হইয়া থাকে। তাহাদের অত্যাচারে গাছের আম, জাম, পেয়ারা, বাদাম, লিচু প্রভৃতি রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু ছোট বাদুড় কীটপতঙ্গ ভক্ত। ভারতবর্ষের একজাতীয় ছোট বাদুড় (Megaderma Lyra) রক্ত- পান করিতে খুব পটু। উহারাও আমেরিকার 'ভ্যাম্পায়ার' (Vam- pire) গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য। তবে ইহারা চামচিকা, ছোট ছোট পাখী, ব্যাঙ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় জীবের রক্ত ও মাংস খাইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকায়ও কয়েক জাতীয় রক্তপায়ী বাদুড় আছে; তাহাদের মধ্যে 'ভ্যাম্পায়ার' প্রধান। 'ভ্যাম্পায়ার' গরু, ঘোড়া প্রভৃতির রক্তপান করিয়া থাকে;



ভ্যাম্পায়ার

অবশ্য বাঘের মত কাহারো ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খায় না।

কিম্বদন্তী, অর্থাৎ ইহা লইয়া বহু গল্প আছে যে, ইহারা মানুষের রক্তও চুষিয়া খায়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শুনা যায়, কাহাকেও ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলে ইহারা তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা তাহার দেহের কোন স্থানে একটি ছিদ্র করে এবং সেই ছিদ্রে মুখ দিয়া রক্ত চুষিয়া খায় ; ঘুমন্ত প্রাণী টেরও পায় না। রক্তপায়ী বাদুড় মাত্রেই আকারে ছোট।

কীটভুক্‌বর্গ

ছুঁচা, মোল্ ও কাঁটাচুয়া এই বর্গের অন্তর্গত। ইহাদের মুখ সরু, চোখ ছোট ; নাক এত লম্বা যে, উহাকে শুঁড় বলিয়া ভ্রম হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। মাংসাশী জন্তুদের মত ইহাদের সকল প্রকার দাঁতই আছে, সবগুলিই খুব তীক্ষ্ণ। ইহারাও বানরবর্গের নিকট জ্ঞাতি, সেই কারণে করপক্ষবর্গের পরেই ইহাদের স্থান।

ইহারা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। সম্মুখের পা দিয়া মাটি কাটে বলিয়া ইহাদের ঐ দুই পায়ে খুব বেশী জোর ; নখগুলিও মাটি খুঁড়িবার উপযোগী। কীট-পতঙ্গ, শামুক-ব্যাঙ ইহাদের খাদ্য। কোন কোনটা ফল-মূলও খাইয়া থাকে।

ছুঁচা বা ছুছুন্দর

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছুঁচা আছে। এশিয়ার এক ভারতবর্ষেই কমপক্ষে পনর ষোল রকম ছুঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে যে দুই রকম সচরাচর চক্ষে পড়ে, তাহাদের এক জাতি ঘন ধূসর, অপর জাতি প্রায় সাদা। দেখিতে কতকটা ইঁদুরের মত হইলেও, ইঁদুর প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীর সহিত ইহাদের কোনই

সম্পর্ক নাই। প্রধান অমিল দাঁতে। ইঁদুর প্রভৃতির কুকুরে-দাঁত নাই, ইহাদের কিন্তু উভয় মাড়ীতে কুকুরে দাঁত বাহির হয়। ইঁদুরের ছেদন-দন্ত বাটালির ন্যায় ধারালো এবং চিবাইবার



ছুঁচা

দাঁত চেপ্টা ; কিন্তু ইহাদের ছেদন ও চর্ব্বণ-দন্ত খুব তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে।

ছুঁচার মুখ সরু, নাক লম্বা, চোখ ছোট, দর্শনশক্তি কম, কিন্তু শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি প্রখর। ইহাদের কোন কোন জাতির শরীরের দুই পাশে দুইটি গ্রন্থি থাকে, তাহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়। তাহারা যে জিনিস স্পর্শ করে, তাহাও দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। পুং-ছুঁচা অত্যন্ত রাগী, স্ত্রীজাতির প্রকৃতি মন্দ নহে। ইংরাজিতে ইহাদের 'শ্রু' (Shrew) বা 'মাস্ক র‍্যাট' (Musk Rat) বলে।

মোল্

দেখিতে ছুঁচার ন্যায় হইলেও মোল্ (Mole) ও ছুঁচা এক বংশের প্রাণী নহে। উত্তর-আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কিয়দংশ মোলের জন্মস্থান। আমাদের



মোল্

দেশে হিমালয়-প্রদেশ, শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ের পাহাড়িয়া স্থান ছাড়া আর কোথাও মোল্ নাই।

ইহাদের চোখ এত ছোট যে, অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে কিছুই প্রায় দেখিতে পায় না। ইহাদের লেজ ছোট ; ছু চার মতন বড় নহে। গন্ধ ও শব্দের দ্বারা ইহারা পোকা-মাকড়ের সন্ধান পাইয়া সঙ্গীনের মত নখ ও তীক্ষ্ণদন্তের দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে।

কাঁটাচুয়া

ইউরোপের নানাস্থানে এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত, ও মাদ্রাসে কাঁটাচুয়া দেখিতে পাওয়া পায়। ইহাদের মাথা, পিঠ ও শরীরের দুই পাশ ছোট ছোট শক্ত কাঁটায় ভর ; সেই কাঁটা স্বাভাবিক অবস্থায় গায়ের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, কিন্তু কোন কারণে ভয় পাইলে, যখন ইহারা মাথা ঘুরাইয়া পেটের নীচে লইয়া গিয়া বলের মত হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি খাড়া হইয়া উঠে। এই কাঁটাই ইহাদের আত্ম-রক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহাদের ইংরেজী নাম "হেজহগ্" (Hedgehog)।



কাঁটাচুয়া

কাঁটাচুয়া পোকা-মাকড়, শামুক্-ব্যাঙ্, ইঁদুর-সাপ প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। কেউটে বা গোখ্রার ন্যায় বিষধর সাপকেও আক্রমণ করিতে ইহারা ভয় পায় না।

গেছো-ছুঁচা

গেছো-ছুঁচার (Tree-Shrew) আচার-ব্যবহার অনেকটা কাঠবিড়ালীর ন্যায় হইলেও উহারা ঐ বংশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ইহারা চারি পাঁচ জাতির হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিং, সিকিম, আসাম, আরাকান, বার্ম্মা, মালয় প্রভৃতি দেশে এবং ভারতের দাক্ষিণাত্য, মধ্য প্রদেশ, ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যাঞ্চলে একজাতীয় গেছো-ছুঁচা (T. Ellioti) দেখা যায়।

ইহাদের মাথা ও দেহ সাত হইতে আট এবং লেজ সাত হইতে নয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পিঠের মধ্যস্থল লেজের উপরিভাগের রঙ্ ঘন লাল্চে পাট্কিলে এবং পিঠের দুই পার্শ্বের রঙ্ ফিকে লালচে-পাট্কিলে। গলা, বুক, পেট ও লেজের তলা হলদে রঙের।

মাংসাশীবর্গ

পৃথিবীতে মাংসাশী জন্তুর সংখ্যা খুব বেশী নহে। তৃণভোজীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। স্থলচর জন্তুদিগের মধ্যে ভালুক ও উদ্বিড়াল-বংশ, বিড়াল-বংশ এবং হায়না, নকুল ও কুকুর-বংশ আর জলচরদিগের মধ্যে কেবল সীল-বংশই মাংসাশী।

জন্তুগণের কসের দাঁত পরীক্ষা করিলে, কে কি আহার করে, তাহা জানিতে

পারা যায়। তৃণভোজীরা নীচের চোয়াল পাশের দিকে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে নাড়িয়া খাদ্যবস্তু চিবাইয়া খায়। সেইজন্যে তাহাদের কসের দাঁত খাদ্যদ্রব্য পেষণের উপযোগী চেপ্টা। কিন্তু মাংসাশীরা খাদ্যবস্তু চিবায় না; উপর ও নীচের দিকে চোয়াল নাড়িয়া মাংসখণ্ড কেবল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়াই গিলিয়া ফেলে। এইজন্য ইহাদের কসের দাঁত কাঁচির ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ইহাদের অন্যান্য দাঁতও শিকার ধরিবার এবং মাংস ছিঁড়িবার উপযোগী।

সচরাচর তৃণভোজীর শরীর মাংসল, পাকস্থলী বড় এবং পেট মোটা হইয়া থাকে কিন্তু মাংসাশী জন্তুরা কখনও বেশী মোটা হয় না; তাহাদের পেটও ভুঁড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়ে না। মাংসাশীদের খুর কিংবা শিং নাই, পায়ের গড়ন শিকার ধরিবার বিশেষ উপযোগী এবং আঙ্গুল ধারালো নখযুক্ত।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই কোন না কোন জাতীয় মাংসাশী জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন কোন জাতি বেশ পোষ মানে কিন্তু কুকুরের মত এমন প্রভুভক্ত এই বর্গের মধ্যে আর কেহ নাই।

ভালুক দ্বি-ভোজী হওয়াতেই সাধারণতঃ আমরা উহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া থাকি যে, উহারা বুঝি মাংস স্পর্শই করে না, ইহা কিন্তু ভুল। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয়-ভালুক একটু অধিক মাত্রায় তৃণভোজী, তাহা হইলেও সুবিধা ও সুযোগ পাইলে ইহারা মাংস খাইতে মোটেই ছাড়ে না।

ভল্লুকাদি

ভালুক-বংশ

আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সকল স্থানেই ভালুক আছে। ইহারা মাংসাশীবর্গ-ভুক্ত, কিন্তু প্রধানতঃ নিরামিষভোজী। কুকুরের ন্যায় ভালুকেরও দাঁতের সংখ্যা ৪২; কিন্তু কুকুর, বিড়ালের দাঁতের সহিত ইহাদের দাঁতের কিছু কিছু প্রভেদ আছে। এই তিন জাতীয় জন্তুর ছেদন-দন্ত ও শ্বদন্ত (কুকুরে-দাঁত) এক রকম হইলেও চর্ব্বণ-দন্ত এক রকম নহে। কুকুর, বিড়াল খাদ্যবস্তু চিবায় না, টুক্‌রা



আমেরিকার কালো-ভালুক

টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া গিলিয়া ফেলে। সেই জন্য তাহাদের চর্ব্বণ-দন্ত কাঁচির ফলকের ন্যায় ধারালো ; কিন্তু ভালুক তৃণভোজীদের ন্যায় আশে পাশে চোয়াল নাড়িয়া খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খায় ; সেই জন্য ইহাদের চর্ব্বণ-দন্ত চেপ্টা। দাঁতের গড়ন দেখিলেই বুঝা যায়, ভালুকের মাংসাশী জন্তুর মত শিকার ধরিবার এবং তৃণভোজীর মত খাদ্যবস্তু চিবাইবার ক্ষমতা আছে।

ভালুকের শরীর মোটা-সোটা এবং সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় ঘন লোমে ঢাকা। ইহাদের পায়ের পাতা খুব চওড়া। চলিবার সময় ইহারা বিড়াল, কুকুরের মত কেবল আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে না, মানুষের মত পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলে। ভালুকের প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল এবং প্রত্যেক আঙ্গুলে বড় বড় ধারালো বাঁকা নখ থাকে। পায়ের পাতা চওড়া বলিয়া, ভালুক পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই কারণেই ভল্লুকাদিকে অন্যান্য মাংসাশীবর্গের জন্তু হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পৃথক করিয়াছেন এবং বর্গের প্রথম স্থানে নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহাদের মুখ লম্বা, চোখ ও কাণ ছোট, শ্রবণ ও দর্শনশক্তি তেমন প্রখর নহে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ।

ফল, মুল, শস্য, নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গ শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি ভালুকের প্রধান খাদ্য। মৌ-চাক হইতে কৌশলে মধুপান করিতেও ইহারা খুব পটু। ফল-মূলের অভাব হইলে, পেটের জ্বালায় ইহারা ছোট ছোট প্রাণীও বধ করিয়া খায়। আমেরিকার 'গ্রিজলি' এবং মেরুপ্রদেশের শাদা ভালুক ছোট ছোট জন্তুতে সন্তুষ্ট নহে, বড় বড় জানোয়ার না হইলে তাহাদের চলে না।

ভালুক স্বভাবতঃ নিরীহ ; কিন্তু কোন কারণে উত্তেজিত হইলে, ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। তখন গাছে চড়িয়াও ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলে, দুই পায়ে দাঁড়াইয়া ইহারা দাঁত ও সম্মুখের থাবা ব্যবহার করে।

ইউরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের ভালুক প্রায় সমস্ত শীতকালই গাছের কোটরের বা পর্ব্বতের গুহায় ঘুমাইয়া কাটায়। শীতের শেষে নিদ্রা হইতে জাগিয়া আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে থাকে। গরম দেশের বড় বড় পুং-ভালুককে কিন্তু দারুণ শীতের সময়ও বনে জঙ্গলে ঘুরিতে দেখা যায়। শীতকালে ভালুকীর বাচ্ছা হয় সচরাচর ইহাদের একবারে দুইটি ছানা হইয়া থাকে। তিন সপ্তাহ পরে ছানাদের চোখ ফোটে। ছোটবেলায় পুষিলে ইহারা বেশ পোষ মানে এবং শিখাইতে পারিলে নানা ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ-তামাসা দেখাইতে পারে।

মেটে-ভালুক

ইউরোপের নানা স্থানে, এশিয়ার হিমালয়-প্রদেশে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন জায়গায় মেটে-ভালুক (Brown Bear) দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ ও জলবায়ু-ভেদে ইহাদের আকার ও দেহের বর্ণ ভিন্ন হইয়া থাকে। ইউরোপের মেটে-ভালুক লম্বে প্রায় ৫ হাত, কিন্তু এশিয়ার মেটে-ভালুক ৪ হাতের বেশী হয় না। ইহাদের লোমের রং-ও কিছু ফিকে। এই উভয় ভালুকের খাদ্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন। ইউরোপের মেটে-ভালুক খুব মাংসাশী। ছোট ছোট জানোয়ারে না কুলাইলে, তাহারা গরু, ঘোড়া প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ার পর্য্যন্ত মারিয়া খায়। কিন্তু এশিয়ার মেটে-ভালুক ফল-মূলই বেশী ভালবাসে ; এই সকলের অভাব হইলে, নানা প্রকার পোকা-মাকড় এবং ছোট ছোট জানোয়ার খাইয়া জীবনধারণ করে। আমাদের দেশে সচরাচর এই ভালুককেই নাচিতে শিখান হয়।

কালো-ভালুক

আমেরিকা, এশিয়ার হিমালয়-প্রদেশ এবং মালয়-উপদ্বীপ তিন জাতীয় কালো-ভালুকের জন্মস্থান ; আকারে প্রকারে ইহারা বিভিন্ন।

হিমালয়ের কালো-ভালুক লম্বে সাড়ে তিন হাত হইতে কখনো চারি হাতেরও বেশী হয়। ইহাদের উপরের ঠোঁট সাদা, নাক লাল্‌চে এবং নখ কালো ; গায়ের রং মিশ্‌মিশে কালো। কেবল বুকের উপর ইংরাজি 'ভি'র (V) ন্যায় হাঁসুলির আকারে কতকগুলি সাদা লোম দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের ফল, মূল ও পাতা খাইতে অনেক সময় ইহারা গাছে চড়িয়া থাকে। ইহারা বেশ সাঁতার দিতেও পারে।



হিমালয়ের কালো-ভালুক

এই জাতীয় ভালুক একেবারে নিরামিষভোজী নহে, কখনো কখনো ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতিও মারিয়া খায়। ইহাদের স্বভাব বড়ই উগ্র ; কিছুতেই পোষ মানিতে চাহে না। কাহাকেও সম্মুখে দেখিলে ছুটিয়া তাড়া করিয়া যায়।

উত্তর আমেরিকার কালো-ভালুক কিন্তু এত বড় হয় না। ইহাদের মাথা ছোট, মুখ সরু এবং সম্মুখের দুই পা একটু বড়। গায়ের রং আগাগোড়াই কালো, কেবল মুখের দিক কটা। হিমালয়ের কালো ভালুকের ন্যায় ইহারাও নানা রকম ফল, মূল, শস্য এবং হাঁস, ছাগল, ভেড়া, ইঁদুর, ব্যাঙ প্রভৃতি খাইয়া, জীবন ধারণ করে। শূকরের মাংসে ইহাদের বেজায় লোভ। অনেক সময় ইহারা শূকরের সন্ধানে গৃহস্থের বাড়ীতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। আমেরিকায় এই ভালুকের মাংস মানুষের খাদ্যের মধ্যে গণ্য। এমন কি, সেখানকার সুসভ্য সাহেবেরাও ইহা তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। শীতকালেই না কি এই মাংস বিশেষ উপাদেয়।

মালয়-উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও প্রভৃতির দ্বীপে আর এক রকম কালো-ভালুক, আছে, আকারে ইহারা আমেরিকার কালো-ভালুক অপেক্ষাও ছোট। ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম ও গারো-পর্ব্বতে কখনো কখনো এই ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের নানা প্রকার ফল-মূলই ইহাদের প্রধান খাদ্য। অভাবে ইহারা ছোট ছোট জন্তুও আহার করে।

ভারতবর্ষীয় ভালুক

আমাদের দেশে, নানা স্থানের পাহাড়-পর্ব্বত এবং বন-জঙ্গলে একজাতীয় ভালুক (Indian Sloth Bear) বাস করে, ইহাদের দেহের আগাগোড়াই কালো, কেবল মুখের শেষদিক্ ধূসর। লম্বে ইহারা তিন হাতের বেশী হয় না। হিমালয়ের কালো-ভালুকের ন্যায় ইহাদেরও বুকের উপর হাঁসুলির আকারে সাদা লোম থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ নিরামিষভোজী ; ফল-মূল খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। মহুয়া ফল পাইলে, ইহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। তাহা ছাড়া, নানা প্রকার শস্য, আক ও উইঢিবি ভাঙিয়া উই খাইতে এবং কৌশলে মৌ-চাক হইতে মধুপান করিতে ইহারা খুব ওস্তাদ। অন্যান্য ভালুক অপেক্ষা ইহাদের দাঁতের সংখ্যা ২টি কম। সাধারণতঃ ইহারা একসঙ্গে দুইটি বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষ ভাগে ইহাদের চক্ষু ফুটে।

গ্রিজ্‌লি ভালুক

উত্তর-আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রিজ্‌লি ভালুক (Grizzly) দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বে ইহারা ছয় হাতের কম নহে। মেরু-প্রদেশের সাদা-ভালুক ছাড়া আর কোন ভালুকই এত বড় হয় না। ইহাদের গায়ের রং ধূসর। ভালুক জাতির মধ্যে গ্রিজ্‌লি ও সাদা-ভালুক বেজায় মাংসাশী। সময় সময় ফল-মূল খাইলেও, মাংসই গ্রিজ্‌লির প্রধান খাদ্য। ইহারা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ; বড় বড় বাইসন এবং গরু, ঘোড়া


গ্রিজ্‌লি ভালুক

প্রভৃতি অক্লেশে শিকার করিয়া থাকে। ইহাদের বিক্রমে মানুষ্ পর্য্যন্ত শঙ্কিত।

গ্রিজ্‌লির নখ এমন যে, তাহা দ্বারা গর্ত্ত খুঁড়িবার কাজও বেশ চলে। বড় বড় জন্তু মারিয়া ইহারা যতটা পারে তখনি খায়, বাকী মাংস গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে পুতিয়া রাখে এবং যতদিন না সমুদয় মাংস শেষ হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ তাহা খাইয়া থাকে ; মাংস পচিয়া উঠিলেও ইহাদের অখাদ্য হয় না।

গ্রিজ্‌লি মানুষ দেখিলে সহসা কিছু বলে না বটে, কিন্তু শিকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। বন্দুকের গুলিতে সমুদয় শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহারা শিকারীকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হয় না। এ বিষয়ে অন্যান্য ভালুকও প্রায় গ্রিজ্‌লিরই মত। বিশেষ রকম আহত হইলেও ভালুকের প্রাণ সহজে বাহির হয় না। তবে হৃদপিণ্ডে বা মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে ইহাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

সাদা-ভালুক

মেরুপ্রদেশ এই জাতীয় ভালুকের জন্মস্থান। উত্তর আমেরিকার গ্রিজ্‌লি ভালুকের মত ইহারাও ভয়ানক মাংসাশী। ইহাদের বাসস্থান মেরুপ্রদেশে, সেখানে গাছপালা কিছুই নাই ; সুতরাং মাংস ভক্ষণ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ?

সাদা-ভালুক (Polar Bear) আকারে গ্রিজ্‌লি অপেক্ষা বড়। ইহাদের দেহে অসাধারণ বল এবং মেজাজ ভারি কড়া। এই জাতীয় ভালুকের পায়ের পাতাতেও লম্বা লম্বা লোম জন্মে, তাই পিচ্ছিল বরফের উপর দিয়া সহজেই চলা-ফেরা করিতে পারে। সাদা-ভালুক প্রধানতঃ সীল, শিশুক ও মাছ খাইয়াই জীবন ধারণ করে।


সাদা-ভালুক

ইহাদের পায়ের পাতা চওড়া, এজন্য বেশ সাঁতার দিতে পারে। জলের মধ্যে পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া ইহারা অক্লেশেই মাছ ধরিয়া খায়। এ রকমে সীল ধরা কিন্তু সহজ নহে; তাই কলে-কৌশলে সে কাজ হাসিল করে। মেরুপ্রদেশের জল-স্থল প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকে। এই সকল বরফ ভাঙ্গিয়া মাঝে মাঝে গর্ত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। সীল ধরিবার জন্য সাদা-ভালুক এইরূপ গর্ত্তের কাছে ওৎ পাতিয়া বসে। সীল নিশ্বাস লইবার জন্য যেই মাথা উঁচু করে, অমনি ইহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলে। কখনো কখনো ইহারা সাঁতার দিতে দিতে মরা তিমির দেহ দেখিতে পায়। তখন কতকগুলা এক সঙ্গে জড় হইয়া সেই মাংস খাইয়া থাকে। যদি নিতান্তই কোনও রকম মাংস না জুটে, তবে জলজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়াই ইহারা প্রাণরক্ষা করে।

সেই ভয়ানক শীতের দেশেও সাদা-ভালুক সমস্ত শীতকাল ঘুমাইয়া কাটায় না। ভালুকী কিন্তু বরফের গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজ নিজ শরীরের উত্তাপে ইহারা গহ্বরের মধ্যে বেশ আরামে থাকে। দেহের সঞ্চিত মেদরাশি খাদ্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করিয়া, সমুদয় শীতকাল ইহাদের জীবন রক্ষা করে। শীতের পরই সাদা-ভালুকীর বাচ্ছা হয়।

রেকুন-বংশ

ভালুকের সহিত কোন কোন বিষয়ে রেকুন-বংশীয় জন্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই কারণেই ইহারা ভল্লুক পরিবারের অন্তর্গত একটি বংশ। আমেরিকার 'কিংকাজু,' 'কোয়াটি' এবং নেপালের 'পাণ্ডা' এই বংশের জন্তু।

রেকুন (Raccoon) আমেরিকা-বাসী। লম্বে ইহারা লেজশুদ্ধ দুই হাত। ইহাদের শরীর মাংসল, মাথা চওড়া, মুখ সরু এবং কাণ ছোট। রেকুনের পিঠের লোম তেমন বড় হয় না, কিন্তু উহার দুই পাশে বড় বড় লোম জন্মে; শরীরের উপর দিক্ গাঢ় কটা, নীচের দিক্ ফিকে। ইহাদের লেজ দশ ইঞ্চি; সচরাচর তাহাতে পাঁচটা কালো ও পাঁচটা সাদা বেড় থাকে।

ভালুকের ন্যায় ইহাদেরও দাঁতের সংখ্যা ৪২ এবং প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া ধারালো নখযুক্ত আঙ্গুল। রেকুনও পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলে।

রেকুনে খায় না, এমন জিনিস অল্পই আছে। কাঁকড়া, ঝিনুক, ইঁদুর, ব্যাঙ, পোকা, মাকড়, ফল, শস্য—সবই ইহাদের খাদ্য। কাঠবিড়ালের মত পিছনের দুই



রেকুন

পায়ে ভর দিয়া বসিয়া, ইহারা সম্মুখের দুই পায়ে খাদ্যদ্রব্য ধরিয়া মুখে দেয়। ইহাদের একটি অভ্যাস বড়ই অদ্ভুত—ইহারা কোন কিছু খাইবার পূর্ব্বে খাদ্যবস্তুটিকে জলে ধুইয়া লয়।

উদ্বিড়াল-বংশ

এই বংশীয় জন্তুদের দেহের ছাঁদ সরু ও লম্বা, মুখ ছুঁচল, লেজ বড় এবং পা ছোট। ইহারা ইচ্ছামত শরীর গুটাইতে, ফিরাইতে ও বাঁকাইতে পারে। অন্যান্য মাংসাশী জন্তুর ন্যায় ইহাদেরও কুকুরে-দাঁত বড় ও ধারালো, কোন কোনটার চর্ব্বণ-দন্তও তীক্ষ্ণ। ইহাদের প্রতি পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল থাকে।

এই বংশীয় জন্তুগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত :—

১। গেছো-নেউল ও গ্লটন।
২। মধুভুক্।
৩। উদ্বিড়াল।



গেছো-নেউল

ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার নানাস্থানে এই জাতীয় কতকগুলি জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ইংরেজী নাম 'মার্টেন', 'সেবল', 'আর্‌মাইন', 'উইসেল', 'ব্যাজার' প্রভৃতি। কিন্তু সকলেই একবংশভুক্ত বলিয়া বাঙ্গালায় ইহাদিগকে গেছো- নেউল বলা হয়। ইহাদের সকলেই প্রায় হিমপ্রধান দেশ-বাসী। আকারে সকলে কিন্তু এক রকম নহে ; হিমালয়-প্রদেশের 'মার্টেন্' জাতীয় গেছো-নেউল লেজ- শুদ্ধ প্রায় দুই হাত। সাইবিরিয়ার সেবল' এত বড় হয় না। নেপাল ও সাইবিরিয়ার 'আর্‌মাইন' আকারে আরো ছোট—লেজ বাদে লম্বে আধ হাতের বেশী নহে। 'উইসেল সব চেয়ে ছোট। গায়ের রংও সকলের ভিন্ন ভিন্ন ; জাত হিসাবে কোনটা সাদা, কোনটা ঘন মেটে, কোনটা বা কালো। ইহাদের পিঠ ও মাথার রং অপেক্ষা বুক, পেট ও গলার রং বেশী ফিকে হইয়া থাকে। 'ব্যাজার' নেপাল, সিকিম, আসাম, শ্রীহট্ট, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়। হিন্দীতে ইহাদের "ভালু-শূয়ার" বলে। ইহারাও লম্বায় প্রায় দুই হাত হয়।



১। মার্টেন ২। সেবল্ ৩। আর্‌মাইন ৪। উইসেল্

গেছো-নেউল প্রায় গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায় ; সময় সময় মাটিতেও বিচরণ করে। সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, খরগোস, কাঠবিড়াল এবং পাখী ও পাখীর ডিম ইহাদের খাদ্য ; সময় সময় ফল-মূলও খাইয়া থাকে। ইহারা ভয়ানক হিংস্র ও রক্তপিপাসু ; ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যতটা দরকার, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাণিবধ

করে এবং মৃত প্রাণীর কেবল রক্ত ও মস্তিষ্ক খাইয়া বাকী অংশ ফেলিয়া দেয়। গেছো-নেউল বড় বড় জন্তুকেও আক্রমণ করিতে ভীত হয় না; বাগে পাইলে, মানুষের দেহও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়। বাড়ীতে ঢুকিয়া ইহারা হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া মারিয়া গৃহস্থের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। এই বংশীয় প্রাণী হিংস্র হইলেও বেশ পোষ মানে এবং ক্ষেতের ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি মারিয়া কৃষকের যথেষ্ট উপকার করে।

গ্লটন্

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা গ্লটনের (Glutton) জন্মস্থান। নেপাল ও আরাকানে ইহাদের একজাতকে (HELICTIS) দেখা যায়। লেজশুদ্ধ লম্বে ইহারা দুই হাতেরও বেশী। ইহাদের চেহারা কতকটা ভালুকের মত; লেজ তেমনি ছোট ও ঝাঁকড়া এবং চলিবার রীতিও প্রায় সেইরূপ। ইহাদের শরীরের দুই পাশে ও মুখের দুই ধারে কটা-রংএর লোম জন্মে; বাকি লোম কালো।



গ্লটন্

গ্লটন্ অতিশয় ধূর্ত্ত। শিকারী বহু চেষ্টাতেও ইহাদিগকে মারিতে পারে না। ফাঁদ পাতিলে কৌশলে 'চার' খাইয়া, ফাঁদ ছিঁড়িয়া পলায়ন করে। পেটের জ্বালায় ইহারা সর্ব্বদাই অস্থির। এমন পেটুক জন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পচা, ধ্বসা যেমন মাংসই হ'ক, ইহারা তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। খাইতে খাইতে পেট ফুলিয়া দম্-সম্ হইলেও গ্লটনের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। ইহারা ছোট ছোট প্রাণী সহজেই মারিতে পারে। কলে-কৌশলে বড় বড় জন্তুও মারিতে ছাড়ে না। ইহাদের আর এক নাম "উলভারেন" (Wolverene)। নেপালীরা ইহাদের 'ওকার' বলে।

মধুভুক্

গ্লটনের ন্যায় মধুভুক্ও এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা-বাসী। ভারতবর্ষের নিম্নবঙ্গ ছাড়া আর প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতে ইহাদের 'র‍্যাটেল' (Ratel) বলে।

লেজশুদ্ধ ইহারা দুই হাতের কিছু বেশী। ইহাদের পিঠে ও দেহের দুই পাশে বড় বড় ধূসর বর্ণের লোম জন্মে; কিন্তু পেট এবং পায়ের লোম ছোট ও কালো।



মধুভুক

মধুভুকের প্রতি পায়ে পাঁচটা আঙ্গুল থাকে। সম্মুখের পায়ের নখগুলি পিছনের পায়ের নখ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারাও ঠিক ভালুকের মত পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলে।

মধুভুক্ মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে; দিনের বেলা গর্ত্তের মধ্যেই থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা নানা-প্রকার পোকা, মাকড়, ইঁদুর, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে। অত্যন্ত মধুপ্রিয় বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে 'মধুভুক্'। ইহাদের লেজ-মূলের গ্রন্থি হইতে তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

উদ্বিড়াল-বংশ

উদ্বিড়ালের আর এক নাম 'ধেড়ে'; স্থানবিশেষ 'ভোঁদড়' (Otter) নামও চলিত আছে। ইহারা লম্বে প্রায় আড়াই হাত। ইহাদের গায়ের রং—উপরের দিক কটা, নীচের দিক ধূসর; মাথা ও মুখ চেপ্টা, পা ছোট এবং আঙ্গুল পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া; সেই জন্য সাঁতার দিবার শক্তি খুব বেশী। জলে নামিবার সময় ইহারা ডিগবাজী খাইয়া লাফাইয়া পড়ে।

উদ্বিড়াল খাল, বিল, নদী এবং পুকুরের ধারে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। দিনের বেলা ইহারা প্রায় গর্ত্তের মধ্যেই থাকে: সন্ধ্যার পর আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। মাছের এমন শত্রু আর নাই; ছোট বড় যে মাছ সম্মুখে দেখে, তাহারই ঘাড় ভাঙ্গে। উদ্বিড়াল ভয়ানক বিলাসী। খারাপ মাছ ভুলিয়াও মুখে দেয় না; এমন কি, খুব ভাল মাছেরও মাথা এবং পেটের কোমল অংশমাত্র খাইয়া বাকীটা ফেলিয়া দেয়!



উদ্বিড়াল

উদ্বিড়াল সহজেই পোষ মানে। পোষা উদ্বিড়াল দ্বারা দরকার মত মাছ

ধরাইয়া লওয়া কিছুই কঠিন নহে। ইহাদের কোমল চর্ম্ম খুব মূল্যবান।

বিড়ালাদি

বিড়াল-বংশ

আকারে ছোট হইলেও বিড়াল সামান্য প্রাণী নহে। বাঘ, সিংহ, চিতা, পুমা প্রভৃতির সহিত ইহার সম্পর্ক অতি নিকট—একই বংশে সকলের জন্ম।

তোমরা বিড়ালের থাবা দেখিয়াছ কি? ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ইহাদের সম্মুখের পায়ের থাবায় পাঁচটি করিয়া এবং পশ্চাতের পায়ের থাবায় চারিটি করিয়া শক্ত ও ধারালো নখযুক্ত আঙ্গুল আছে। নখের উপর বিড়ালের ভারি যত্ন; চলা-ফেরা করিতে মাটিতে লাগিয়া পাছে ভোঁতা হইয়া যায়, এই ভয়ে বিড়াল তাহার নখগুলি সর্ব্বদাই থাবার মধ্যে লুকাইয়া রাখে, কেবল শিকার ধরিবার সময় সেগুলি বাহির করে। কোন কারণে উত্তেজিত হইলেও ইহাদের নখ আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের নীচে কোমল মাংসপিণ্ড থাকে, সেইজন্য চলিবার সময় কোন শব্দ হয় না।



বিড়ালের নখ নখ-গুটানো থাবা

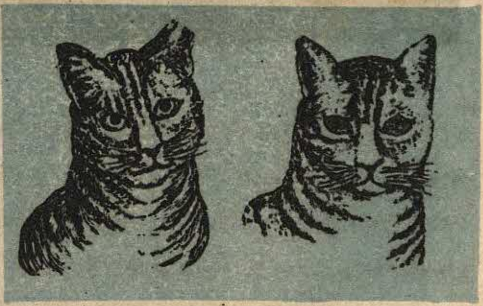
তারপর, বিড়ালের দাঁতের কথা শোন। ইহাদের মুখে সবশুদ্ধ ৩০টা দাঁত আছে। তাহার মধ্যে ৪টি খুব বড়, ছুঁচ্‌ল ও শক্ত। ঐ ৪টি বিড়ালের কুকুরে-দাঁত। উহা দ্বারাই ইহারা শিকার ধরিয়া থাকে। কুকুরে-দাঁত ছাড়া বিড়ালের দুই মাঢ়ীর সম্মুখের দিকে ৬টা করিয়া ১২টা ছেদন-দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শিকার ধরিয়া তাহার দেহ হইতে মাংস ছিঁড়িবার পক্ষে এই দাঁতগুলির বিশেষ প্রয়োজন। বাকী ১৪টি ইহাদের চিবাইবার দাঁত—উপর পাটীর দুই কসে ৮টি এবং নীচের পাটীর দুই কসে ৬টি। ইহারা গরু, ঘোড়া প্রভৃতির মত খাদ্যবস্তু চিবাইয়া খায় না; টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া গিলিয়া ফেলে। সেই জন্য ইহাদের চর্ব্বণ-দন্ত চেপ্টা না হইয়া কাঁচির ফলকের ন্যায় ধারালো। বিড়ালের জিভ্‌ খুব কর্কশ; হাড় হইতে মাংস ও রক্ত চাটিয়া খাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।



মুখ জিভ দাঁত

এখন চোখের তারার কথা বলি। দিন ও রাত্রির মধ্যে ইহাদের চোখের তারার বিলক্ষণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। যতক্ষণ সূর্য্যের আলো প্রখর থাকে, ততক্ষণ বিড়ালের চোখের তারা সামান্য একটা রেখার ন্যায় দেখায়। কিন্তু আলোক যতই কমিয়া আসে, উহা ততই বিস্তৃত ও গোলাকার হইতে থাকে। রাত্রিতে সূর্য্যের আলো থাকে না, তখন বিড়ালের চোখের তারা একেবারে পূরা গোলাকার হইয়া উঠে।

বিড়ালের মাথা প্রায় গোল। ইহাদের মুখের দুই পাশে কয়েক গাছি করিয়া গোঁফ থাকে। বিড়াল ইচ্ছা করিলে, নিজেই শরীর ফুলাইতে অথবা কুঞ্চিত করিতে পারে। শিকার ধরিবার জন্য অনেক সময় ইহারা নিজ নিজ শরীর কুঞ্চিত করিয়া অতি অল্প পরিমাণ স্থানে লুকাইয়া থাকে।



চোখের তারার হ্রাস-বৃদ্ধি

বিড়ালের কথা মোটামুটি এক রকম শুনিলে। বিড়ালের নখ, দাঁত ও চোখের তারার সহিত বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বিড়াল-বংশীয় আর সকল পশুরই নখ, দাঁত ও চোখের তারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহারাও আপন আপন নখগুলি যত্নপূর্ব্বক থাবার ভিতর লুকাইয়া রাখে। তাহাদের মুখেও বিড়ালের ন্যায় ৩০টা-করিয়া দাঁত। তাহারাও বড় বড় কুকুরে-দাঁতে শিকার ধরিয়া, ছেদন-দন্তে মাংস ছিঁড়িয়া এবং চিবাইবার দাঁতে উহা টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া গিলিয়া ফেলে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতির চোখের তারার হ্রাস-বৃদ্ধিও ঠিক বিড়ালের চোখের তারারই মত।

শিকারের আশায় শরীর কুঞ্চিত করিয়া অল্প পরিমাণ স্থানে লুকাইয়া থাকিতে বাঘ সিংহও খুব পটু। বিড়াল যেরূপে ইঁদুর ধরে, বাঘ সিংহও ঠিক সেইরূপে বড় বড় জানোয়ার মারিয়া থাকে। ইহাদের সকলের চাল-চলনও একরূপ। বিড়ালের সহিত বিড়াল-বংশীয় সব পশুরই সকল বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল,—প্রভেদ কেবল আকারে; বিড়াল ছোট, বাঘ-সিংহ প্রভৃতি বড়। তোমরা যদি বিড়ালকে 'ছোট বাঘ' এবং বাঘকে 'বড় বিড়াল' বল, তাহাতে কিছুই ভুল হইবে না।

সিংহ

সিংহের (Lion) আর এক নাম পশুরাজ। আফ্রিকার নানাস্থানে এবং এশিয়ার পারস্য ও আরব দেশে সিংহ বাস করে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের গুজরাট, কচ্ছ ও মধ্যপ্রদেশ



সিংহ

সিংহের বাসভূমি ছিল, কিন্তু এখন কাটিওয়ারের জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও সিংহ নাই। তাহাও না থাকিবারই মধ্যে। ভারতবর্ষে সিংহ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সিংহের মাথা, ঘাড় ও গলায় ঘন ঘন লম্বা কেশর জন্মিয়া থাকে; এই জন্য ইহাদিগকে খুব জমকালো দেখায়। আর এই চেহারার জন্যই ইহাদের নাম হইয়াছে পশুরাজ। কিন্তু নামে রাজা হইলেও সাহস অথবা বিক্রমে সব সময়ে সিংহের তেমন সুখ্যাতি করা যায় না। এই দুই বিষয়ে বরং বাঘই শ্রেষ্ঠ। তাহার বাস্তবিক সাহস আছে। শত্রু যতই বলশালী হউক না, বাঘ তবু 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইতে পারে।

সিংহ লম্বে লেজশুদ্ধ প্রায় সাড়ে ছয় হাত, উঁচুতেও আড়াই হাতের কম নহে। সাধারণতঃ ইহাদের গায়ের রং পিঙ্গল। সকলের রং কিন্তু এক রকম নহে; কাহারো ফ্যাকাসে, কাহারো ঘন। কেশরের রং-এও একটু-আধটু প্রভেদ দেখা যায়; কাহারো কাহারো কিছু বেশী কালো। সিংহ রাগিয়া উঠিলে কেশর ফুলায়। তখন ইহাদিগকে অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। সিংহের লেজের ডগায় এক গোছা চুল থাকে। বিড়াল-বংশীয় আর কোন পশুরই কেশর নাই, লেজে চুলের গোছাও নাই। সিংহ অপেক্ষা সিংহী আকারে ছোট। তাহার কেশর হয় না।

সমস্ত দিন বনে জঙ্গলে অথবা পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া থাকিয়া, সিংহ সূর্য্যাস্তের পর আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। শিকার দেখিতে পাইলে ইহারা নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং কাছাকাছি গিয়া হঠাৎ লাফ দিয়া তাহার উপর পড়ে। সিংহের থাবার এক আঘাতে বড় বড় গরু, মহিষের মাথার খুলি ও পিঠের দাঁড়া গুঁড়া হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের নখ এত তীক্ষ্ণ যে, তাহা দ্বারা অনায়াসেই গরু, ঘোড়া প্রভৃতির পেট চিরিয়া ফেলিতে পারে।

সিংহ দল বাঁধিয়াও বিচরণ করে, আবার কখন কখন কেবল নিজের পরিবার

অর্থাৎ একটা সিংহী এবং কয়েকটা বড় বড় বাচ্ছা লইয়াও বিচরণ করে। সময় সময় পাঁচ ছয় জোড়া সিংহ ও সিংহী এক এক দলে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন শিকারটা চলে ভাল। কিন্তু একাকী বড় জন্তু শিকার করিতে হইলেই মুস্কিল। সম্মুখযুদ্ধে সিংহের সাহস বড়ই কম। তবে লুকাইয়া কাজ হাসিল করিতে ইহারা বেশ পটু।



সিংহ ও সিংহী

ইহাদের গর্জ্জন অতি ভয়ঙ্কর। একবার আরম্ভ করিলে একাদিক্রমে পাঁচ ছয় বার গর্জ্জন করে। এই শব্দ প্রথমে খুব উচ্চে উঠিয়া, ক্রমশঃ নামিয়া আসিতে থাকে। কখনো কখনো চার পাঁচটা সিংহ একসঙ্গে ডাকিতে আরম্ভ করে। তখন বাস্তবিকই মেঘগর্জ্জন বলিয়া ভুল হয়। বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঘন ঘন গর্জ্জন করা ইহাদের একটা অভ্যাস।

মহত্ত্ব, দয়া প্রভৃতি সিংহের অনেক গুণের কথাই শুনিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই সত্য নহে। বাঘের ন্যায় ইহারাও কখন কখন অকারণে

অনেক পশুবধ করিয়া থাকে, কখন কখন প্রয়োজন মত মারিয়াই ক্ষান্ত হয়। এই উভয় প্রাণীর মধ্যে যাহাদের বয়স একটু বেশী, তাহারা প্রায়ই অকারণে পশুবধ করে না। ইহাদের বাচ্ছাগুলা কিন্তু শিকারে পটু হইবার জন্য, সুযোগ পাইলেই পশুবধ করিয়া থাকে।

তিন বৎসর অন্তর সিংহীর বাচ্ছা হয়। এক একবারে দুইটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত বাচ্ছা হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাদের গাঁয়ে বাঘের ন্যায় ডোরা থাকে। বয়স বৃদ্ধির সহিত ক্রমে তাহা মিলাইয়া যায়। দশ বার মাস বয়সে সিংহের বাচ্ছা ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি শিকার করিতে পারে। তিন বৎসর পূর্ণ হইলে, তাহারা মায়ের আশ্রয় ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। এই সময় তাহাদের কেশর উঠিতে আরম্ভ হয়।

বিড়াল-বংশীয় অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সিংহেরও নিজের বাচ্ছা মারিয়া ফেলিবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কেবল সিংহীর চেষ্টা ও কৌশলে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে। সিংহী প্রাণপণ যত্নে ছানাগুলিকে পালন করে। ছানাগুলি একটু বড় হইলে, সিংহী যখন তখন পশুবধ করিয়া তাহাদিগকে শিকার-কৌশল শিক্ষা দেয়।

ছোটবেলায় পুষিলে, সিংহও পোষ মানে এবং পালককে খুব ভালবাসে।

বাঘ



বাঘ

দেখিতে সিংহের মত জমকালো না হইলেও, বাঘের চেহারা আরো বেশী সুন্দর। সাহস এবং বিক্রমেও বোধ করি বাঘই শ্রেষ্ঠ।

ডোরাদার বড় বাঘ কেবল এশিয়াতেই বাস করে। চীন সাম্রাজ্য হইতে ককেসাস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সাইবিরিয়া হইতে ভারতের দক্ষিণ-সীমা পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দ্বীপে এবং ব্রহ্মদেশেও বিস্তর বাঘ আছে। আমাদের দেশে সুন্দরবন, আসাম, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং মধ্যভারত বাঘের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের ইংরাজি নাম

'টাইগার' (Tiger) ; হিন্দী 'শের'।

বাঘ উঁচুতে সিংহ অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু লম্বে কিছু বড়। সচরাচর ইহারা লেজশুদ্ধ প্রায় সাত হাত হইয়া থাকে। ক্বচিৎ দুই একটা বাঘ ইহা অপেক্ষাও বড় হয়। কিন্তু সিংহ কখনও সাড়ে ছয় হাতের বেশী হয় না। বাঘের গায়ের রং হল্‌দে, তাহার উপর কালো কালো ডোরা। সেই সকল ডোরা পিঠ হইতে পেটের দিকে নামিয়াছে। ইহাদের পেটের রং প্রায় সাদা, তাহার উপর ডোরা নাই। বাঘের লেজটিও সুন্দর,—হল্‌দে রংএর উপর সারি সারি কালো বেড়। বাঘিনী আকারে কিছু ছোট হইলেও বিক্রমে প্রায় বাঘেরই সমান।

সময় সময় বাঘ একাকী বিচরণ করে, আবার কখনো কখনো বাঘিনী এবং বাচ্ছাগুলিকেও সঙ্গে লইয়া থাকে। ইহারা নদী ও খালের ধারে, নিবিড় জঙ্গলে অথবা বড় বড় ঘাসের বনে সারাদিন কাটাইয়া, রাত্রিতে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। শরীর প্রকাণ্ড হইলেও, বাঘ তাহা কুঞ্চিত করিয়া সামান্য ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। শিকার দেখিলে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নখ ও দন্তের আঘাতে ঘাড় মোচ্‌ড়াইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। ছোট ছোট জন্তুদিগকে ইহারা শুধু থাবার আঘাতেই বধ করিয়া থাকে। ইহারা দিনের বেলা যে সব জন্তু মারে, তাহাদের মৃতদেহ টানিয়া লইয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। সন্ধ্যার পর চুপি চুপি আসিয়া উহা আহার করে। সুবিধামত শিকার না জুটিলে, বাঘ অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে। অনেক সময়, ক্রম্যান্বয়ে আট নয় দিন বিনা জলপানেও কাটাইয়া দেয়। কখনো কখনো টাট্‌কা মাংসের অভাবে সিংহ ও বাঘকে পচা মাংসও খাইতে দেখা গিয়াছে।

ইহাদের গায়ে বিষম জোর। বড় বড় গরু ও মহিষ মারিয়া তাহাদের মৃতদেহ মুখে করিয়া ইহারা অক্লেশে অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। পথে নালা অথবা বেড়া পড়িলে সেই প্রকাণ্ড বোঝাশুদ্ধ তাহা ডিঙ্গাইতেও কিছুমাত্র কষ্টবোধ করে না। সিংহের ন্যায় ইহারাও থাবার এক আঘাতে মহিষের কপালের হাড় ও পিঠের দাঁড়া গুঁড়া করিয়া ফেলে।

সাধারণতঃ বাঘ মানুষকে ভয় করিয়াই চলে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে, যখন বন্য পশু বধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া গৃহস্থের পালিত গরু, ছাগল প্রভৃতি নিরীহ পশু মারিয়া উদর পূর্ণ করিতে হয়। গরু, ছাগল মারিতে মারিতে ক্রমে রাখালেরও ঘাড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তাহার মানুষের ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। একবার ভয় ভাঙ্গিয়া যাইলে এবং মানুষের রক্ত-মাংসের আস্বাদন পাইলে বাঘ ছলে-বলে-কৌশলে যেরূপে পারে;

মানুষ মারিয়া বধ করিতে থাকে। এই সময় উহারা অধিকতর হিংস্র হইয়া উঠে। জঙ্গলে অন্য খাদ্য না জুটিলে, অল্পবয়স্ক বাঘকেও মানুষ মারিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে।

বাঘ বেশ সাঁতার দিতে পারে। অনেক সময় শিকারের চেষ্টায় ইহারা নদী অথবা খাল পার হইয়া যায়। প্রবল বন্যার সময় ইহাদিগকে গাছে চড়িতেও দেখা গিয়াছে। ইহারা কিন্তু একেবারে সোজা গাছে চড়িতে পারে না।

সিংহীর ন্যায় বাঘিনীরও তিন বৎসর অন্তর বাচ্ছা হয়। বাঘ টের পাইয়া



বাঘ ও বাঘিনী

পাছে ছানাগুলিকে মারিয়া ফেলে, সেই ভয়ে বাঘিনী তাহাদিগকে লুকাইয়া পালন করিতে থাকে। ছানাগুলি একটু বড় হইলে, তাহাদিগকে শিকার-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য বাঘিনী অকারণ অনেক পশুহত্যা করে। তিন বৎসর পূর্ণ হইলে, বাঘের ছানা স্বাধীনভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। বড় বাঘ অপেক্ষা এই ছানাগুলি বেশী হিংস্র ও অত্যাচারী হইয়া থাকে।

বাঘ, সিংহ এরূপ দুর্দ্দান্ত হইলেও কখনো কখনো মহিষ ও কুমীরের নিকট ইহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইতে দেখা যায়। পালের কোন বাচ্ছা মহিষকে আক্রমণ করিলে, সময় সময় মহিষের দল ক্ষেপিয়া শিং-এর গুঁতায় বাঘ ও সিংহের দফা শেষ

করিয়া ফেলে। কুমীরও বাগে পাইলে ইহাদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিতে ছাড়ে না।

ছোটবেলায় পুষিলে, বাঘও পোষ মানে এবং ইহাদের স্বভাবের উগ্রতাও অনেকটা কমিয়া যায়।

চিতাবাঘ

চিতাবাঘের (Pard) আর এক নাম গুলবাঘ। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা ইহাদের জন্মস্থান। এশিয়ার নানা স্থানে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশে বিস্তর চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বাঘের মত ইহাদের গায়ে ডোরা থাকে না, কালো চাকা চাকা দাগ থাকে। ঐ দাগ হইতেই ইহাদের নাম হইয়াছে চিতাবাঘ।



চিতাবাঘ

আকারে বড়বাঘ অপেক্ষা ইহারা অনেক ছোট ; লেজশুদ্ধ বড় জোর ছয় হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের বলও বড় বাঘের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু ইহারা খুব বেশী চটপটে ও চালাকচতুর। বড় বাঘ সোজা গাছে চড়িতে পারে না, চিতাবাঘ শুধু যে সোজা গাছে চড়ে, তাহা নহে, ডালে ডালেও অনায়াসে লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। ইহারা ইচ্ছা করিলে লতাপাতার ঝোপে এমন কৌশলে লুকাইয়া থাকিতে পারে যে, খুব নিকট হইতেও ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। অনেক সময় ইহারা ডালে বসিয়াই শিকারের জন্য অপেক্ষা করে এবং সুবিধামত কোন জন্তু দেখিলে, অমনি তাহারা পিঠে লাফাইয়া পড়ে।

সকল দেশের চিতাবাঘের চেহারা এক রকম নহে। ভারতবর্ষে আরেক প্রকারের চিতাবাঘই (Panther) বেশী। ইহারা প্রথমোক্ত অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট। ইহা ছাড়া আরও ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারো ছাঁদ লম্বা, কাহারো মাথা বড় কাহারো লেজ মোটা, কাহারো লোম ঘন। ইহাদের গায়ের রং কাহারো ফিকে হল্‌দে, কাহারো গাঢ় হল্‌দে গায়ের চক্র— কাহারো বেশ বড়, তাহার মাঝখানে ফাঁকা ; আবার কাহারো বা ছোট, তাহার প্রায় সমস্তটাই কালো। মাঝে মাঝে আগাগোড়া কালো অথবা সাদা রং-এর চিতাবাঘও দেখা যায়। ইংরাজিতে চিতাবাঘকে 'লেপার্ড'-ও (Leopard) বলিয়া থাকে।

ইহারা পশু, পক্ষী, মাছ—যাহা পায় তাহাই ধরিয়া খায় ; তবে কুকুর ও শিয়ালের



চিতাবাঘের মাছধরা

মাংস বেশী ভালবাসে ; গাছে চড়িয়া বানর ধরিয়া খাইতেও খুব পটু। চিতাবাঘ ভয়ানক ধূর্ত্ত ; সন্ধ্যার পর গ্রামে ঢুকিয়া হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, বাছুর প্রভৃতির ঘাড় মট্‌কাইয়া উদর পূর্ণ করে। কখন কখন ইহারা অতি অদ্ভুত কৌশলে কুকুর ধরিয়া থাকে ; রাত্রিতে গ্রামের ধারে কোন জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া হুঙ্কার ছাড়ে, অমনি গ্রামের যত কুকুর, চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। অবসর বুঝিয়া চিতাবাঘ অগ্রবর্ত্তী কুকুরটাকে লইয়া প্রস্থান করে। থাবা মারিয়া মাছ শিকার করিতেও ইহারা আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

ইহারা মানুষকে খুব ভয় করে, কিন্তু কোন গতিকে একবার ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে, ভয়ানক সাহসী হইয়া উঠে। তখন আর কাহারো রক্ষা নাই। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, মধ্য-ভারতের জঙ্গলে একটা চিতাবাঘ প্রায় তিন শত লোক মারিবার পর, একজন এদেশী শিকারীর বন্দুকে নিহত হইয়াছে।

ছোটবেলায় পুষিলে চিতাবাঘ বেশ পোষ মানে এবং পালকের খুব বাধ্য হয়। মানুষের আদর পাইবার জন্য তখন ইহারা বিড়ালের মত গা ঘেঁষিয়া চলে।

জ্যাগুয়ার

আমেরিকার চিতাবাঘের নাম জ্যাগুয়ার (Jaguar)। ইহা অপেক্ষা বড় বাঘ আমেরিকায় আর নাই। জ্যাগুয়ার সাধারণ চিতা অপেক্ষা বড়। ইহাদের মাথা প্রকাণ্ড ও শরীর বেশ মোটা-সোটা ; গায়ের জোরও খুব বেশী।

জ্যাগুয়ারের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় চৌকা ধরণের চক্র থাকে। এই সকল চক্রের ভিতর দিক্ ফাঁকা। কোন কোনটার বড় চক্রের ভিতরে আর একটি ছোট চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পেটের রং সাদা, তাহার উপরেও চক্র আছে।

জ্যাগুয়ার গাছে চড়িতে খুব মজবুত। আমেরিকার জঙ্গলে অসংখ্য বানর পাওয়া যায়। বানরের মাংস ইহাদের বড় প্রিয় ; সেই জন্য ইহারা সমস্ত দিনই ডালে ডালে বানর খুঁজিয়া বেড়ায়। মাটিতে কোন শিকার দেখিলে, ডালের



জ্যাগুয়ারের টেপির-শিকার

উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার প্রাণবধ করে।

জ্যাগুয়ার জলের ধারে ধারে, মাছ ও কচ্ছপের সন্ধানেও ঘুরিয়া বেড়ায়। মাছ দেখিতে পাইলে, থাবার আঘাতে উহা বধ করে; কচ্ছপ দেখিতে পাইলে, উহাকে উল্টাইয়া ফেলে এবং দুই খোলার মাঝখান দিয়া সম্মুখের থাবা ঢুকাইয়া, ভিতরের মাংস কুরিয়া কুরিয়া খায়। মাংসের লোভে টেপির ও ক্যাপিবরার ঘাড় ভাঙ্গিতেও ইহারা খুব পটু। জ্যাগুয়ার সময় সময় মানুষও বধ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ জঙ্গলে ইহাদের একাকী বিচরণ করিতে দেখা যায়। বৎসরে একবার দুই হইতে চারিটি বাচ্চা হইয়া থাকে।

পুমা

আমেরিকার জঙ্গলে আর এক প্রকার বিড়াল-বংশীয় জন্তু আছে, ইহাদের নাম (Puma) পুমা। ইহারা জ্যাগুয়ার অপেক্ষা আকারে ছোট; দেখিতে অনেকটা কেশরহীন ছোট সিংহের মত।



পুমা

পুমাও জ্যাগুয়ারের মত গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নীচে শিকার দেখিলে, তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। জ্যাগুয়ারের সহিত ইহাদের জ্ঞাতি-শত্রুতা বড় বেশী। সুবিধামত জ্যাগুয়ারের পিঠে দু'চার

কামড় বসাইতে পারিলে, পুমার আনন্দের সীমা থাকে না। ক্বচিৎ ইহারা মানুষকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

বিড়াল

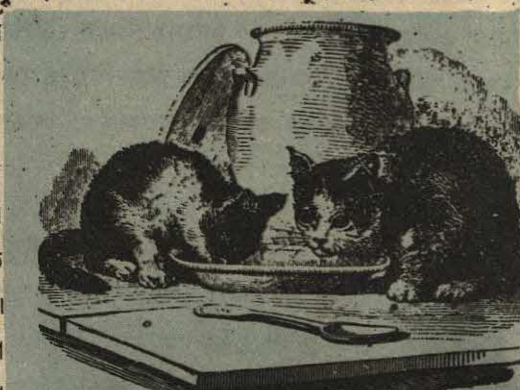
ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই বনবিড়াল (Common Jungle-Cat) দেখিতে পাওয়া যায়। বনবিড়াল অনেক রকমের আছে। কোন কোনটার গায়ে লম্বা লম্বা কালো ডোরা থাকে; কোন কোনটার গায়ে চিতাবাঘের মত চক্র থাকে; আবার কোন কোনটার ডোরা অথবা চক্র কিছুই থাকে না; তাহাদের সর্ব্বাঙ্গই ধূসর বা পিঙ্গল। আসাম, ব্রহ্ম ও বঙ্গদেশের পার্ব্বত্যাঞ্চলে এক প্রকারের বন-বিড়াল (Felis Bengalensis) দেখা যায়, তাহারা আকারে গৃহপালিত বিড়ালের ন্যায়ই হয়।



বনবিড়াল

জাতি হিসাবে গৃহপালিত বিড়ালের গায়ের রং-এর কিছুই স্থিরতা নাই, বন-বিড়ালের মধ্যে কিন্তু এক জাতীয় সকলগুলারই রং ঠিক একরকম হইয়া থাকে।

বনবিড়াল আমাদের গৃহ-পালিত বিড়ালেরই জাত-ভাই। তবে সর্ব্বদা বনে জঙ্গলে থাকাতে ইহাদের স্বভাবটা বুনো রকমের। পোষা বিড়াল অপেক্ষা ইহারা আকারে বড়। দুই হাত লম্বা বনবিড়াল প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু গৃহপালিত বিড়াল কখনো এত বড় হয় না। বনবিড়ালের লেজ প্রায়ই ছোট হইয়া থাকে।



গৃহপালিত বিড়াল

বনবিড়াল খুব হিংস্র ও শিকারপটু। ছাগল, ভেড়া খরগোস প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। শিকারের পিঠে লাফাইয়া পড়িয়া, ইহারা এমন জোরে তাহাকে কামড়াইয়া ধরে যে, তাহার আর পলাইবার উপায় থাকে না। কখনো কখনো



কাবুলি বিড়াল

ইহাদিগকে সজীব জন্তুর মাংসও ছিঁড়িয়া খাইতে দেখা গিয়াছে। এক জাতীয় বনবিড়াল (Felis Viverrina) প্রধানতঃ মাছ খাইয়াই জীবনধারণ করে; তাহাদের নাম মেছো-বিড়াল (Large Tiger-Cat)।

বনবিড়াল ও গৃহপালিত বিড়াল পরস্পর নিকট আত্মীয় হইলেও, মানুষের সহবাসে থাকিয়া গৃহপালিত বিড়াল ক্রমে শান্তপ্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের স্বভাব অনেকটা ভাল। অনায়াসে পেটের জ্বালা দূর হয় বলিয়া, গৃহপালিত বিড়ালের স্বাভাবিক শিকারপটুতা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে।

বিড়াল অতিশয় সন্তান-বৎসল। ছোট ছোট ছানাগুলিকে ধাড়ী বিড়াল এমন আদর-যত্নে লালন-পালন করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অতি শিশুকাল হইতেই ইহাদের শিকার-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। ছোট ছোট বাচ্ছারাও আরশুলা, টিকটিকি প্রভৃতি দেখিতে পাইলে লাফ দিয়া ধরিতে যায়।

বনবিড়াল কিছুতেই পোষ মানে না; কিন্তু তেমন আদর-যত্ন পাইলে, গৃহপালিত বিড়াল প্রায় কুকুরেরই মত পালকের বাধ্য হয়। কাবুলি ও এঙ্গোরা বিড়াল অনেক রাজা-রাজড়ারও আদরের বস্তু।

লিঙ্কস্

আরব ও পারস্যদেশে এবং ভারতবর্ষের কাশ্মীর, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও আসাম প্রদেশে এক জাতীয় (Red Lynx) এবং তিব্বতে অপর এক জাতীয় লিঙ্কস্ (F. Isabellina) বাস করে। ইউরোপের কোন কোন উচ্চ পর্ব্বতে এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার স্থানে স্থানেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহারা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। হিন্দিতে ইহাদের 'সিয়াগোস্' বলে।

আকারে ইহারা তেমন বড় হয় না। পূর্ণবয়স্ক লিঙ্কস্ লম্বায় বড় জোর সওয়া দুই হাত। ইহাদের লেজ ছোট ও মোটা এবং কাণ খুব লম্বা।


লিঙ্কস্

কাণের শেষদিক্ ছুঁচ্‌ল ও বড় বড় লোমযুক্ত। ইহাদের চাহুনি খুব তীব্র এবং চোখ বড় বড়। কাহারো প্রতি তাকাইলে মনে হয় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ছোট হরিণ, ছাগল, ভেড়া, খরগোস ও ছোট ছোট সারস, বক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। দর্শন ও ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ বলিয়া লিঙ্কস্ বহুদূর হইতে শিকারের সন্ধান পাইয়া তাহার অনুসরণ করে। কাঠবিড়াল, পাখী ও গেছো-ইঁদুর ধরিবার জন্য ইহাদিগকে গাছে গাছেও ঘুরিতে দেখা যায়।

ইহাদেরও অল্পায়াসে পোষ মানানো যায়। তিব্বতীয় লিঙ্কস্ (Tibetan Lynx) অনেকটা ইউরোপীয় জাতির মত দেখিতে। ইহাদের নাকের ডগার দুই পাশ দিয়া কাল দাগ চলিয়া গিয়াছে।

শিকারী-চিতা

এশিয়ার সিরিয়া, আরব, এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার উত্তর অংশে শিকারী-চিতা (Hunting Leopard) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জয়পুর ও হায়দ্রাবাদেই ইহারা সংখ্যায় বেশী। ইহাদের চেহারা সাধারণ চিতাবাঘের অপেক্ষা আরো বেশী ছিপ্‌ছিপে ; মাথা ছোট, গলায় কিছু বেশী লোম। আফ্রিকার এক-জাতীয়ের গলায় মোটেই লোম নাই। শিকারী-চিতার গায়ের চক্র আগাগোড়াই কালো, মাঝে ফাঁক নাই। বিড়াল-বংশীয় আর সকল জন্তুই ইচ্ছামত পায়ের নখ থাবার মধ্যে গুটাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু শিকারী-চিতার সে শক্তি নাই। ইহাদের নখ কতকটা কুকুরের নখের ন্যায় বাহির হইয়াই থাকে। ইহাদের


শিকারী চিতা

গলায় লোমের জন্য, পূরাকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইহারা বুঝি সিংহ (Leo) ও গুলবাঘের (Pardus) সংমিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে। ইংরাজি 'লেপার্ড'

(Leopard) কথার উৎপত্তি এই কারণেই। কিন্তু ইহারা বিড়াল-বংশের এবং এই বংশেরই সর্ব্বশেষ প্রাণী।

ইহারা বেশ পোষ মানে। পোষা চিতা কুকুরের ন্যায় পালকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। মধ্যভারত ও রাজপুতানার নানা স্থানে ইহাদের দ্বারা কৌশলে হরিণ প্রভৃতি শিকার করানো হয়। বন্য অবস্থাতেও ইহারা মানুষকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না।

হায়না

মাংসাশীবর্গে হায়না (Hyæna) পরিবারভুক্ত প্রাণী মাত্র একটিই। হায়না 'ডোরাদার' (Striped Hyæna) ও 'চিতা'—দুই রকম হইয়া থাকে। হিন্দিতে ইহাদের 'লাকড়া' বলে। এশিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানেই ইহাদিগকে পাওয়া যায়। ডোরাদার হায়না (H. Striata) নিম্ন-বঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের আর প্রায় সর্ব্বত্র এবং বেলুচিস্থান, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট আছে। আফ্রিকার উত্তর অংশেও এই জাতীয় হায়নার অভাব নাই। চিতা হায়না কিন্তু কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাওয়া যায়।


ডোরাদার হায়না

ইহাদের চেহারা অতি কদাকার; মুখ ভোঁতা, নাক বোঁচা, গায়ে ধূসর বর্ণের কর্কশ লোম, ঘাড়ে শূয়রের কুঁচির ন্যায় লোমের ঝুঁটি এবং পিছনের পা ছোট। দেখিতে অনেকটা কুকুরের মত হইলেও বিড়াল-বংশীয় প্রাণীদের সহিতই হায়নার অতি নিকট সম্পর্ক; কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বিড়ালের সহিত ইহাদের যথেষ্ট প্রভেদও দেখা যায়। বিড়ালের সম্মুখের পায়ে পাঁচটা এবং পিছনের পায়ে চারিটা আঙ্গুল থাকে, হায়নার কিন্তু প্রত্যেক পায়েই চারিটা করিয়া


চিতা হায়না

আঙ্গুল। বিড়াল ইচ্ছামত পায়ের নখ থাবার মধ্যে গুটাইয়া রাখিতে পারে, হায়নার সে ক্ষমতা নাই। ইহাদের নখ সর্ব্বদাই বাহির হইয়া থাকে। হায়নার দাঁতের সংখ্যাও চারিটা বেশী; সেইজন্য দন্তপাটি কিছু লম্বা।

এদেশের ডোরাদার হায়না প্রায়ই একা একা বিচরণ করে; দক্ষিণ-আফ্রিকার চিতা হায়না কিন্তু দলে দলে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের ডাক শুনিলে মনে হয়, মানুষে যেন 'হা-হা-হা-হা—হা-হা-হা' করিয়া হাসিতেছে।

হায়নার গায়ের জোর নেহাৎ কম নয়; চোয়ালের হাড় এবং দাঁত এমন শক্ত যে, গরু-মহিষের পায়ের মোটা মোটা হাড় পর্য্যন্ত ইহারা অনায়াসে চিবাইয়া গুঁড়া করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের সাহস বড়ই কম; রুগ্ন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন জন্তুও যদি ফিরিয়া দাঁড়ায়, তবে দলকে দল হায়না লেজ গুটাইয়া দৌড় মারে। আক্রান্ত হইলে ইহারা আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না।

কখনো কখনো বে-কায়দায় ফেলিয়া ইহারা দুই একটা পশু মারে বটে, কিন্তু তাহাতে এই পেটসর্ব্বস্ব প্রাণীর ক্ষুধা একেবারেই দূর হয় না। সেইজন্য ইহারা বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর অনুসরণ করে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত হাড়-মাংস, ছাল-চামড়া খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের অখাদ্য কিছুই নাই। শিয়াল শকুনীতেও কাছেও ঘেঁসে না, এমন গলিত পচা নাড়ি-ভুঁড়ি রক্ত-পুঁজও ইহারা তৃপ্তির সহিত খায়।

দেশে মড়ক লাগিলে বা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আশে-পাশের জঙ্গল হায়নাতে ভরিয়া যায়। প্রত্যহ যত মানুষ ও পশু মরে, ইহারা রাতারাতি তাহাদের দেহ নিঃশেষ করিয়া ফেলে; গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ উঠাইয়া খাইতেও ছাড়ে না। হাড় ও মাংসের ভাগে যাহারা বঞ্চিত, মৃত ব্যক্তির জুতা ও কোমরবন্ধ এবং মৃত ঘোড়ার লাগাম ও সাজগোচ প্রভৃতি শুক্‌না চামড়া খাইয়াই তাহারা ক্ষুধানিবৃত্তি করে।

বাচ্চাবেলায় পুষিলে ইহারাও বেশ পোষ মানে। একটা পোষা হায়নার কথা শুনা গিয়াছে, নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র সে তাহার পালকের নিকট ছুটিয়া আসিত এবং লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নানা প্রকারে মনের আনন্দ প্রকাশ করিত।

নকুলাদি

নকুল-বংশ

বাঘডাঁস, খট্টাস্ ও সড়েল বা ভাম নকুল-বংশের অন্তর্গত। সকলেরই লম্বাটে ছাঁদ। ইহাদের পা খাটো, লেজ বড় এবং মুখ লম্বা ও সরু। বিড়ালের সহিত এই বংশীয় জন্তুদের কতক সাদৃশ্য আছে। ইহাদেরও জিভ্ কর্কশ এবং পায়ের পাঁচটি আঙ্গুল

পিণ্ডযুক্ত। বেজী ছাড়া আর সকলেই পায়ের নখ কতক গুটাইয়া রাখিতে পারে। ইহাদের গ্রন্থি নিঃসারিত পদার্থ হইতে গন্ধদ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুত হয়।

বাঘডাঁস

নকুল-বংশীয় প্রাণীদের মধ্যে বাঘডাঁস (Large Civet-Cat) বা মাছ-ভোঁদড় সর্ব্বাপেক্ষা বড়—লেজশুদ্ধ লম্বে প্রায় তিন হাত; ইহাদের গায়ের রং ধূসর; পিঠের দাঁড়ার উপর—মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত একটা কালো ডোরা থাকে এবং গলায়ও কয়েকটা সাদা-কালোর ডোরা দেখা যায়; লেজ মোটা, তাহার উপর সাদা-কালোর বেড়।



বাঘডাঁস

আমাদের এই ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাঘডাঁস আছে। ইহারা রাত্রিচর; দিনের বেলার ঝোপে-ঝাপে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া হাঁস, মুরগী, সাপ, ইঁদুর এবং অন্যান্য ছোট ছোট পশু-পক্ষীর ঘাড় ভাঙ্গে। মে-জুন মাসে ইহাদের বাচ্ছা হয়। সাধারণতঃ চারি পাঁচটি বাচ্ছা একসঙ্গে হইয়া থাকে।

খট্টাস

কটাস বা খট্টাসের (Lesser Civet Cat) আর এক নাম 'গন্ধগোকুল'। আকারে ইহারা বাঘডাঁস হইতে কিছু ছোট। ইহাদের গায়ের রং কটা ও ফিকে ধূসর; পিঠের দাঁড়ার উপর—মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত কালো কালো ডোরা দেখা যায়। শরীরের দুই পাশে সারি সারি কালো চক্র থাকে এবং লেজেও কয়েকটা কালো বেড় থাকে; কাণ ছোট ও গোল, পায়ের তলা কালো। ইহারাও রাত্রিচর। বাঘডাঁস ভাল রকম গাছে চড়িতে পারে না, খট্টাস্ কিন্তু সে বিষয়ে খুব পটু। ইহাদের অত্যাচারে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের লোকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। রাত্রিতে হাঁস, মুরগী পায়রা প্রভৃতি খুব সাবধানে না রাখিলে, খট্টাসের গ্রাস হইতে রক্ষা করা কঠিন। কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলও ইহাদের খুব প্রিয়।



খট্টাস্

সড়েল বা ভাম

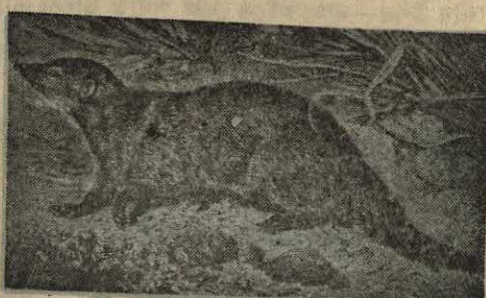
সড়েলকে (Musang) স্থানবিশেষে 'ভাম' বলা হয়। লম্বে ইহারা লেজশুদ্ধ প্রায় আড়াই হাত। ইহাদের নাকের দুই পাশে, চোখের উপর ও নীচে এবং গলায় সাদা সাদা লোম জন্মে: গায়ের রং ঘন ধূসর; তাহার উপর অস্পষ্ট কালো কালো চক্র। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহারা বাস করে।


সড়েল

সড়েল দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে গাছের কোটরে বা খড়ের গাদায় গুটি মারিয়া লুকাইয়া থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করে। ইহারা খুব তাড়াতাড়ি গাছে চড়িতে পারে। তাল ও খেজুর গাছে চড়িয়া রস পান করিতে, মাচায় চড়িয়া গুড় খাইতে এবং ভাঁড়ারে ঢুকিয়া নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী চুরি করিতে সড়েল ভারি ওস্তাদ।

বেজী

বেজীর (Mongoose) আর এক নাম 'নকুল' বা 'নেউল । আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা স্থানে নানা জাতীয় বেজী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ছোট জাতীয় বেজী লেজশুদ্ধ এক হাতের বেশী হয় না, কিন্তু বড় জাতীয়েরা লম্বে প্রায় দুই হাত। ইহাদের সকলের গায়ের রং এক রকম নহে; জাতি হিসাবে কোনটা তামাটে লাল, কোনটা পাংশুটে, কোনটা ফিকে ধূসর; আবার কোন কোনটার গায়ের রং ধূসর, কিন্তু লেজ লাল্‌চে। সকল জাতীয় বেজীরই মুখ সরু, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কর্কশ লোমে ভরা এবং লেজ খুব ঝাঁকড়া হইয়া থাকে। ইহারা ভয়ানক ধূর্ত্ত ও হিংস্র; ইঁদুর সাপ, পাখী প্রভৃতি দেখিবামাত্র অমনি তাড়া করে; ধরিতে পারিলে ঘাড় মট্‌কাইয়া রক্ত খায়। ক্ষুধা না থাকিলেও কেবল শিকারের আনন্দের জন্যই ইহারা প্রাণিবধ করিয়া থাকে।


বেজী

হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব, আসাম ও ব্রহ্মদেশে একজাতীয় অদ্ভুত বেজী

(Urva Cancrivora) দেখা যায়। ইহারা জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া ব্যাঙ ও কাঁকড়া মারিয়া খায়। ইহাদের নাম 'কাঁকড়াখেকো বেজী' (Crab-eating Mongoose)।

সাপে নেউলে যুদ্ধ এ দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। বিষধর সাপকেও বেজীর নিকট পরাস্ত হইতে হয়। যুদ্ধের সময় ইহারা এত তাড়াতাড়ি ছুটাছুটি করিতে থাকে যে, সাপ কিছুতেই ছোবল দিবার সুবিধা পায় না ; সাপ ফনা ধরিলেই অমনি তাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া পলায়ন করে। এদিকে সাপ বেচারাকে পদে পদেই জব্দ হইতে হয়। ছুটাছুটি করিতে করিতে একটু বাগে পাইলে, বেজী সাপের মাথা কামড়াইয়া একেবারে গুঁড়া করিয়া ফেলে। এ দেশে সাধারণ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, সাপে কামড়াইবামাত্র বেজী ছুটিয়া গিয়া বনের ভিতর হইতে 'নকুলী' নামে এক প্রকার গাছের পাতা ও শিকড় খাইয়া আসে ; তাহাতেই বিষ কাটিয়া যায়। এ বিশ্বাস কিন্তু একেবারেই ভুল। প্রকৃত কথা এই— যুদ্ধের সময় বেজী গায়ের লোম ফুলাইয়া রাখে বলিয়া, সাপের বিষদাঁত উহার দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে না : তাই বেজী বাঁচিয়া যায়। কিন্তু কোন গতিকে এক বিন্দু বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, বেজীর আর রক্ষা থাকে না।

কোন কারণে ইহারা উত্তেজিত হইলে সমস্ত গায়ের ও লেজের লোম খাড়া খাড়া করিয়া কাঁটার মত বিস্তার করে। তখন লেজটাকে ঠিক দুধের বোতল ধুইবার বুরুশের ন্যায় দেখায়।

বেজীর এক একবারে তিন চারটি করিয়া বাচ্ছা হয়। ইহারা বেশ পোষ মানে। লোকে সাপের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বেজী পুষিয়া থাকে।

কুকুরাদি

কুকুর-বংশ

কুকুর-বংশীয় (The Dog Family) সকল জন্তুরই চেহারা প্রায় এক রকম। ইহাদের চোয়াল লম্বা, মুখ সরু এবং সর্ব্বাঙ্গ মোটা ও কর্কশ লোমে ঢাকা। এই বংশের সকলেরই দাঁতের সংখ্যা ৪২ ; উপর ও নীচের দুই মাড়ীতে ৬টা করিয়া ১২টি ছেদন-দন্ত এবং ২টা করিয়া ৪টা শ্বদন্ত (কুকুরের-দাঁত)। তদ্ভিন্ন উপর পাটীর দুই কসে ১২টা এবং নীচের পাটীর দুই কসে ১৪টা— মোট এই ২৬টা চর্ব্বণ-দন্ত। ইহাদের কসের দাঁত খুব ধারালো ; তাহার সাহায্যে ইহারা মাংসখণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া গিলিয়া ফেলে।

বিড়াল-বংশীয় জন্তুদের ন্যায় ইহাদেরও সম্মুখের পায়ে পাঁচটি আর পিছনের

পায়ে চারিটি করিয়া আঙ্গুল থাকে এবং ইহারাও আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলে। কিন্তু বিড়ালের ন্যায় ইহারা পায়ের নখ আঙ্গুলের ভিতর গুটাইয়া লইতে পারে না। কুকুর প্রভৃতি যখন চলে, তখন মাটিতে নখ লাগিয়া খট্ খট্ শব্দ হয়।

বিড়াল ও কুকুর-বংশীয় জন্তুদের শিকার-পদ্ধতিও এক রকম নহে। বিড়াল-বংশীয়েরা প্রায়ই একা একা শিকার করে, ইহারা কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিয়া থাকে। বিড়াল-বংশীয়েরা ঝোপে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধামত হঠাৎ শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, থাবা ও দাঁতের আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহারা কিন্তু শিকার দেখিতে পাইলে, অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া যায় এবং বার বার কামড়াইয়া শেষে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ইহাদের থাবায় তেমন জোর নাই, কিন্তু পা-গুলা লম্বা লম্বা বলিয়া ইহারা খুব ছুটিতে পারে।

বিড়াল-বংশীয় জন্তু সহজে পচা মাংস খাইতে চাহে না, কিন্তু কুকুর-বংশীয় জন্তুর টাট্‌কা, পচা কিছুতেই অরুচি নাই। নেক্‌ড়ে বাঘ, শিয়াল ও খেঁক্‌শিয়াল কুকুর-বংশের অন্তর্গত।

নেকড়ে-বাঘ

এশিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানেই নেক্‌ড়ে-বাঘ (Wolf) দেখিতে পাওয়া যায়।



আমাদের ভারতবর্ষেও যথেষ্ট নেক্‌ড়ে আছে; বঙ্গদেশে কিন্তু নিতান্তই বিরল। নেক্‌ড়ে-বাঘের চেহারা অনেকটা বুনো কুকুর ও শিয়ালের মত, কেবল আকারে কিছু বড়। লেজশুদ্ধ লম্বে ইহারা প্রায় তিন হাত হইয়া থাকে। উঁচুতেও দেড় হাতের কাছাকাছি। হিন্দিতে 'হুণ্ডার' বা 'হুড়ার' বলে।

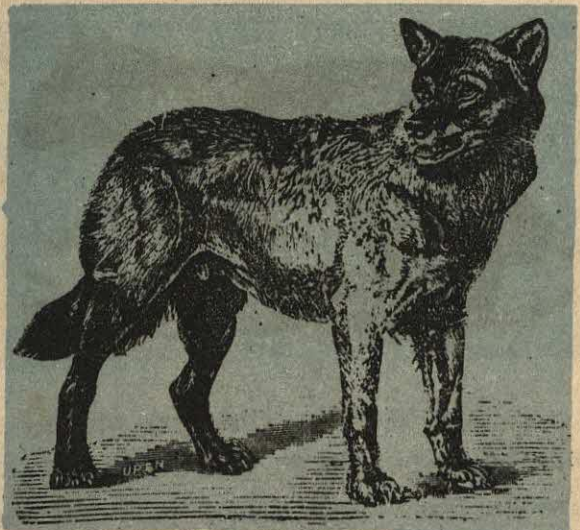
সাধারণতঃ নেক্‌ড়ে-বাঘ অতিশয় ভীরু; কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হইলে ইহাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তখন ইহাদের কাছে স্বজাতীয় দুর্ব্বল অথবা রুগ্ন পশুদেরও রক্ষা নাই। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে ইহারা অনেক দূর হইতে শিকারের অনুসরণ করে এবং সাহসে না কুলাইলে, ছলে ও কৌশলে কাজ হাসিল করিয়া থাকে। নেক্‌ড়ে-বাঘ একাকী মানুষকে আক্রমণ করে না বটে, কিন্তু দুই তিনটা একত্র হইলে, ইহাদের কাছে মানুষেরও নিস্তার নাই।

এ দেশের নেক্‌ড়ে সাধারণতঃ আট দশটা একত্র দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে। মাঝে মাঝে এক একটা সাহসী নেক্‌ড়েকে একাকী শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেও দেখা গিয়াছে। ইহারা রাত্রিকালে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ঘরে ঢুকিয়া, ছাগল, ভেড়া,

বাছুর, কুকুর—যাহা পায় ধরিয়া লইয়া যায়।

মধ্যভারত এবং যুক্তপ্রদেশের লোকে নেকড়ের জ্বালায় সর্ব্বদাই অস্থির। ঐ সকল অঞ্চলে প্রতি বৎসর বহু শিশুসন্তান নেকড়ের গ্রাসে প্রাণ হারাইয়া থাকে। কখনো কখনো ইহারা ছোট ছেলে-মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া, নিজের সন্তানের মত পালন করে। নেকড়ে কর্তৃক পালিত কয়েকটি বালকের বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে; তাহারা সকলেই চতুষ্পদ জন্তুর মত চলিতে ফিরিতে এবং কাঁচা মাংস খাইতে শিখিয়াছিল; বহু চেষ্টাতেও কেহই মানুষের মত কথা বলিতে শিখে নাই।

পূর্ব্বে ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই নেকড়ে-বাঘের অত্যাচার ছিল। ইংলণ্ডের রাজা এড্গার এক নূতন কৌশলে নেকড়ের বংশ ধ্বংস করেন। তিনি টাকার পরিবর্ত্তে নেকড়ের মাথা রাজ্যের করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ইংলণ্ড একেবারে নেকড়ে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের কোন কোন অঞ্চলে এখনও নেকড়ের দৌরাত্ম্য নিতান্ত কম নহে।



নেকড়ে-বাঘ

আমাদের দেশের নেকড়ে অপেক্ষা ইউরোপের নেকড়ে আকারে বড় ও বেশী বলবান হইয়া থাকে। ইহারা অতিশয় হিংস্র এবং প্রায় সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে; এক এক দলে ৫০।৬০টা হইতে ১৫০।২০০টা পর্য্যন্ত থাকে এই দলের সম্মুখে পড়িলে, ঘোড়া, গরু, মহিষ কাহারও রক্ষা নাই। অন্য শিকার না জুটিলে, ইহারা নিজ নিজ দলের মধ্যেই সংগ্রাম বাধায়। তাহাতে যাহারা হত বা আহত হয়, দলের বাকিগুলা তাহাদিগকে খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

দেশের জলবায়ু-ভেদে ইহাদের আকার-প্রকার এবং দেহের বর্ণও ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। ছোটবেলায় পুষিলে নেকড়ে-বাঘ প্রায় কুকুরের মতই পোষ মানে।

শিয়াল

ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা স্থানে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শিয়ালের (Jackal) বাস। ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দিতে ইহাদের 'গিধড়' বলে।

নেকড়ে-বাঘের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আকারে শিয়াল তত বড় হয় না ; লেজশুদ্ধ লম্বে বড় জোর দুই হাতের কিছু বেশী। ইহাদের গায়ের রং মেটে বা ফিকে কটা ; দেশভেদে লাল, কালো এবং সাদা শিয়ালও চোখে পড়ে।

শিয়াল সচরাচর দুই তিনটি একত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো কখনো অনেকগুলিতে দলবদ্ধ হইয়াও বিচরণ করে। সমস্ত দিন বনে জঙ্গলে বা গর্ত্তের মধ্যে কাটাইয়া, সূর্য্যাস্তের পর ইহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয়। বৃষ্টি-বাদলের সময়, মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও বাহির হইয়া থাকে।



শিয়াল

শিয়াল রাত্রিকালে গ্রামে ঢুকিয়া হাঁস, মুরগী এবং ছাগল ও ভেড়ার ছানা চুরি করিয়া গৃহস্থের যথেষ্ট ক্ষতি করে। সুবিধা পাইলে, ইহারা দিনের বেলায়ও হাঁস, মুরগীর ঘাড় ভাঙ্গিতে ছাড়ে না।

এক হিসাবে শিয়াল মানুষের খুব উপকারী জন্তু। গলিত দুর্গন্ধ মাংসও ইহারা তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। এই জন্য গ্রামে জীব-জন্তুর পূতিগন্ধময় মৃতদেহ জমিতে পায় না। মাংসই কিন্তু শিয়ালের একমাত্র খাদ্য নহে ; খেজুর, কুল, কাঁঠাল, ফুটি প্রভৃতি ফলও ইহাদের বড় প্রিয়। আখ ও ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকিয়া ইহারা কৃষকের অনেক ক্ষতি করে।

শিয়াল ভয়ানক ধূর্ত্ত। গর্ত্তের মধ্যে লেজ ঢুকাইয়া দিয়া ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলে কাঁকড়া ধরিয়া খায় ; গাছের উঁচু ডালে কাঁঠাল পাকিলে, একটার পিঠে আর একটা, তার পিঠে আরো একটা—এইভাবে উপর উপর চড়িয়া সেটি আত্মসাৎ করে। শুধু কাঁঠাল কেন, বাগানের ফল-মূল এবং ঘরের হাঁস-মুরগী চুরি করিতেও ইহারা আশ্চর্য্য চাতুরী দেখাইয়া থাকে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী চালাকির পরিচয় দেয়, যখন ধরা পড়ে। ধরা পড়িলে, শিয়াল বিনা আপত্তিতে পিঠ পাতিয়া মার খায়।

যতই মারো—নড়া চড়া দূরে থাক্, মুখে টুঁ শব্দটিও নাই। কিন্তু সে ভাব বেশী ক্ষণের জন্য নহে ; প্রহারকারী একটু অসতর্ক হইলেই অমনি এক ছুটে পলায়ন।

সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ইহাদের—'ক্যা ক্যা ক্যাহুয়া'—রব মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। একটা শিয়াল ডাকিলেই অমনি চারিদিক্ হইতে সকলে সাড়া দেয়। বাঘ, চিতা প্রভৃতি দেখিলে, অথবা হঠাৎ অন্য কোন কারণে ভয় পাইলে, ইহারা আর এক প্রকার বিকট শব্দ করে, চলিত কথায় তাহাকে 'ফেউ ডাকা' বলে।

বন্য কুকুর

এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার নানাস্থানে বন্য কুকুর (Wild Dog) দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই ভারতবর্ষের পশ্চিম বিভাগে, হিমালয়-প্রদেশে এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে এক জাতীয় বন্য কুকুর আছে ; নেকৃড়ে বাঘ ও শিয়ালের সহিত ইহাদের চেহারার বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই। গায়ের রং উজ্জ্বল-মেটে বা লাল হইয়া থাকে। ইহারা অনেক গুলাতে দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে। এক এক দলে ১০।১২টা হইতে কখনো কখনো ২৫।৩০টা পর্য্যন্ত বন্য কুকুর থাকে। এই দলের সম্মুখে পড়িলে, বাঘ-ভালুকেরও রক্ষা পাওয়া কঠিন। অষ্ট্রেলিয়ায় একজাতীয় বন্য কুকুর আছে, তাহাদিগকে 'ডিঙ্গো' বলে।



সাইবিরিয়ার বন্যকুকুর ভারতবর্ষের বন্যকুকুর

গৃহপালিত কুকুর

পৃথিবীর নানা স্থানে দেড় শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গৃহপালিত কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন কোনটা আকারে বিড়াল অপেক্ষাও ছোট, আবার কোন কোনটা প্রায় বাঘের মত বড়। গায়ের লোম—কাহারো ছোট কাহারো বড়, কাহারো বা ঝাঁকড়া। ইহাদের কোন কোন জাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, আবার কোন কোন জাতি শুধু দৃষ্টিশক্তির জন্যই বিখ্যাত। দেশ, জলবায়ু ও আহার-ভেদে ইহাদের আকৃতি ও স্বভাব নানা রকম হইয়া পড়িয়াছে। গত দুই যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে কুকুর অনেক কাজে লাগিয়াছে। পুলিসের

কাজে, বিশেষতঃ অপরাধীর ব্যবহৃত কোন দ্রব্যাদির গন্ধ শুঁকিয়া অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ইহারা খুব পটু। যুদ্ধে এবং ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশবাহিনীতে এ্যালসেসিয়ান ও ব্লাড্-হাউণ্ডকেই প্রধানতঃ কাজে লাগান হইয়া থাকে।



স্প্যানিয়াল-কুকুর

কুকুরের মত এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত প্রাণী আর নাই। চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে ইহারাই মানুষের সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। নিম্নে কয়েক জাতীয় কুকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্-কুকুর (Newfoundland Dog)—ইহারা 'স্প্যানিয়াল-জাতীয়। দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদের স্বভাবও তেমনি নম্র। উচ্চে ইহারা দেড় হাতের কিছু বেশী। নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড কুকুরের দেহ মাংসল, কাণ ঝোলা এবং সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁক্ড়া লোমে ভরা।



নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-কুকুর

এই জাতীয় কুকুর বেশ সাঁতার দিতে পারে। প্রতি বৎসর বহু জলমগ্ন ব্যক্তি ইহাদের সাহায্যে রক্ষা পাইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে, ইহারা নিজ নিজ প্রাণ দিয়াও প্রভুর ধনসম্পত্তি রক্ষা করে। নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ দেশে এই কুকুর ভারবাহী পশুর কার্য্যও করিয়া থাকে।

সেণ্ট্ বার্ণাড্-কুকুর (St. Bernard Dog)—আকারে ইহারা প্রায় নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ কুকুরেরই মত। ইহাদের কাণ ঝোলা, লেজ ঝাঁক্ড়া এবং সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় লোমে ঢাকা। এই কুকুর যেমন বলশালী, তেমনি বুদ্ধিমান্ ও কষ্টসহিষ্ণু।

ইউরোপের 'আল্পস্' পর্ব্বতের উপর পথিকগণ অনেক সময় দারুণ শীতে কাতর ও অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা যায়। কখনো কখনো তাহারা রাশি রাশি বরফের নীচে চাপা পড়ে। এইরূপ বিপন্ন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী পাহাড়ের উপর 'সেণ্ট্ বার্ণার্ড' নামক একটি মঠে অনেকগুলি স্প্যানিয়াল্ কুকুর লইয়া বাস করেন। এই সকল কুকুরকে 'সেণ্ট্ বার্ণার্ড্ কুকুর' বলে। সন্ন্যাসীগণ প্রত্যহ দুই দুইটি কুকুরের গলায় কিছু খাদ্যবস্তু, ঔষধ ও গরম কাপড় বাঁধিয়া এক একদিকে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের বুদ্ধি-কৌশলে ঐ সকল বিপন্ন ব্যক্তি আহার, ঔষধ প্রভৃতি পাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া যায়। পথিকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইলে, একটি কুকুর যত্নপূর্ব্বক তাহাকে পিঠে লইয়া মঠের দিকে আসিতে থাকে ; অপরটি চীৎকার করিয়া সন্ন্যাসী-দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন সেণ্ট্ বার্ণার্ড কুকুর শতাধিক বিপন্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।



সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর



ডালকুত্তা

গ্রে-হাউণ্ড্ (Grey Hound) বা ডালকুত্তা—ডালকুত্তার শরীর লিক্‌লিকে,

মাথা ছোট, মুখ ছুঁচ্‌ল, লেজ সরু এবং পা লম্বা। ইহাদের গায়ের লোম ছোট ও পাতলা। ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী। ছুটিয়া ডালকুত্তার গ্রাস হইতে পারিত্রাণ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহাদের দৃষ্টিশক্তিও খুব প্রখর।



ব্লাড্‌-হাউণ্ড্‌

ব্লাড্‌-হাউণ্ড্‌ (Blood Hound) বা রক্ত পিপাসু ডালকুত্তা—এই জাতীয় কুকুর বল-বিক্রম ও ঘ্রাণশক্তির জন্য খ্যাত। বহুদূর হইতে শিকারের সন্ধান পাইয়া ইহারা তাহার অনুসরণ করে এবং যতক্ষণ না তাহার ঘাড় ভাঙ্গিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়ে না। পূর্ব্বে কোন কোন দেশে চোর-ডাকাত ধরিবার কার্য্যে ব্লাড্‌-হাউণ্ড্‌ নিযুক্ত করা হইত। আমেরিকার দাসব্যবসায়ীগণ ইহাদের সাহায্যে পলাতক দাস-দাসীর সন্ধান লইত।



তিব্বতদেশীয় ম্যাষ্টিফ

ম্যাষ্টিফ্‌ (Mastiff)—এই জাতীয় কুকুরের মাথা চওড়া এবং নাক বোঁচা ধরণের। ইহারা যেমন বলশালী, তেমনি বুদ্ধিমান্ ও শান্তশিষ্ট; ঘর-বাড়ী পাহারা দিতে বিশেষ দক্ষ। প্রভুর ধন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মানুষ কিংবা পশু কাহাকেও আক্রমণ করিতে ইহারা ভয় পায় না। ম্যাষ্টিফের ডাক খুব গম্ভীর।

বুল ডগ্‌ (Bull Dog)—বুল ডগ্‌ দেখিতে অতি কদাকার। ইহাদের দেহের বাঁধুনি খুব দৃঢ়; মাথা চওড়া মুখ থ্যাবড়া এবং নীচের চোয়াল বড়। মেজাজ এমন কড়া ও সাহস এত বেশী যে, বাঘ সিংহকেও আক্রমণ করিতে ইহারা ভয় পায় না এবং একবার কামড় বসাইতে পারিলে, প্রাণান্তেও ছাড়ে না। সচরাচর বুল ডগ্‌ পালকের বাধ্য হইয়াই চলে; কিন্তু মাঝে মাঝে সামান্য কারণে হঠাৎ



বুল ডগ্

ক্ষেপিয়া উঠে ; তখন প্রভুরও রক্ষা নাই। পূর্ব্বে ইউরোপে ষাঁড়ের সহিত লড়াই করিবার জন্য এই কুকুর পালন করা হইত।

টেরিয়ার (Terrier)—এই জাতীয় কুকুর মাত্রেই বেশ বুদ্ধিমান ও চালাক চতুর। শিকারে বাহির হইয়া ইহারা মাটি খুঁড়িয়া ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি অক্লেশে ধরিয়া ফেলে। এমন কি, জলের ভোঁদড়ও ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ভাল রকম শিখাইতে পারিলে, এই কুকুর বেশ ক্রীড়াকৌতুকও দেখাইতে পারে।



ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় টেরিয়ার

মেষরক্ষক-কুকুর (Sheep Dog)—ইহাদের মাথা ছোট, মুখ লম্বা, চোখ উজ্জ্বল, কাণের ডগা সম্মুখের দিকে ঝোলা, গায়ের লোম বড় বড় এবং লেজ খুব ঝাঁকড়া হইয়া থাকে।

এই কুকুরের মত মেষপালকের এমন বন্ধু আর নাই। শত শত মেষ এক সঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, আর একটিমাত্র কুকুর তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাহার ভয়ে নেকড়ে, শিয়াল প্রভৃতি মেষপালের নিকটে আসিতেও সাহস করে না। ইহারা এমন হুঁসিয়ার যে, দলের একটা মেষও হারাইবার যো নাই। কোনটা দল ছাড়িয়া একটু এদিক্ ওদিক্ যাইলে বা পিছাইয়া পড়িলে, অমনি সে তাড়া করিয়া, কামড় দিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে দলের মধ্যে লইয়া আসে। যদি ভিন্ন দুই দল মেষ একত্র মিশিয়া যায়, সে নিজ প্রভুর দল ঠিক বাছিয়া লইতে পারে। পালের সমুদয় মেষ তাহাকে বন্ধু



মেষরক্ষক কুকুর

বলিয়া জানে। ভয় পাইলে, সকলে তাহার নিকট আসিয়া জড় হয়। এই কুকুরের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। প্রভুর আজ্ঞা অথবা ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে তাহার কখনো ভুল হয় না।

এস্কিমো-কুকুর (Eskimo Dog)—পৃথিবীর উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী গ্রীণল্যাণ্ড, সাইবিরিয়া, কাম্স্কট্কা প্রভৃতি দেশ এস্কিমো-কুকুরের জন্মস্থান। ইহাদের মাথা বড়, কাণ ছোট, গায়ের লোম ঘন ও মোটা এবং লেজ খুব ঝাঁক্ড়া হয়। গৃহপালিত আর কোন কুকুরেরই নেকড়ে বাঘের সহিত এত বেশী সাদৃশ্য নাই।


এস্কিমো-কুকুর

এই কুকুর এস্কিমোজাতির জীবনধারণের প্রধান সহায়। সেই নিদারুণ শীতের দেশে ঘোড়া গাধা প্রভৃতি কোন জন্তুই নাই। ইহারা সেখানে ঘোড়ার ন্যায় গাড়ী টানে এবং গাধার ন্যায় বোঝা বয়। ইহারা খুব কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের সাহায্য ভিন্ন সেখানকার লোকের একদণ্ডও চলে না।

খেঁকশিয়াল

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর-আমেরিকা খেঁকশিয়ালের (Fox) জন্মস্থান।



আকারে ইহারা শিয়াল অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহাদের মুখ সরু, কাণ বড এবং লেজ খুব লম্বা ও ঝাঁক্ড়া। বিড়ালের ন্যায় ইহাদের চোখের তারা দিনের বেলা একেবারে সরু রেখার মত হইয়া যায়; শিয়াল কুকুরের চোখের তারা কিন্তু ছোট হইয়া যাইলেও গোলাকারই থাকে। শিয়াল প্রভৃতির দশটি স্তন থাকে, ইহাদের স্তনের সংখ্যা ছয়টি।

খেঁকশিয়াল নানা রকমের হইয়া থাকে। আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে একজাতীয় খেঁকশিয়াল (Desert Fox) আছে, ভারতবর্ষের খেঁকশিয়াল (V. Bengalensis) অপেক্ষা তাহারা আকারে ছোট; কিন্তু ইউরোপের

কোন কোন স্থানে খুব বড় বড় খেঁকশিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের গায়ের রং-ও এক রকমের নহে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ খেঁকশিয়ালের রং লাল্‌চে মেটে; সময় সময় কালো এবং পাংশুটে রং-এর খেঁকশিয়ালও চক্ষে পড়ে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের খেঁকশিয়াল প্রায়ই সাদা হইয়া থাকে।

খেঁকশিয়াল নেকড়ে-বাঘ ও শিয়ালের মত দলবদ্ধ হইয়া শিকার করে না; সর্ব্বদাই একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা মাটির ভিতর গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা প্রস্তুত করে। সেই গর্ত্তের অনেকগুলি মুখ থাকে; বিপদ-আপদ্ উপস্থিত হইলে, যে কোন একটা মুখ দিয়া চম্পট্ দেয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে খেঁকশিয়ালীর বাচ্ছা হয়। বাচ্ছাগুলি বেশ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ত্তের বাহিরে আসে না।

খেঁকশিয়াল পোকা-মাকড়, হাঁস-মুরগী, ইঁদুর-খরগোস এবং পাখী খাইয়া জীবন ধারণ করে। মৌ-চাক হইতে মধু পান করিতে ইহাদের ভারী আমোদ। ছোলা ও মটরের শুঁটি, ফুটি, তরমুজ, আঙ্গুর, কুল প্রভৃতিও ইহাদের খুব প্রিয়।

আফ্রিকায় 'ফেনেক' নামে এক জাতীয় খেঁকশিয়াল আছে, তাহাদের চেহারা ভারি সুন্দর। তাহাদের কাণ খুব বড় এবং লেজ খুব ঝাঁক্‌ড়া হইয়া থাকে। ছোটবেলা পুষিলে 'ফেনেক খেঁকশিয়াল বেশ পোষ মানে।



ফেনেক খেঁকশিয়াল

খেঁকশিয়ালের ধূর্ত্ততা চির-প্রসিদ্ধ। গৃহস্থের পোষা হাঁস, মুরগী, চুরি করিতে ইহারা আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়। ধূর্ত্ততায় ইহারা শিয়ালকেও পরাস্ত করিয়াছে।



সীল বংশ

স্থলচর মাংসাশী জন্তু শেষ করিয়া তিমিবর্গের অন্তর্গত প্রাণীগণ সম্বন্ধে জানিবার পূর্ব্বে জলচর মাংসাশী-জন্তুর বিষয়ে কিছু জানিয়া রাখ। ইহারা কেহই ভারতবর্ষ বা তাহার নিকটস্থ দেশের অধিবাসী নহে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশ ভয়ানক শীত প্রধান। এই দুই অঞ্চলের সমুদ্র-জলে সীলের (Seal) বাস। জলচর স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে কেবল সীল-বংশই মাংসাশী।

সীল নানা জাতিতে বিভক্ত এবং ছোট বড় নানা আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় সীলের কাণ একেবারেই নাই। আবার কোন কোন জাতির কাণ (Otaridæ) আছে, কিন্তু বোঁচা রকমের। কর্ণহীন সাধারণ সীল (Phocidæ) লম্বে প্রায় ৪ হাত। এক জাতীয় কর্ণহীন সীলের গায়ে লেপার্ডের (গুলবাঘের) মত চক্র থাকে। সেইজন্য তাহাদের নাম 'লেপার্ড-সীল'। তাহারা লম্বে দুই হাত আড়াই হাতের বেশী হয় না। আর এক জাতীয় কর্ণহীন সীলের উপরের ঠোঁট হাতীর শুঁড়ের ন্যায় বাহির হইয়া থাকে, তাই তাহাদিগকে 'হস্তী-সীল' বলে। হস্তী-সীল লম্বে প্রায় ১২।১৩ হাত। সীল-বংশের আর কোন জন্তু এত বড় হয় না। কর্ণযুক্ত সীলদের মধ্যেও, চেহারা অনুসারে 'সিন্ধু-সিংহ,' 'সিন্ধু-ভল্লুক' প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে।

সীলের দেহ বেশ মাংসল এবং চর্ম্ম বড় বড় ঘন লোমে ঢাকা। ইহাদের মাথা ছোট, নাক চওড়া, চোখ বড় এবং লেজের দিক্ ক্রমশঃ সরু। আকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, সারা জীবন জলে বাস করিবার জন্যই ইহাদের জন্ম। সীলের কুকুরে-দাঁত খুব বড় ও তীক্ষ্ণ; অন্যান্য দাঁতও কম ধারালো নহে। চোখ বড় বড় বলিয়া ইহারা জলের মধ্যেও বেশ দেখিতে পায়।

সীলের পায়ের বেশীর ভাগই দেহের সঙ্গে যুক্ত—কেবল হাঁটুর নীচের দিক্ বাহির হইয়া থাকে; পায়ের চেটো খুব চওড়া এবং আঙ্গুল খুব লম্বা। উদ্বিড়ালের মত ইহাদের আঙ্গুলও চামড়া দিয়া জোড়া। সীলের পিছনের ও সম্মুখের পা মাছের লেজ ও পাখ্‌নার কাজ করে। সেই পায়ের সাহায্যে ইহারা অক্লেশে সাঁতার দিতে এবং যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিতে ফিরিতে পারে। সীল জলচর প্রাণী হইলেও অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না; আন্দাজ পনর, বিশ মিনিট অন্তর নিশ্বাস লইবার জন্য ভাসিয়া উঠে। বাচ্ছা হইবার পূর্ব্বে ইহারা কয়েক মাস ডাঙ্গাতেই বাস করে। জল ছাড়িয়া থাকা কিন্তু ইহাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর; ডাঙ্গায় ভালরূপ

দেখিতেও পায় না, ভাল রকম চলিতেও পারে না ; কোন রকমে হামা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে কোন কোন জাতের সীল ডাঙ্গাতেও বেশ চলাফেরা করিতে পারে।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলে চার পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত সীল দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ দল আবার ছোট ছোট দলে বা পরিবারে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবারে পুরুষ-সীল কেবল একটি। স্ত্রী-সীলের সংখ্যার কোন হিসাব নাই ; ১০।১২টা হইতে কখনো কখনো ৩০।৪০টাও থাকে। ইহাদের প্রায় একটি করিয়াই বাচ্ছা হয় ; সময় সময় দুইটিও হইয়া থাকে। আন্দাজ এক মাস বয়সে সীলের বাচ্ছা জলে নামিয়া সাঁতার দিতে শিখে।

সীলের সংখ্যার শেষ নাই বলিলেই হয়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে এমন অনেক দ্বীপপুঞ্জ আছে, যেখানে অসংখ্য সীল বাস করে। সেখানেও মানুষের অত্যাচারের বিরাম নাই। চাম্‌ড়া ও চর্ব্বির জন্য কোন কোন বৎসর লক্ষ লক্ষ সীল মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকে। ১৮৭০ সালে শুধু স্কট্‌লণ্ড্‌ দেশের জেলেরাই ৯০,০০০ সীলের জীবন নষ্ট করিয়াছিল। এস্কিমো প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশবাসিগণ ইহাদের মাংস খায়, চর্ব্বি জ্বালায়, চর্ম্মে শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্র এবং দন্তে নানা প্রকার অস্ত্র তৈয়ারি করে। সীল খুব পোষ মানে। এ বিষয়ে কুকুরের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পালকের আদর-যত্ন পাইলে, ইহারা আহ্লাদে আট্‌খানা হয়।



কর্ণহীন সীল

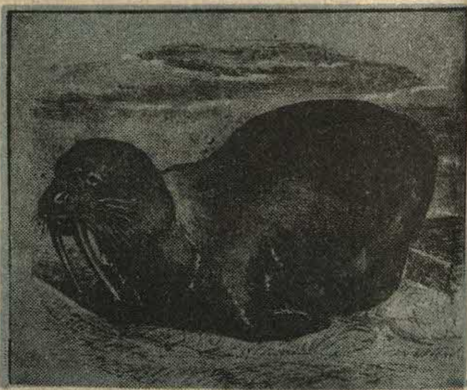


কর্ণযুক্ত সীল

খুব মন্দ ব্যবহার পাইলেও, ইহাদের স্বভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

সিন্ধু-ঘোটক

সিন্ধু-ঘোটক (Walrus) ও সীল ভিন্ন জাতীয় প্রাণী নহে; এক রকম সীলকেই সিন্ধু-ঘোটক বলে। ইহারা লম্বায় আট হাতের কম নহে। ইহাদের শরীরের বেড়ও প্রায় ৮ হাত, কিন্তু মাথা নিতান্ত ছোট। সিন্ধু-ঘোটকের উপর মাঢ়ীর কুকুরে-দাঁত দুইটি অতি প্রকাণ্ড। হাতীর দাঁতের মত সেগুলি প্রায় এক হাত, দেড় হাত বাহির হইয়া থাকে। বরফের মধ্যে এই দাঁত বসাইয়া দিয়া ইহারা ঢালু ও পিচ্ছিল স্থানেও অক্লেশে চলা-ফেরা করিতে পারে। ইহাদের মুখের শেষ দিকে গোঁফের ন্যায় বড় বড় লোম জন্মে।



সিন্ধু-ঘোটক

সিন্ধু-ঘোটকের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু স্বভাব তেমন মন্দ নয়। হঠাৎ কাহাকেও আক্রমণ করা ইহাদের অভ্যাস নহে; তবে উৎপীড়িত হইলে, ইহারা অত্যাচারীকে সহজে ছাড়ে না।

জলচর প্রাণী হইলেও ইহারা অনেক সময় সমুদ্রের উপকূলেই বাস করে। মাছ, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য।

তিমিবর্গ

আমরা কথায় বলি, তিমি মাছ। তিমি কিন্তু বাস্তবিক মাছ নহে। ইহারা জলচর পশু। জলের মধ্যে অক্লেশে চলা-ফেরা করিবার জন্যই ইহাদের চেহারা কেবল মাছের মত হইয়াছে; আর সব বিষয়ে অন্যান্য পশুদের সহিত ইহাদের বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই। পশুর ন্যায় তিমিরও গায়ের রক্ত গরম, মাছের রক্ত ঠাণ্ডা; তিমিও ফুস্‌ফুস্ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে, মাছেরা কিন্তু ফুল্‌কা বা কাণকুয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চালাইয়া থাকে। তার পর দেখ, তিমির ডিম হয় না,—একেবারে ছানা হয় এবং সেই ছানা মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচে; মাছেদের কিন্তু প্রথমে ডিম হয়, পরে তাহা হইতে ছানা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিমি

প্রধানতঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের সাগর-জলে তিমি (Whale) বাস করে। ইহারা ৫।৬টি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দন্তহীন (Mysticete) এবং কতকগুলি দন্তবিশিষ্ট (Denticete)। গ্রীণ্‌ল্যাণ্ড্‌দেশীয় তিমি (Balæna Mysticetus) দন্তহীন (Whalebone Whale) এবং আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহারা লম্বে ৫০।৫৫ হাতের কম নহে। ইহাদের মাথাও শরীরের উপযুক্ত প্রকাণ্ড এবং চোয়াল প্রায় ১২।১৪ হাত। কি স্থলচর, কি জলচর আর কোন প্রাণীর সঙ্গে বিশালদেহ তিমির তুলনাই হয় না। এক একটা ওজনে ৪০।৪৫টা হাতীর সমান। আমাদের ভারত মহাসাগরেও এক জাতীয় দন্তহীন তিমি দেখা যায়। ইহাদের ইংরাজিতে 'রর্‌কোয়াল' (Rorqual) বলে (Balænoptera Indica)। ইহাদের মাথা ছোট, মুখ ছুঁচ্‌ল। ইহারা লম্বায় ৬০।৬৪ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।



দন্তহীন তিমি

তিমির আকার মাছের মত, কিন্তু ইহাদের গায়ে যে পাখ্‌না আছে, তাহা মাছের পাখ্‌নার মত নহে। উপর হইতে চর্ম্ম ও মাংস তুলিয়া ফেলিলে, তিমির সম্মুখের পা-ই যে পাখ্‌নার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিমির লেজ পাশাপাশি বিস্তৃত, মাছের লেজের মত উপর ও নীচের দিকে বিস্তৃত নহে। ইহাদের গায়ের চর্ম্ম প্রায় লোমশূন্য এবং খুব মোটা। তাহার নীচে আধ হাত, তিন পোয়া পুরু চর্ব্বির স্তর। তিমির মাথার উপর তুইটি ছিদ্র আছে, তাহাদের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। ইহারা যখন নিঃশ্বাস ফেলে, তখন সেই তুইটি ছিদ্র দিয়া এত জোরে বাষ্প ও বায়ু নির্গত হইতে থাকে যে, দূর হইতে ফোয়ারা বলিয়া ভ্রম হয়। তিমি জল ছাড়িয়া বেশীক্ষণ বাঁচে না, আবার জলের মধ্যেও বেশীক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে না ; আন্দাজ আধ ঘণ্টা অন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এক একবার ভাসিয়া উঠে। আকারে অতি প্রকাণ্ড হইলেও, দন্তহীন বড় জাতীয় তিমি একটি আধ হাত লম্বা মাছও গিলিতে পারে না। ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি এবং শামুক ঝিনুকই ইহাদের খাদ্য। ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলে

আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। জেলেরা যেমন জাল পাতিয়া নদীতে মাছ ধরে, এই তিমিও তেমনি প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার করিয়া ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হয়। ইহাদের তালু হইতে সারি সারি নরম হাড়ের পর্দ্দার ন্যায় বস্তু ঝুলিতে থাকে। তাহাদের শেষদিক চিরুণির মত। কতকগুলি মাছ, চিংড়ি, শামুক প্রভৃতি মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ইহারা মুখ বন্ধ করে। তখন সেই সকল পর্দ্দার ফাঁক দিয়া সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়, কিন্তু মাছ, চিংড়ি প্রভৃতি পলাইতে পারে না। তিমি সেগুলিকে উদরসাৎ করে। এই উপায় ইহাদের বিশাল উদর পূর্ণ হয়।



দন্তবিশিষ্ট তিমি

দন্তবিশিষ্ট তিমির মুখে পর্দ্দা নাই। ইহারা অপেক্ষাকৃত বড় বড় মাছও খাইয়া থাকে। এই তিমি প্রধানতঃ পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান দেশের সমুদ্র-জলে বাস করে। দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিলের উপকূল হইতে ভারত-মহাসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রায় ইহাদের দেখা যায়। ১৮৯০ সালে মাদ্রাজের সমুদ্র-উপকূলে দীর্ঘে ১৬ হাত একটা তিমির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল।

ইংলণ্ড্ প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রধান দেশের লোকে তিমির তেল ও চর্ব্বি বেচিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তিমি-শিকার কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক। আহত তিমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। ইহাদের লেজে এত জোর যে, অনেক সময় তাহার এক আঘাতে প্রকাণ্ড নৌকা একবারে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। এরূপ শুনা গিয়াছে একবার একটা তিমি গুঁতা মারিয়া একখানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। এস্কিমোরা ইহাদের চর্ব্বি ও মাংস খায় এবং তেল জ্বালাইয়া তাহাদের বরফের ঘর গরম করে।

তিমির স্তন দুইটি। ইহাদের ছানা জলের মধ্যেই প্রসূত হয়। যতদিন না ছানাগুলি বড় হইয়া উঠে, ততদিন মায়ের স্তন-দুগ্ধই তাহাদের একমাত্র খাদ্য। ছানার প্রতি তিমি-মাতার স্নেহ-মমতা খুব বেশী।

শিশুক

শিশুক (Porpoise) দন্তবিশিষ্ট তিমিবর্গের অন্তর্গত প্রাণী। আকারে সাদৃশ্য থাকিলেও, মাছের সহিত ইহাদেরও কোন সম্পর্ক নাই। ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত।

সমুদ্রের গভীর জলে অসংখ্য শিশুক একত্র বিচরণ করে। সামুদ্রিক শিশুক বা 'মকর' লম্বে প্রায় ৭ হাত। ইহাদের উপর মাঢ়ীতে ৪১টা হইতে ৫০টা এবং নীচের মাঢ়ীতে ৪৫টা হইতে ৫১টা সরু সরু ধারালো দাঁত থাকে। মাটির মধ্যে লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে। সামুদ্রিক শিশুক শ্রেণী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। যথাঃ—'নারহোয়াল', 'ডলফিন', 'ক্যাচেলট' প্রভৃতি।

আমাদের দেশের গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতেও যথেষ্ট শিশুক (Plantanista Gangetica) দেখা যায়। লম্বে ইহারা ৩।৪ হাতের বেশী নহে। ইহাদের মাথা ছোট, ঠোঁট লম্বা ও সরু এবং প্রতি মাঢ়ীতে ২৬টা হইতে ৩৩টা ছোট ছোট ধারালো দাঁত এই সকল



গঙ্গার অন্ধ শিশুক

শিশুকের পিঠের দিক্ ঘন কটা বা কালো, কিন্তু পেটের দিক লাল্‌চে। মাঝে মাঝে দুই একটা আগাগোড়া লাল্‌চে অথবা কালো রং-এর শিশুকও দেখা যায়। সমুদ্রবাসী শিশুকের (Phocæna) চক্ষু প্রস্ফুটিত। কিন্তু গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের শিশুক অন্ধ। সর্ব্বদা ঘোলা জলে বিচরণ করে বলিয়া, ইহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়াছে।

শিশুক বেশীক্ষণ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না ; শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ঘন ঘন ভাসিয়া উঠে। তখন ইহাদের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনা যায়।

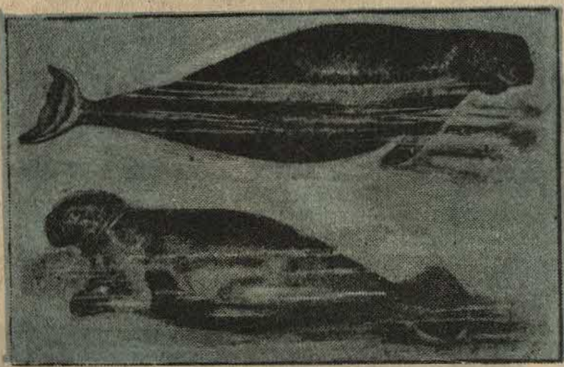
ইহাদের স্ত্রী-জাতি আকারে অনেক ছোট। উহাদের একবারে একটির বেশী ছানা হয় না। ছোটবেলা মায়ের দুধ খাইয়াই ছানাগুলি বাঁচিয়া থাকে।

সিন্ধু-গব বংশ

'মানাটি' ও 'ডুগং' সিন্ধু-গব নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু তিমি বা সীলের ন্যায় আমিষভোজী নহে ; সম্পূর্ণভাবে তৃণভোজী। শরীরের গড়ন, দাঁতের সংখ্যা এবং কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, তিমি অথবা শিশুকের সহিতও ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। সেই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে 'সিন্ধু-গব'

নামে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বংশের মধ্যে ধরিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গের।

মানাটি ও ডুগং দেখিতে অনেকটা মাছের মত, কিন্তু মাছের ন্যায় ইহাদের পাখ্না নাই। শরীরের দুই পাশে পাখ্নার মত যে দুইটি বস্তু দেখা যায়, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সম্মুখের পা। এই দুই পায়ের দ্বারা ছানাগুলিকে বুকে ধরিয়া মধ্যে মধ্যে যখন ইহারা জলের উপর ভাসিয়া উঠে, তখন দূর হইতে অনেকটা মানুষের মতই দেখায়। ইহা হইতে 'মার্মেড্' (Mermaid) বা 'আধা মানুষ আধা মাছ' নামে এক অদ্ভুত জীবের কল্পনা করিয়া নানা কাব্য ও গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত মহাসাগরে সিংহলের নিকট লোকের বিশ্বাস এবং কেহ কেহ এমনও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সমুদ্রের তলদেশ হইতে সঙ্গীতের ন্যায় মৃদুধ্বনি উত্থিত হইতে শুনিয়াছেন। ইহার কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এসবই আজগুবি গল্প মাত্র।



মানাটি ও ডুগং

মানাটি

আট্ল্যান্টিক মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি নদীর মোহানায় 'মানাটি (Manatee) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তিন জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দুই জাতি আমেরিকাবাসী, আর এক জাতির জন্মস্থান আফ্রিকা। লম্বে ইহারাও ৫।৬ হাত হইয়া থাকে। মানাটির ছেদন-দন্ত নাই, কিন্তু ডুগংএর মত চর্ব্বণ-দন্ত আছে। নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ্ খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে। ইহাকে 'সমুদ্রের গরু' (Sea-Cow) বলা হইয়া থাকে।

ডুগং

লোহিত-সাগর, সিংহলের নিকট ভারত-মহাসাগরে এবং অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র জলে তিন জাতীয় 'ডুগং' (Dugong) বাস করে। সিংহলীরা উহাদের 'মুদা-উরা' বলিয়া থাকে। লম্বে এক একটি ৫।৬ হাতের কম নহে। অষ্ট্রেলিয়ার ডুগং-ই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের উভয় মাঢ়ীতে চর্ব্বণ-দন্ত এবং কেবল পুং-জাতির উপর মাঢ়ীতে বড় বড় দুইটি ছেদন-দন্ত থাকে। শিশু অবস্থায় ইহাদের ৩২টি দন্ত থাকে,

কিন্তু পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৪টি দন্তে গিয়ে ঠেকে। জলজ উদ্ভিদ ইহাদের একমাত্র খাদ্য। ইহাদের তেলও কড়মাছের তেলের বদলে অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যবহার হইয়া থাকে। এক একটি ধাড়ী ডুগং-এর দেহ হইতে দশ বারো গ্যালন তেল পাওয়া যায়। এই তেলে কডলিভার তেলের ন্যায় দুর্গন্ধ নাই।

তীক্ষ্ণ-দন্তবর্গ

এই সকল জন্তুর ছেদন-দন্ত বড় বড় এবং খুব তীক্ষ্ণ বলিয়া, ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ-দন্ত বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কাঠবিড়াল গাছে থাকে ; বীবর, ক্যাপিবরা প্রভৃতি জলে থাকে



এবং ইঁদুর, খরগোস্, সজারু প্রভৃতি মাটির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে।

খরগোসের ছেদন-দন্ত উপর মাঢ়ীতে ২টি ; আর সকলের প্রতি মাঢ়ীতে ২টি করিয়া ছেদন-দন্ত থাকে। সেগুলি বাটালীর ন্যায় ধারালো। তদ্দারা অপেক্ষাকৃত শক্ত জিনিস-পত্রও সহজেই কাটা যায়। ক্রমাগত ব্যবহারে দাঁতগুলি যতই ক্ষয় হইতে থাকে, ততই আবার বাড়িয়া উঠে। এই বর্গের প্রাণীদের কুকুরে-দাঁত নাই। চর্ব্বণ-দন্ত আছে, কিন্তু সংখ্যায় কম। ইহাদের ছেদন ও চর্ব্বণ-দন্তের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কোন না কোন জাতীয় তীক্ষ্ণদন্ত বাস করে। ইহাদের সকলেই নিরামিষভোজী। খাইবার সময়, ইহারা পেছনের পা পাতিয়া উঁচু হইয়া বসে এবং সম্মুখের পায়ে খাদ্য-দ্রব্য ধরিয়া মুখে দেয়।

কাঠবিড়াল

কাঠবিড়ালের (Squirrel) মত এমন চালাক-চতুর, চঞ্চল প্রাণী খুব কম আছে। গাছের ডালে, ঘরের চালে, পাঁচিলের উপর—যেখানেই থাক, কেমন লেজ নাচাইতে নাচাইতে খেলা করিয়া বেড়ায়। একটু তাড়া দিলে অমনি দে-ছুট্। ইহাদিগকে ধরে কাহার সাধ্য! শুধু নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্যই যেন ইহাদের সৃষ্টি।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কাঠ- বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘন চিক্কণ লোমে ঢাকা ; লেজের লোম মোটা ও লম্বা, সেগুলি সর্ব্বদাই খাড়া হইয়া থাকে ; কোন কোন জাতির কাণের কাছেও এক এক গোছা বড় বড় লোম জন্মে।



বাঙ্গালার ডোরাদার কাঠবিড়াল

কাঠবিড়াল (Sciurus) বহু জাতিতে বিভক্ত; আকারে যেমন ছোট, বড়, মাঝারী—নানা রকমের হইয়া থাকে, তেমনি ইহাদের গায়ের রং কাহারো গৈরিক, কাহারো লাল্‌চে কটা, কাহারো বা সাদায়-কালোয় মিশান, তাহার উপর ডোরা ডোরা। সচরাচর বাঙ্গালাদেশে যে কাঠবিড়াল (S. Palmarum) দেখা যায়, ইহারা লেজ বাদে লম্বে প্রায় আধ হাত। ইহাদের শরীর যত বড়, লেজও প্রায় ততখানি গড়ন বেশ আঁট্‌-সাট্‌; পিঠের উপর লম্বালম্বি কয়েকটি ডোরা।

উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের কাঠবিড়াল লম্বে বাঙ্গালার সাধারণ কাঠবিড়ালের প্রায় দ্বিগুণ; ইহাদের গায়ের রং ঘন গৈরিক। এই কাঠবিড়ালের লাফাইবার ক্ষমতা খুব বেশী। অনেক সময় এক লাফে ইহারা ১০।১২ হাত দূরেও যাইতে পারে।

কাঠবিড়াল নানারকম ফল, পাতা ও শস্য খাইয়া জীবনধারণ করে। দাঁত খুব তীক্ষ্ণ ও শক্ত বলিয়া, ইহারা সহজেই নারিকেল প্রভৃতির ছোবড়া ও খোল কাটিয়া ভিতরের শাঁস খাইয়া থাকে; খাইবার সময় পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া বসে এবং সম্মুখের দুই পায়ে খাদ্য-দ্রব্য ধরিয়া মুখে পূরিয়া দেয়।

পাখীদের মত ডালের উপর বাসা বাঁধিয়া বাস করে, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এমন জীব-জন্তু নাই বলিলেই হয়। কাঠবিড়াল কিন্তু গাছের কোটরে কিংবা দুইটি ডালের খাঁজের ভিতরে ঘাস, খড় ও শুক্‌না পাতা দিয়া এমন পরিপাটি করিয়া বাসা তৈয়ারী করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাসার উপকরণগুলি এমন ভাবে সাজায়, একটির সঙ্গে আর একটি এমন আটকাইয়া দেয় যে, প্রবল বৃষ্টির সময়ও তাহার মধ্যে একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের একবারে ৩।৪টি করিয়া ছানা হয়। বাচ্ছা অবস্থা হইতে পোষ মানাইলে খুব পোষ মানে। পালকের পকেটে পকেটে, স্কন্ধে ও হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উড়ো কাঠবিড়াল

আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে; এসিয়ার সিংহল, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে উড়ো কাঠবিড়াল (P. Oral) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ৪ খানা পা ও লেজের কিয়দংশ বাদুড়ের ন্যায় পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া। সেই জন্য বাতাসে ভর করিয়া ইহারা বেশ সহজেই ৪০।৫০ হাত পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। সাধারণ কাঠবিড়াল দিবাচর। কিন্তু উড়ো কাঠবিড়াল (Flying Squirrel) প্রায়ই রাত্রিচর হইয়া থাকে। আর আর বিষয়ে সাধারণ কাঠবিড়ালের সহিত ইহাদের বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই।



নানা জাতীয় উড়ো কাঠবিড়াল

বীবর

বীবর (Beaver) দুই জাতিতে বিভক্ত। ইউরোপ ও এসিয়ার উত্তরাংশে যে সকল বীবর বাস করে, তাহারা এক জাতীয়। অপর জাতির জন্মস্থান আমেরিকা। আমাদের ভারতবর্ষে কোথাও বীবর নাই।

বীবর লম্বে দুই হাতের কিছু বেশী। ইহাদের মাথা বড়, পা ছোট, লেজ চওড়া এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘন কোমল লোমে ঢাকা; গায়ের রং পিঠের দিক্ লাল্‌চে কটা, পেটের দিক্ ধূসর। মাঝে মাঝে দুই একটা সাদা বীবরও দেখিতে পাওয়া যায়।

বীবর স্থল অপেক্ষা জলে বেশী সময় বাস করে। পেছনের পায়ের আঙ্গুল হাঁসের ন্যায় চামড়া দিয়া যোড়া বলিয়া অক্লেশে সাঁতার দিতে এবং ইচ্ছা করিলেই নাক ও কাণের ছিদ্র বন্ধ করিতে পারে বলিয়া অনেকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিতে ইহাদের কোন কষ্ট হয় না। আমেরিকার উত্তরাংশে অসংখ্য বীবর দেখা যায়। ইহারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং খুব শক্ত ও ধারালো ছেদন-দন্ত দ্বারা বড় বড় গাছ কাটিয়া নদী, হ্রদ ও উৎসের কিনারায় আপনাদের পল্লী নির্ম্মাণ করে।

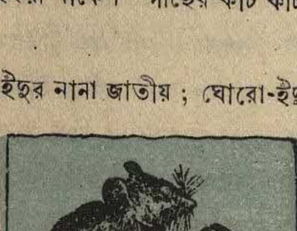
এই কার্য্যে বীবরের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্রোতের গতিরোধ


বীবর

করিবার জন্য ইহারা গাছ, পাথর ও মাটির সাহায্যে যে বাঁধ প্রস্তুত করে, তাহা বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য। বীবরের লেজের গোড়ায় দুইটি থলি থাকে। সেই থলির মধ্যে এক প্রকার সুগন্ধ পদার্থ সঞ্চিত হয়। কোমল চর্ম্ম এবং এই পদার্থের জন্য প্রতি বৎসর শত শত বীবর নিহত হইয়া থাকে। গাছের কচি কচি ডাল ও ছাল ইহাদের খাদ্য।

ইঁদুর

ইঁদুর নানা জাতীয় ; ঘোরো-ইঁদুর, নেংটি-ইঁদুর, মেঠো-ইঁদুর, গেছো-ইঁদুর, জোলো-ইঁদুর ইত্যাদি। ইহাদের কোন কোন জাতি লম্বে প্রায় এক ফুট, আবার কোন কোন জাতি দুই ইঞ্চির বেশী নহে। ইংরাজিতে বড় জাতের ইঁদুরকে 'র‍্যাট' (Rat) এবং ছোট জাতকে বলে 'মাউস' (Mouse)।



ইঁদুরের মুখ ছুঁচ্‌ল ও গোঁফযুক্ত, চোখ জ্বল্‌জ্বলে এবং লেজ লোমশূন্য ; গায়ের রং কোনটার কটা, কোনটার ধোঁয়াটে, কোন কোনটার বা কাল্‌চে। অন্যান্য তীক্ষ্ণদন্ত জন্তুর প্রতি পায়ে ৫টি করিয়া নখযুক্ত আঙ্গুল থাকে, কিন্তু ইঁদুরের সম্মুখের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল এত ছোট যে, নাই বলিলেও চলে।

ঘোরো-ইঁদুরের দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব। ইহাদের অত্যাচারে খাদ্য-সামগ্রীর তো কথাই নাই, ঘরের আস্‌বাবগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করা ভার। গেছো এবং মেঠো-ইঁদুরও কম অত্যাচারী নহে। নানা রকম ফল ও শস্য খাইয়া ইহারা কৃষকের সর্ব্বনাশ করে। জোলো-ইঁদুর খাল, বিল প্রভৃতির তীরে থাকে এবং কীট, পতঙ্গ, ব্যাঙ্‌ ও ছোট ছোট ইঁদুর ধরিয়া খায়।

অল্প সময়ের মধ্যে ইঁদুরের বেজায় বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। চারিমাস অন্তর ইহাদের এক একবার ৮।৯টি হইতে ১৩।১৪টি পর্য্যন্ত বাচ্ছা হইয়া থাকে। ছানার প্রতি স্ত্রী-জাতির মমতা খুব বেশী।

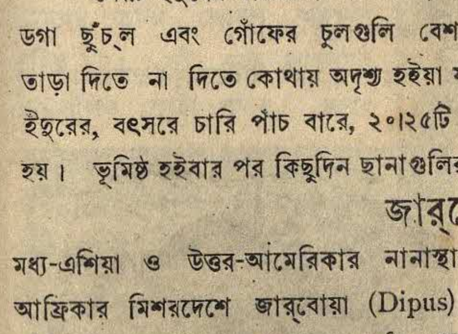
নেংটি ইঁদুর

নেংটি-ইঁদুর সাধারণ ঘোরো-ইঁদুর অপেক্ষা অনেক ছোট। ঘোরো-ইঁদুর অনেক সময় লেজ বাদে এক ফুট লম্বা হয়, কিন্তু নেংটি-ইঁদুর কখনো ২।৩ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লেজ কিন্তু শরীরের চাইতে ৩।৪ ইঞ্চি বড়।

নেংটি-ইঁদুরের গায়ের রং ঘন কটা; পিঠ অপেক্ষা পেটের দিক্ ফিকে; কাণের ডগা ছুঁচ্‌ল এবং গোঁফের চুলগুলি বেশ বড় বড়। ইহারা খুব চঞ্চল। একটু তাড়া দিতে না দিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। এই জাতীয় ইঁদুরের, বৎসরে চারি পাঁচ বারে, ২০।২৫টি হইতে সময় সময় ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত ছানা হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুদিন ছানাগুলির চক্ষু বন্ধ থাকে।

জার্‌বোয়া

মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-আমেরিকার নানাস্থানে, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে এবং আফ্রিকার মিশরদেশে জার্‌বোয়া (Dipus) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও দুই এক প্রকারের জার্‌বোয়া জাতীয় (Gerbillus Indica) ইঁদুর দেখা যায়। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে 'লাফানে' ইঁদুর বলা যাইতে পারে। জার্‌বোয়া নানা জাতিতে বিভক্ত। জার্‌বোয়ার (Jerboa) পিছনের পা ও লেজ বেজায় লম্বা। এই দুই অঙ্গের উপর ভর দিয়া ইহারা কতক খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে; তাড়া দিলে ঠিক ক্যাঙ্গারুর মত লাফাইতে লাফাইতে চক্ষুর নিমেষে বহু দূর চলিয়া যায়। ইহাদের কাণ খুব বড় এবং লেজের শেষদিকে এক এক গোছা চুল থাকে। ইহারা রাত্রিচর। সন্ধ্যার পর আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। নানা

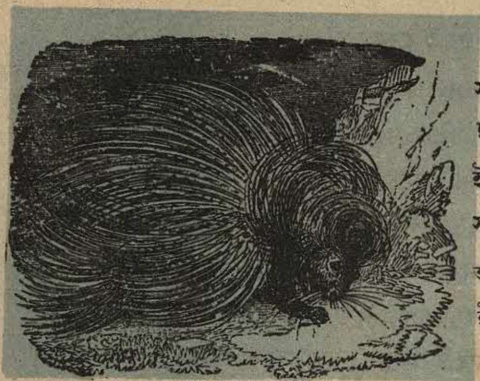


জার্‌বোয়া

রকম ফল, মূল, শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। জার্‌বোয়া সহজেই পোষ মানে।

সজারু

সজারু (Porcupine) দুই জাতীয়; মেঠো-সজারু ও গেছো-সজারু। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় কাঁটায় ভরা। এই কাঁটাই সজারুর আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহাদের ছেদন-দন্ত এত তীক্ষ্ণ যে, তাহাদ্বারা খুব শক্ত কাঠও অনায়াসে কাটিতে পারে। আমেরিকার ব্রেজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে কয়েক জাতীয় গেছো-সজারু আছে, তাহারা স্বচ্ছন্দে গাছের ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষে চার


সজারু

জাতীয় মেঠো-সজারু আছে। সজারু রাত্রিচর। ফল, মূল, গাছের ছাল ও কচু ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ইহাদের দুই হইতে চারটি বাচ্ছা এক সঙ্গে হয় এবং ইহারা চক্ষু ফোটা অবস্থাতেই জন্মায়।

ইহাদের মাংস খাইতে খুব সুস্বাদু।

চিঞ্চিলাস্


চিঞ্চিলাস্

মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকা চিঞ্চিলাসের জন্মস্থান। দেখিতে কতকটা ইঁদুরের মত হইলেও কাঠবিড়ালেরই সহিত ইহাদের নিকট সম্পর্ক। চিঞ্চিলাসের পিছনের পা খুব লম্বা, সেই পায়ে ৪টি এবং সম্মুখের পায়ে ৫টি নখযুক্ত আঙ্গুল থাকে; শরীরের তুলনায় ইহাদের কাণ বেজায় বড়। খাবার সময় ইহারা কাঠবিড়ালের মত পিছনের পায়ে ভর দিয়া বসে এবং সম্মুখের পায়ে খাদ্য-দ্রব্য ধরিয়া মুখে দেয়।

ক্যাপিবরা

ক্যাপিবরা (Capybara) দক্ষিণ-আমেরিকাবাসী। এই বর্গের সব জন্তুর চাইতে ইহারা আকারে বড়—লম্বে এক একটি ৪ ফুটের কম নহে। ইহাদের শরীর বেশ মোটাসোটা এবং লোম খুব বড় ও ঘন; গায়ের রং লাল্‌চে কটা।


ক্যাপিবরা

সাঁতার দিতে ইহারা বিলক্ষণ পটু। কেহ তাড়া দিলে সাঁত্‌রাইয়া পালাইতে চেষ্টা করে, কিংবা গাছ-পালার আড়ালে নাক উঁচু করিয়া, জলের মধ্যেই পড়িয়া থাকে।

খরগোস

খরগোস্ (Hare) দুই জাতীয়। এক জাতির কাণ লম্বা ; আর এক জাতির কাণ ছোট। আমাদের দেশের দীর্ঘকর্ণ খরগোস্ (Lepus Ruficaudatus) প্রায়ই একা একা বাস করে। ইহাদের ছানা লোমশ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। সেই সময় তাহাদের চোখগুলিও ফোটা থাকে। অপর জাতীয় খরগোস্ (Rabbit) ইউরোপ প্রভৃতি দেশে দলে দলে বাস করে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, তাহাদের ছানার গায়ে লোমও থাকে না এবং চক্ষুও ফোটা থাকে না!



দীর্ঘকর্ণ খরগোস্

হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলের পাদদেশে তরাই-জঙ্গলে এবং রাজমহল পাহাড় ও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় একজাতীয় খরগোস (Hispid Hare) দেখা যায়। আমাদের দেশে একমাত্র ইহাদেরই ইউরোপীয় জাতীয়ের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাদের মাংসও ইউরোপীয়ের ন্যায় সাদা, আমাদের সাধারণ খরগোসের ন্যায় লাল নয়।

খরগোস্ খুব ভীরু; তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির সাহায্যে বহু দূর হইতেই শত্রুর গতিবিধি জানিতে পারে এবং পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ইহারা এত দ্রুতগামী যে, শিকারী কুকুর প্রাণপণে ছুটিয়াও অনেক সময় ইহাদিগকে ধরিতে পারে না।



ভিন্ন জাতীয় খরগোস্

ইহাদের বংশ-বৃদ্ধির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দেশে খরগোস্ ছিল না। ইংলণ্ড্ হইতে সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি খরগোস্ তথায় নীত হয়। কিছুকালের মধ্যে তাহাদের বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, খরগোসের অত্যাচারে সে দেশের কোন কোন অঞ্চলে শস্যাদি রক্ষা করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

হিমালয় এবং হিমালয়ের পাদদেশ কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত ইউরোপীয়

খরগোস-বংশের অন্তর্গত আরেক প্রকার জন্তু (Lagomys) দেখা যায়। উহাদের ইংরাজিতে 'পাইকা' (Pika) বলে। উহারা দেখিতে ছোট কিন্তু খুব হৃষ্টপুষ্ট। ইহাদের কাণ ছোট এবং লেজহীন। আফগানিস্থান ও পারস্যে ইহাদের এক জাতিকে (Red Pika) দেখা যায়।

শুণ্ডধারীবর্গ

হাতী

ইঁদুর-খরগোসের পরই শুণ্ডধারীবর্গ দেখিয়া অবাক্ লাগে। অতি ক্ষুদ্র নেংটি-ইঁদুর হইতে বিরাট দাঁতাল হাতী! কিন্তু প্রকৃতির লীলায় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত যোগসূত্র রহিয়াছে। বিরাট ব্যবধানের জন্যই হাতীর (Elephant) শ্রেণীবিভাগ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাদিগকে সশফ বা খুরীবর্গের মধ্যে ধরিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, হাতী 'শুণ্ডধারী' নামে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গের অন্তর্গত।

এশিয়ার দক্ষিণাংশ এবং আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ-প্রদেশ হাতীর জন্মস্থান। এই অতি পুরাতন জীব কেবল এই দুই মহাদেশেই বর্ত্তমান।



আফ্রিকাদেশীয় হস্তী

ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়-উপদ্বীপ এবং বোর্ণিও ও সুমাত্রা-দ্বীপে যে জাতীয় হাতী পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদিগকে 'ভারতবর্ষীয়' হাতী (Elephas Indicus) বলে। এই হাতী আমাদের দেশের নানা স্থান, বিশেষতঃ, হিমালয়ের নিম্ন-প্রদেশে, আসামের গারো-পর্ব্বতে, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতের বনে জঙ্গলে বাস করে।

স্থলচর জন্তুগণের মধ্যে হাতী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহাদের শরীর ও মাথা প্রকাণ্ড, ঘাড় খুব ছোট ও মোটা, কাণ বড় বড় কুলোর মত এবং পা মোটা মোটা থামের মত। নাকই হাতীর শুঁড়; এই শুঁড় ছাড়া ইহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। শরীরের তুলনায় হাতীর চোখ খুব ছোট; ইহাদের গায়ের রং ধোঁয়াটে, চামড়া পুরু,

অসমান ও প্রায় লোমশূন্য ; কেবল লেজের ডগায় একগোছা চুল থাকে।

হাতীর শুঁড় খুব অদ্ভুত। ইহাদের নাসিকা বড় হইয়াই শুঁড়ে পরিণত হইয়াছে ; উহার ভিতর দিয়া লম্বালম্বি নাকের ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের দ্বারা ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। শুঁড়ের শেষ দিকে ভারতবর্ষের হাতীর একটি এবং আফ্রিকার হাতীর দুইটি আঙ্গুলের মত বস্তু আছে ; উহাদের সাহায্যে হাতী খুব ছোট ছোট জিনিসও ধরিতে পারে। ঘাড় ছোট বলিয়া ইহারা মাটিতে মুখ নামাইতে পারে না, শুঁড় দিয়া খাদ্য-দ্রব্য উঠাইয়া লয়। সুতরাং শুঁড় ইহাদের হাতেরও



ভারতবর্ষীয় হস্তী

কাজ করে। তাহা ছাড়া পিপাসা পাইলে, শুঁড় দিয়া জল শুষিয়া ইহারা মুখে ঢালিয়া দেয় এবং কখনো কখনো শুঁড়ের জল ফোয়ারার ন্যায় ছিটাইয়া শরীর শীতল করে। হাতীর শুঁড়ের গড়ন এরূপ যে, ইচ্ছা করিলে ইহারা তাহা বাড়াইতে কমাইতে, আশে পাশে ঘুরাইতে ফিরাইতে এবং কুণ্ডলী পাকাইতে পারে।

হাতীর শ্ব-দন্ত নাই। ইহাদের উপরের চোয়ালে কেবলমাত্র ২টি ছেদন-দন্ত আছে। ভারতবর্ষের হাতীর কেবল পুং-জাতির ছেদন-দন্ত মুখ হইতে অনেকখানি বাহির হইয়া পড়ে— ইহাকেই 'গজদন্ত' বলে। স্ত্রী-জাতীর ছেদন-দন্তও বড় বড়,

কিন্তু সকল সময়ে তাহা মুখের বাহিরে দেখা যায় না। আফ্রিকার পুং ও স্ত্রী—উভয়েরই গজদন্ত মুখ হইতে বক্রভাবে বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের হাতীর গজদন্ত সচরাচর ৩।৩½ হাত লম্বা হয়, কখনো কখনো ৫।৫½ হাত হইতেও দেখা যায়; আফ্রিকার হাতীর গজদন্ত কিন্তু আরো বড়; ৬।৭ হাত লম্বা গজদন্ত সেখানে সর্ব্বদাই চক্ষে পড়ে। বিখ্যাত শিকারী 'গর্ডন কামিং' একবার একটি ১৩½ হাত গজদন্ত দেখিয়াছিলেন; উহা ওজনেও ছিল দুই মণের বেশী। গজদন্ত ছাড়া হাতীর উভয় মাঢ়ীতে সম্মুখের দিকে আর একটিও দাঁত নাই। ইহাদের উপর ও নীচের প্রতি কসে ৬টি করিয়া, চারি কসে মোট ২৪টি চিবাইবার দাঁত থাকে। হাতীর চর্ব্বণ-দন্ত খুব বড় ও চেপ্টা। ঐ দাঁত দিয়া ইহারা অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা ডাল-পালাও অনায়াসে পিষিয়া ফেলিতে পারে। ইহাদের দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার কখনও উঠে না।

সচরাচর হাতীর সম্মুখের পায়ে ৫টি ও পিছনের পায়ে ৩টি বা ৪টি খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে। সময় সময় পিছনের কোন এক পায়ে ৫টি খুরযুক্ত আঙ্গুলও দেখা যায়। আবার কখনো কখনো ইহাদের সম্মুখের পায়ে ৪টির বেশী খুর থাকে না। এ দেশের হস্তী-ব্যবসায়ীগণ যোড়খুর হাতীকে 'অপয়া' এবং বিযোড়খুর হাতীকে 'পয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আফ্রিকাদেশীয় হাতীর পিছনের পায়ে কেবল ৩টি খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।

এশিয়ার হাতী অপেক্ষা অফ্রিকার হাতী লম্বেও বড়, উঁচুতেও বেশী। এশিয়ার হাতী সচরাচর ৬।৬½ হাত উঁচু হয়। মাঝে মাঝে এ দেশে ইহা অপেক্ষাও বড় হাতী দেখা যায়। কলিকাতার যাদুঘরে ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু একটা ভারতবর্ষীয় হাতীর কঙ্কাল আছে, কিন্তু আফ্রিকাদেশে ১২।১৩ ফুট উঁচু হাতীর অভাব নাই। এশিয়ার খুব বড় বড় হাতীও ওজনে ১০০ বা ১১০ মণেরও বেশী দেখা যায় না, কিন্তু আফ্রিকার অনেক হাতীই ওজনে ১৫০ মণের উপরে। এশিয়ার হাতীর কাণ কুলোর মত বড়, কিন্তু আফ্রিকার হাতীর কাণ এত বড় যে, একজন লোক সহজেই তাহার আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে পারে। অফ্রিকার হাতীর রং একটু বেশী কালো এবং চোখ এশিয়ার হাতীর চোখের মত তত ছোট নহে।

হাতী মাত্রেই বেশ সাঁতার দিতে পারে। দিনের বেলায় ইহারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে, নদী, খাল অথবা বিলের ধারে অবস্থিতি করে। রাত্রিতে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। হাতী নিরামিষভোজী। গাছের কচি ডাল-পালা, ফুল-পাতা, শিকড় এবং নানা রকম শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা প্রায়ই দলে দলে বিচরণ

করে। এক এক দলে ২০।২৫টা হইতে ১০০।১৫০টা পর্য্যন্ত হাতীও দেখা যায়। সময় সময় রাত্রিকালে দলের কতকগুলি শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও হাতী স্বভাবতঃ বেশ নিরীহ ও শান্ত, কিন্তু এক একটা ক্ষ্যাপা হাতী মাঝে মাঝে দল ছাড়িয়া লোকালয়ের কাছে আসে এবং যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই বধ করে। ইহাদিগকে 'গুণ্ডা হাতী' বলে।

হাতীর বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তাহার অধিকাংশই মিথ্যা। ইহাদের মস্তক প্রকাণ্ড হইলেও, মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি সামান্য। হাতী অপেক্ষা বানর ও কুকুরের বুদ্ধি প্রখর। ইহাদের বুদ্ধিশক্তি একেবারে নাই, একথাও ভাবিও না।

বহুদিন অন্তর হস্তিনীর ছানা হয়। সচরাচর একবারে একটি ছানা হইয়া থাকে। কখনো দুইটি ছানা হইতেও দেখা যায়। ছানা-হাতী শুঁড় দিয়া স্তন্যপান করে না, মুখের দ্বারাই মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া থাকে। আন্দাজ ২৫।৩০ বৎসর বয়সে ইহারা যৌবন-প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

পোষা হাতী মাত্রেই এশিয়া-বাসী। আফ্রিকার হাতী সহজে পোষ মানিতে চাহে না; কিন্তু তেমন যত্ন ও চেষ্টা করিলে উহাদিগকেও যে পোষ মানাইয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সশফ বা খুরীবর্গ

যে সকল জন্তুর পায়ের নখ খুরে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'সশফ' বলে। গরু, ছাগল, ভেড়া, এ্যান্টিলোপ্ (কৃষ্ণসার-গোষ্ঠী), জিরাফ, হরিণ, উট, শূকর, হিপোপটেমাস্, টেপির, ঘোড়া এবং গণ্ডার খুরী-বর্গের অন্তর্গত। অনেকের মতে সিন্ধুগবও এই বর্গের অন্তর্গত। এই বর্গের অধিকাংশ জন্তু এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা-বাসী হইলেও, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন জাতের খুরী জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দুই প্রধান দলে বিভক্ত :—

অযুগ্মখুর (বিযোড়-খুর)

যাহাদের পিছনের পায়ে 'একটা' কিংবা 'তিনটা' খুর। যেমন :—ঘোড়া, টেপির, ও গণ্ডার। এই দলের সকল গুলাই 'অরোমন্থক'-শ্রেণীভুক্ত।

যুগ্মখুর (যোড়-খুর)

যাহাদের পিছনের পায়ে 'দুইটা' কিংবা 'চারিটা' খুর। যেমন :—গরু, ছাগল, ভেড়া, কৃষ্ণসার, জিরাফ, হরিণ, উট, শূকর ও হিপোপটেমাস্। ইহাদের মধ্যে দুই খুরবিশিষ্ট

গরু, ছাগল, ভেড়া, কৃষ্ণসার, জিরাফ, হরিণ ও উট 'রোমন্থক' শ্রেণীভুক্ত এবং চারিখুরবিশিষ্ট শূকর ও হিপোপটেমাস্ 'অ-রোমন্থক' শ্রেণীভুক্ত।

সশফমাত্রেই উদ্ভিদ্‌ভোজী। একমাত্র হিপোপটেমাস্ ছাড়া আর সকলেই স্থলচর। ঘাস-খড়, লতা-পাতা, শাক-শব্‌জী ইহাদের খাদ্য। সেই জন্য ইহাদের কসের দাঁত খাদ্যবস্তু পেষণের উপযোগী চওড়া ও চেপ্টা। এই বর্গের কাহারো কণ্ঠাস্থি নাই।

অযুগ্ম-খুর

বিযোড়-খুর জন্তুদের দলে ঘোটক, টেপির ও গণ্ডার—এই তিন বংশের জন্তু দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ঘোটকের প্রত্যেক পায়ে একটি, টেপিরের পিছনের পায়ে তিনটি ও সম্মুখের পায়ে চারিটি এবং গণ্ডারের প্রত্যেক পায়ে তিনটি খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে। ইহারা সকলেই অরোমন্থক-শ্রেণীভুক্ত এবং সকলেরই পাকস্থলী এক কোটরবিশিষ্ট।

(যাহারা গিলিত খাদ্য পুনরায় উগ্‌রাইয়া চিবাইতে পারে না, অর্থাৎ জাওর কাটে না, তাহাদের 'অ-রোমন্থক' বলে।)

ঘোটকাদি

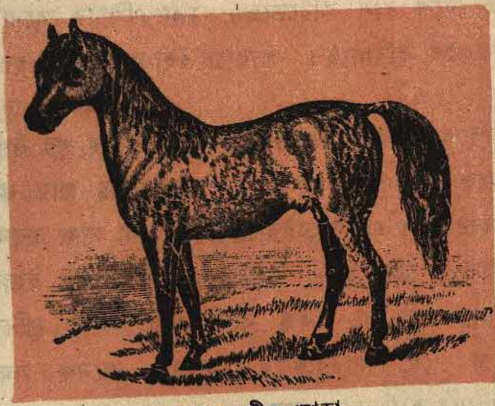
ঘোড়ার (Horse) গড়ন সুন্দর, ভঙ্গী আরো সুন্দর; সর্ব্বাঙ্গ একেবারে তেজে ভরা। ইহাদের চোখ মুখ দিয়া সেই তেজ যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চায়।

ইহারা কয়েক জাতিতে বিভক্ত, প্রায় প্রত্যেক জাতিই শরীরের সৌন্দর্য্যে এবং কোন না কোন সদ্‌গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর। ঘোড়ার মাঝের আঙ্‌ুলটি বড় হইয়া এইরূপ খুরে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে অন্য অঙ্গুলের কোন চিহ্নই নাই, কিন্তু চর্ম্ম ও মাংসের নীচে ২য় ও ৪র্থ আঙ্গুলের আভাস পাওয়া যায়। ঘোড়ার দাঁতের সংখ্যা ৪০; উপর ও নীচের মাঢ়ীতে ২টি করিয়া ৪টি শ্ব-দন্ত, ৬টি করিয়া ১২টি ছেদন-দন্ত এবং উপর কসে ১২টি ও নীচের কসে ১২টি—মোট এই ২৪টি চর্ব্বণ-দন্ত। ঘোটকীর শ্ব-দন্ত থাকে না। সুতরাং তাহার দাঁত ৩৬। ঘোড়ার দুই মাঢ়ীর দুই পাশে, ছেদন ও চর্ব্বণ-দন্তের মাঝখানে কতকটা ফাঁকা থাকে। তৃণ ও নানা রকম শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। এই জন্য ইহাদের চর্ব্বণ-দন্ত খুব চওড়া ও চেপ্টা।

ঘোড়ার গায়ের লোম ছোট, কিন্তু ঘাড়ে ও লেজে গোছা গোছা লোম জন্মে। ইহাদের মাথা হইতেও একগোছা লোম কপালের উপর ঝুলিয়া পড়ে। বুনো ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় লোমে ভরা

পোষা ঘোড়ার মধ্যে আরবদেশীয় ঘোড়া সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। অষ্ট্রেলিয়ার

'ওয়েলার' ঘোড়ার সৌন্দর্য্যও কম নহে। ইংলণ্ডের 'ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া' এবং 'শিকারী' ঘোড়াও খুব বিখ্যাত। ইহাদের সহিত আরবদেশীয় ঘোড়ার নিকট সম্পর্ক। শিকারী ঘোড়ার লাফাইবার শক্তি অদ্ভুত। ইহাদের কোন কোনটা এক লাফে ২৩।২৪ হাত চওড়া নালাও পার হইতে পারে।



আরবদেশীয় ঘোড়া

ভারতবর্ষের মধ্যে কাটি-ওয়ার প্রদেশের ঘোড়াই উল্লেখযোগ্য। এই সকল ঘোড়া উঁচে ৩।৩½ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ছোট জাতীয় ঘোড়ার মধ্যে সেট্‌ল্যাণ্ড্‌ ও ব্রহ্মদেশের টাট্টু খুব প্রসিদ্ধ। টাট্টু ঘোড়া উঁচুতে ২½ হাতের বেশী হয় না।



সেট্‌ল্যাণ্ড টাট্টু

আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্য-এশিয়ায় কয়েক জাতীয় বুনো ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইউ-রোপীয়গণ প্রথমে যখন আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে বাস করিতে যান, তখন তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ঘোড়া ছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলা পলাইয়া



এশিয়ার বুনো ঘোড়া

জঙ্গলে আশ্রয় লয়। সেই সকল ঘোড়ার বংশ এখন বুনো ঘোড়া হইয়া ঐ দুই দেশে বাস করিতেছে। মধ্য-এশিয়ার বুনো ঘোড়া বহু পুরাতন বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আকারে ইহারা বেশী বড় হয় না।

গাধা

দেখিতে সুন্দর না হইলেও গাধা মানুষের খুব উপকারী জন্তু। কিন্তু মানুষের নিকট হইতে ইহারা প্রায়ই তেমন আদর-যত্ন পায় না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পোষা গাধা ক্রমেই দুর্ব্বল ও ছোট হইয়া পড়িতেছে। ঠেলিলেও ইহারা নড়িতে চাহে না, কিন্তু বুনো গাধা এমন ছুটিতে পারে যে, আরবদেশীয় ঘোড়াও অনেক সময় তাহাদের কাছে হার মানে।


পোষা গাধা

সাধারণ ঘোড়া অপেক্ষা গাধা আকারে ছোট। ইহাদের মাথা বড় ও কাণ বেজায় লম্বা। গাধার শিরদাঁড়ার উপর, মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত, একটি ডোরা থাকে; কোন কোন জাতের কাঁধ হইতে সন্মুখের পায়ের উপর পর্য্যন্ত দুইদিকে আর দুইটি ডোরা দেখা যায়। ইহাদের লেজ ঘোড়ার লেজের মত নহে; উহার শেষদিকেই কেবল লম্বা লম্বা চুল থাকে। গাধার খুরের গড়ন পাহাড়ে জায়গায় বেড়াইবার উপযোগী। যে সকল দুর্গমস্থানে যাওয়া-আসা করিতে ঘোড়া অক্ষম, গাধা অনায়াসেই সেই সকল স্থানে ছুটাছুটি করিতে পারে। গাধার বুদ্ধিও নিতান্ত কম নহে। ভালরূপ শিখাইতে পারিলে, সার্কাসের ঘোড়ার মত ইহারাও নানা ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইতে পারে।

এশিয়াতে তিন জাতীয় বুনো গাধা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশের গাধাই (E. Hermonius) সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিব্বতীরা ইহাদের 'কিয়াং' (Kiang) বলে। ইহাদের গায়ের রং ধূসর। পশ্চিম ভারতবর্ষে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও আফগানিস্থানে আর এক রকম ছোট জাতের গাধা (E. Onager) আছে, ইহাদের রং ধোঁয়াটে সাদা। হিন্দিতে উহাদের 'ঘোড়খুর' বলে। তৃতীয় (E. Hemippus) জাতির বাসভূমি সিরিয়া হইতে পারস্য পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই। আফ্রিকায় যে সকল বুনো গাধা দেখিতে পাওয়া যায়,


পারস্যের বুনো গাধা

তাহাদের কাণ খুব লম্বা এবং ঘাড়ের চুল ছোট। প্রধানতঃ এই জাতীয় গাধারই কতকগুলি গৃহপালিত হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছে।

জেব্রা

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার পাহাড়িয়া জঙ্গল জেব্রার (Zebra) জন্মস্থান। শরীরের গড়নে ঘোড়া হইতে ইহাদের কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল রং-এ। জেব্রার গায়ের লোম সাদা, তাহার উপর কালো কালো ডোরা। ইহাদের মাথায়, মুখে, গলায়, ঘাড়ে, বুকে, পিঠে, পায় এবং লেজে কোথাও ডোরার অভাব নাই।

জেব্রার স্বভাব অতি চঞ্চল। ঘোড়া ও গাধা ইহাদের নিকট জ্ঞাতি। এই দুই জন্তু বহুকাল হইতেই মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু জেব্রা কিছুতেই তাহাতে রাজী নহে। অনেক দিন হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার বুওর্‌গণ পোষা ঘোড়া ও গাধার সহিত জেব্রা জুতিয়া গাড়ী টানাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত ভাল রকম কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

জেব্রা তিন চারি জাতিতে বিভক্ত। এক জাতীয় জেব্রাকে 'কোয়াগা' (Quagga) বলে। উহারা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কোয়াগার শরীরের সম্মুখের দিকেই ডোরা থাকে, পিছনদিকে পায়ে ডোরা থাকে না। ইহাদের ঘাড় হইতে লেজ পর্য্যন্ত, পিঠের উপর দিয়া আর একটা ডোরা দেখা যায়।



জেব্রা

জেব্রার ঘাড়ে ঠিক ঘোড়ার মতই বড় বড় লোম জন্মে, কিন্তু সেগুলি ঝুলিয়া পড়ে না, সর্ব্বদাই খাড়া হইয়া থাকে।

টেপির

টেপির (Tapir) ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক জাতি মালয়দেশে (Tapirus Indicus) এবং বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে। অপর চারি জাতির জন্মস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ইহাদের চেহারা হাতী ও শূয়রের মাঝামাঝি।

মালয় দেশীয় টেপির আকারে খুব বড়—লম্বে ৫ হাত, উঁচুতে ২ হাতের কম নহে। ইহাদের গায়ের রং ঘন কটা বা কালো, কেবল পিঠ, শরীরের দুই পাশ ও কাণ ধোঁয়াটে সাদা। আমেরিকার টেপিরের রং আগাগোড়াই কালো।

ইহাদের দাঁতের সংখ্যা ৪২ ; উপর ও নীচের মাঢ়ীর সম্মুখে ৬টি করিয়া ১২টি ছেদন-দন্ত, ২টি করিয়া ৪টি শ্ব-দন্ত এবং উপরের দুই কসে ১৪টি আর নীচের দুই কসে ১২টি—মোট এই ২৬টি চর্ব্বণ-দন্ত। টেপিরের শ্ব-দন্ত খুব ছোট।

টেপিরের সম্মুখের পায়ে চারিটি ও পিছনের পায়ে তিনটি করিয়া খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে এবং মুখে ছোট একটি শুঁড় বাহির হয়। তাহার শেষদিকে নাকের ছিদ্র দেখা যায় ইহাদের গায়ের চামড়া মোটা ও নরম ; তাহার উপর ছোট ছোট লোম জন্মে। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা ইহারা শত্রুর গতিবিধি ঠিক করিতে পারে।

টেপির স্থলচর প্রাণী, কিন্তু প্রয়োজন হইলে জলেও অনেকক্ষণ থাকিতে পারে। বিপদ্-আপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই জলের ধারে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে। শূয়রের ন্যায় কাদায় পড়িয়া খেলা করিতে ইহারা খুব পটু।



মালয়দেশীয় টেপির

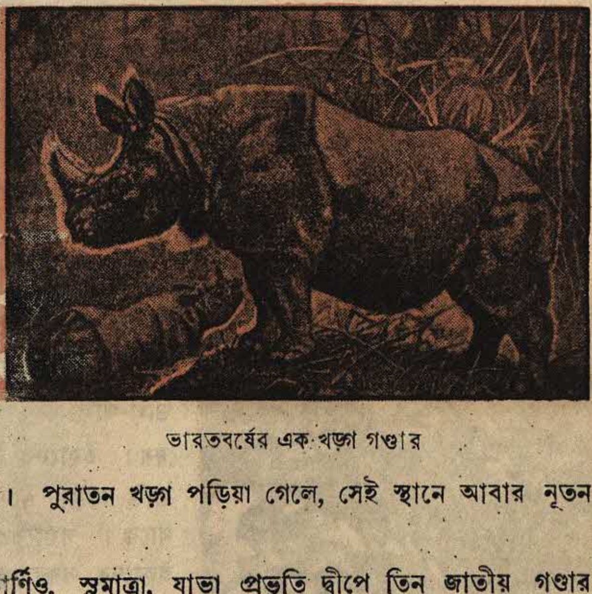
টেপির খুব ভীরু ; দিনের বেলায় প্রায়ই জঙ্গলের বাহির হয় না, সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া আহারের চেষ্টায় সারা-রাত ঘুরিয়া বেড়ায়। আখ, ফুটি, খেজুর প্রভৃতি ইহাদের বড়ই প্রিয় ; নানা প্রকার শাক-শব্জী, গাছের মূল, কচি পাতা এবং জলজ উদ্ভিদ্ও ইহারা তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

ভীরু বটে, কিন্তু ছানা হইবার পূর্ব্বে স্ত্রী-টেপির ভয়ানক রোখা হইয়া উঠে। তখন তাহারা মানুষকেও আক্রমণ করিতে ভয় পায় না। ইহাদের একবারে একটি মাত্র ছানা হয়। ছোটবেলায় পুষিলে টেপির বেশ পোষ মানে।

গণ্ডার

এশিয়া ও আফ্রিকা গণ্ডারের (Rhinoceros) জন্মস্থান। এক সময় ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা স্থানে গণ্ডার বাস করিত, কিন্তু এখন সেই সকল দেশে গণ্ডারের বংশ একেবারে লোপ পাইয়াছে।

হাতী অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও গণ্ডার সামান্য জন্তু নহে; ইহাদের কোন কোন জাতি লম্বে প্রায় হাতীরই মত। গণ্ডারের মাথা খুব বড়, শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গায়ের চামড়া পুরু, মাংসপেশী দৃঢ়, পা বেঁটে ও মোটা এবং প্রতি পায়ে তিনটি করিয়া খুরযুক্ত আঙ্গুল।



ভারতবর্ষের এক-খড়্গা গণ্ডার

ইহাদের নাকের ঠিক উপরে খড়্গ বাহির হয়। কোন কোন জাতির একটি, কোন কোন জাতির বা দুইটি খড়্গ হইয়া থাকে। এই খড়্গ শৃঙ্গীয় পদার্থে গঠিত নহে জমাট বাঁধা কেশের গুচ্ছ মাত্র। ইহাদের খড়্গ কপালের হাড়ের সহিত যুক্ত নহে, চামড়ার উপর হইতেই বাহির হয়। পুরাতন খড়্গ পড়িয়া গেলে, সেই স্থানে আবার নূতন খড়্গ জন্মিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এবং বোর্ণিও, সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দ্বীপে তিন জাতীয় গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের এক-খড়্গা কালো গণ্ডার (R. Indicus) সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও প্রধান। ইহারা নেপাল, ভোটান ও আসামের জঙ্গলে বাস করে। এই গণ্ডার লম্বে ৭ হাত এবং উচুতেও প্রায় ৪ হাত। ইহাদের গায়ের চামড়া মোটা, কর্কশ ও প্রায় লোমশূন্য; উহা ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে এবং উহার বাহির পিঠ্‌ পেরেকের মাথার ন্যায় গুটিকাতে পূর্ণ। ইহাদের নাকের উপর হইতে একটিমাত্র খড়্গ বাহির হয়; উহা সাধারণতঃ ১ ফুট লম্বা, মাঝে মাঝে ১½ ফুট খড়্গাও দেখা যায়। শূয়রের ন্যায় ইহারাও সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া থাকিতে ভালবাসে।

আসাম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যাম, সুমাত্রা, যাভা ও বোর্ণিও দ্বীপে আর এক জাতীয় ছোট আকারের গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদেরও নাকের উপর একটিমাত্র খড়্গ।

ব্রহ্ম, মালয় ও শ্যামদেশে এবং সুমাত্রা ও বোর্ণিও-দ্বীপে অপর এক জাতীয় (Ceratorhinus) গণ্ডার আছে, ইহাদের নাকের উপর দুইটি খড়্গ বাহির হয় এবং ইহাদের সর্ব্বাঙ্গেই কিছু কিছু লোম জন্মিয়া থাকে।

আফ্রিকায় দুই জাতীয় গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক জাতির রং ধোঁয়াটে সাদা ; সেই জন্য ইহাদিগকে শ্বেত-গণ্ডার বলে। গণ্ডার জাতির মধ্যে শ্বেত-গণ্ডারই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। লম্বে ইহারা কখনো কখনো ১০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং উঁচুতেও ৪½ হাতের কম নহে। আফ্রিকার অপর এক জাতীয় গণ্ডারের রং কাল্‌চে। তাহারা আকারে অনেক ছোট—লম্বে ৫ হাত ও উঁচুতে প্রায় ৩½ হাত। এই দুই জাতিরই ২টি করিয়া খড়্গ বাহির হয়। সাধারণতঃ সম্মুখেরটি বড় এবং পিছনেরটি ছোট। সময় সময় এক একটা গণ্ডারের দুইটি খড়্গই প্রায় সমান হইয়া থাকে। আবার কোন কোনটার সম্মুখেরটি ছোট এবং পিছনেরটি বড় হইতেও দেখা যায়। এশিয়ার এক-খড়্গ কালো গণ্ডারের ন্যায়, ইহাদের কাহারো চর্ম্ম ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে না। গণ্ডারের উপরের ঠোঁট কিছু বড়, তাহা নীচের ঠোঁটের উপর ঝুলিয়া পড়ে। সেই ঠোঁটের দ্বারা ডাল-পালা জড়াইয়া ইহারা মুখে পুরিয়া দেয়। ইহাদের উপর ও নীচের চোয়ালে প্রতি কসে ৭টা করিয়া চর্ব্বণ-দন্ত থাকে। গণ্ডারের শ্ব-দন্ত নাই। ইহাদের সকল জাতির ছেদন-দন্তও থাকে না। গণ্ডারের কসের দাঁত এত শক্ত যে, তাহা দ্বারা গাছের মোটা মোটা ডালও অনায়াসে পিষিয়া ফেলিতে পারে।



আফ্রিকার দ্বি-খড়্গ কালো গণ্ডার

সাধারণ লোকের মনে একটা ধারণা আছে, গণ্ডারের চর্ম্ম এত শক্ত যে, বন্দুকের গুলিতেও বিদ্ধ হয় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শিকারী বন্দুক দিয়াই গণ্ডার শিকার করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের কাঁচা চামড়া তেমন শক্ত নহে, চামড়া শুকাইলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ গণ্ডার নিরীহ। কিন্তু ইহাদের স্বভাবের উপর নির্ভর করা যায় না। সময় সময় অকারণে অথবা সামান্য কারণে ইহারা ক্ষেপিয়া উঠে। ক্ষ্যাপা গণ্ডার ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ও একগুঁয়ে। যাহাকে সম্মুখে পায়, খড়্গের আঘাতে তাহাকেই বধ করে। বাঘ ইহাদের ত্রিসীমায়ও ঘেঁসে না; গণ্ডার দেখিয়া হাতীকেও লেজ গুটাইয়া পলাইতে দেখা গিয়াছে।

যুগ্মখুর

অরোমন্থক

যোড়-খুর দলে, যে সকল জন্তুর পায়ে গরু, ছাগলের মত 'দুইটা' খুর, তাহারা গিলিত বস্তু উগ্‌রাইয়া পুনরায় চিবাইয়া খায়। সেইজন্য তাহাদিগকে 'রোমন্থক' বলে আর যাহাদের পায়ে 'চারিটা' খুর, যেমনঃ—শূকর, পেকারি ও **জলহস্তী**; তাহারা সকলেই 'অরোমন্থক' শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের কোনটাই গিলিত বস্তু উগ্‌রাইয়া চিবায় না। এই সকল জন্তুর আহার-প্রণালী ঠিক অন্যান্য জন্তুদের মত এবং পাকস্থলীতে একটিমাত্র কোটর।

শূকর



শূকর (Hog) নানা জাতিতে বিভক্ত ও নানা আকারবিশিষ্ট। ইহারাও যোড়-খুর দলের জন্তু, কিন্তু ইহাদের খুরের সংখ্যা দুইটা নহে—চারিটা; পায়ের সম্মুখের দুইটা বেশ বড়, চলিবার সময় শরীরের সমস্ত ভার তাহাদের উপরই পড়ে; এবং পিছনের দুইটা খুব ছোট; সেগুলি ভূমিও স্পর্শ করে না।

শূকরের মাথা খুব বড় ও লম্বা এবং মুখের দিক্ ক্রমশঃ সরু। ইহাদের উপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁট অপেক্ষা একটু বড়, তাই মুখের অগ্রভাগ ছোট একটা শুঁড়ের মত দেখায়; উহার শেষদিকে নাকের ছিদ্র থাকে। শূয়র সেই শুঁড় দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বা উল্টাইয়া কন্দ, মূল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য বাহির করিয়া লয়। শূয়রের গায়ের চামড়া পুরু এবং লোম খুব মোটা ও কর্কশ। ইহাদের ঘাড়ের লম্বা লোমগুলি খেঙ্‌রা কাটির ন্যায় সোজা হইয়া থাকে। সেই লোমে বুরুষ প্রস্তুত হয়। এই লোমকে চলিত কথায় 'কুঁচি' বলে।

শূয়রের দাঁতের সংখ্যা ৪৪; উপর ও নীচের পাটীর সম্মুখে ৬টা করিয়া ১২টা ছেদন-দন্ত এবং ২টা করিয়া ৪টা শ্ব-দন্ত। তাহা ছাড়া দুই পাটীর প্রত্যেক কসে

৭টা করিয়া মোট ২৮টা চর্ব্বণ-দন্ত। পুং-শূকরের নীচের মাঢ়ীর শ্ব-দন্ত দুইটি বাড়িয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। মলক্কা-দ্বীপের এক জাতীয় শূকরের উভয় মাঢ়ীর চারিটা শ্ব-দন্তই বাহির হইয়া থাকে। সেই দাঁতগুলি লম্বে ৮।৯ ইঞ্চির কম নহে এবং তাহাদের আগা খুব ছুঁচ্‌ল। কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলে, দাঁতই ইহাদের প্রধান অস্ত্র।



বুনো শূয়র

বন্য ও গৃহপালিত শূকর একই বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও, উভয়ের স্বভাবে অনেক প্রভেদ। পোষা শূয়র মানুষের কাছে থাকিয়া ক্রমে অনেকটা শান্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বুনো শূয়রের (Wild Boar) মত এমন একগুঁয়ে ও বদরাগী জানোয়ার খুবই কম আছে।

ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এক রকম বুনো শূয়র (Sus Indicus) দেখিতে পাওয়া যায়, লম্বে ইহারা সাড়ে তিন হাতের কম নহে, উঁচুতেও প্রায় দুই হাত। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ খোঁচা খোঁচা কালো বা ধূসর লোমে ভরা; ঘাড়ের ঝুঁটি একেবারে খাড়া। এই শূয়রের এক একটি শ্ব-দন্ত লম্বে প্রায় এক ফুট। ইউরোপের বুনো শূয়র কিন্তু আকারে একটু ছোট। তাহাদের ঘাড়ের ঝুঁটিও তেমন বড় নহে। তাহাদিগকে উত্তর-আফ্রিকায় এবং মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়াতেও পাওয়া যায়।

শূকরজাতির মধ্যে ভারতবর্ষের ও ইউরোপের বুনো শূয়র (S. Scrofa) সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র। ইহারা দলে দলে বাস করে। প্রত্যেক দলে একটা করিয়া ধাড়ী পুং-শূয়র সর্দ্দারের কাজ করে। সেই সকল সর্দ্দার মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া গিয়া দল ছাড়িয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় ইহারা এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে যে, সম্মুখে পড়িলে মানুষ, ঘোড়া, গরু কাহারো রক্ষা পাওয়া কঠিন। এমন কি, দুরন্ত বাঘেরও নিস্তার নাই।

সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে; মালয়-দেশে ও জাপানে ভিন্ন ভিন্ন কয়েক রকম বুনো শূয়র দেখিতে পাওয়া যায়।

বুনো শূয়র দিনের বেলায় বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে, আখের ক্ষেতে অথবা অন্য

কোন ঝুপীর মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। নানা জাতীয় ছোট ছোট গাছের মূল—বিশেষতঃ কচু, ঘেঁচু প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য; মৃত প্রাণীর মাংসেও অরুচি দেখা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, আসাম অঞ্চলের এক জাতীয় বুনো শূয়র কাদার ভিতর হইতে মাছ ধরিয়া খাইতে ভালবাসে। লোকালয়ের নিকট যে সকল বুনো শূয়র রাস করে, তাহারা রাত্রিকালে ক্ষেতে পড়িয়া কৃষকের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। সিকিম ও নেপালের তরাই প্রদেশের শালের জঙ্গলে এক জাতীয় (Porcula) বেঁটে শূয়র (Pigmy Hog) দেখা যায়। লম্বা চওড়ায় ইহারা বড় খরগোসের চেয়ে বেশী হইবে না।

বুনো শূয়রের মত পোষা শূয়রও নানা জাতিতে বিভক্ত; সবগুলাই বেশ গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট ও চর্ব্বিযুক্ত। শ্যাম, মালয় ও ভারতবর্ষে এক জাতীয় পোষা শূয়র আছে, তাহাদের পা এত ছোট যে, পেট প্রায় মাটিতে গিয়া ঠেকে। জাপানের পোষা শূয়র কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাহাদের কোন কোনটার কাণ ঝোলা ও গায়ের চামড়া কোঁক্‌ড়ান। পোষা শূয়রের মধ্যে চীনদেশের সাদা শূয়র খুব প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকে দেখিতে ঠিক ভিস্তির জলপূর্ণ মসকের মত।

শূকরীর বৎসরে দুইবার বাচ্ছা হয়। এক একবারে ৫টি হইতে দশটি পর্য্যন্ত বাচ্ছা হইয়া থাকে। কি পোষা, কি বুনো সকল জাতীয় শূকরের ছানার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পেকারী

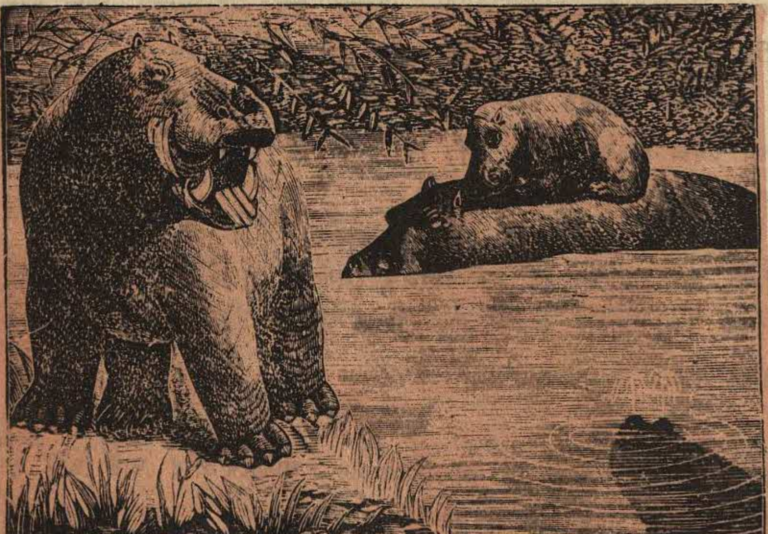
দেখিতে অনেকটা শূয়রের মত হইলেও 'পেকারি' (Peccary) ভিন্ন বংশের জন্তু। ইহাদের উপর মাঢ়ীর শ্ব-দন্ত নীচের দিকে বড় হয় এবং পাকস্থলী ঠিক রোমন্থক জন্তুদের মত। আমেরিকা ইহাদের জন্মস্থান।

জলহস্তী

জলহস্তী বা হিপোপটেমাস্‌ (Hippopotamus) আকারে প্রায় ছোট ছোট হাতীরই মত। ইহাদের গায়ের রং-ও কতকটা সেইরূপ এবং দাঁতগুলাও খুব বড় বড়; ইহার উপর প্রায় সর্ব্বদাই জলে থাকিবার অভ্যাস— এই সকল কারণে লোকে ইহাদিগকে 'জলহস্তী' বলে। কিন্তু নামে জলহস্তী হইলেও, হাতীর সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। হাতী অপেক্ষা শূয়রের সহিতই ইহাদের নিকট সম্বন্ধ। কতকগুলি লুপ্ত জীবের কঙ্কাল পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির হইয়াছে যে, শূয়র ও জলহস্তী একই বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।



পুরাকালে আমাদের দেশে গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীতে জলহস্তী-বংশীয় জন্তু দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও জলহস্তী নাই। আফ্রিকায় ইহাদের দুইটি ভিন্ন জাতি আছে। পশ্চিম-আফ্রিকায় এক জাতীয় জলহস্তী দেখা যায়, তাহারা আকারে অনেক ছোট (Pigmy Hippopotamus)—দেখিতে কতকটা বড় বড় শূয়রেরই মত। জল অপেক্ষা তাহারা স্থলই বেশী ভালবাসে। এই বেঁটে জলহস্তী (H. Liberiensis) পূর্ব্বে ইউরোপের ক্রীট, মল্টা ও সিসিলি দ্বীপসমূহে এবং ভারত ও ব্রহ্মদেশে দেখা যাইত; কিন্তু



জলহস্তী

এক্ষণে এই সব স্থানে উহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশে যে জলহস্তী (H. Amphibius) বাস করে, লম্বে তাহারা কখনো কখনো ৯।৯½ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তবে সচরাচর ৮ হাত লম্বা জলহস্তীই বেশী দেখা যায়।—জলহস্তীর দেহ পিপার মত গোল; মাথা প্রকাণ্ড, মুখ চওড়া, চোখ

ছোট, কাণ ছোট ও গোল, চামড়া মোটা এবং প্রায় লোমশূন্য। ইহাদের দাঁতের সংখ্যা ৪০; তন্মধ্যে উভয় মাঢ়ীতে ২টি করিয়া ৪টি শ্ব-দন্ত, ৪টি করিয়া ৮টি ছেদন-দন্ত এবং ১৪টি করিয়া ২৮টি চর্ব্বণ-দন্ত। জলহস্তীর শ্ব-দন্ত ও ছেদন-দন্ত বেশ বড় বড়। ইহাদের পা খুব মোটা ও বেঁটে এবং প্রতি পায়ে খুরযুক্ত চারিটি আঙ্গুল। চলিবার সময় শরীরের ভার চারিটি আঙ্গুলের উপরই পড়ে।

খুরওয়ালা জন্তুদিগের মধ্যে কেবল জলহস্তীই জলে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা ইচ্ছা করিলে নাক ও কাণের ছিদ্র বন্ধ করিয়া ১০।১২ মিনিট পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে। জলহস্তীর লোমকূপ হইতে তৈলের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ বাহির হয়; সেই জন্য সর্ব্বদা জলে পড়িয়া থাকিলেও ইহাদের শরীর সিক্ত হয় না।

সমস্ত দিনের পর গাছ, পালা, শস্য প্রভৃতি খাইবার জন্য জলহস্তী সন্ধ্যার সময় ডাঙ্গায় উঠে এবং সারারাত ডাঙ্গাতেই থাকে; রাত্রিতে ক্ষেতে ঢুকিয়া যত পারে শস্য খায় এবং তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ডাঙ্গায় গাছ-পালার অভাব হইলে, নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ খাইয়াই ইহারা জীবনধারণ করে।

জলহস্তী সাধারণতঃ বেশ শান্ত ও নিরীহ। কিন্তু আক্রান্ত হইলে, উন্মত্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তখন শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের একবারে একটি ছানা হয়; কচিৎ দুইটি ছানা হইতেও দেখা গিয়াছে।

যোড়-খুর

রোমন্থক

যোড়-খুর জন্তুদের মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, কৃষ্ণসার, জিরাফ, হরিণ ও উটের খুরের গড়ন দেখিলেই মনে হয়, যেন একটি খুরই সমান দুইভাগে চেরা। আসলে কিন্তু ইহাদের খুর একটি নহে—দুইটি। এইরূপ যোড়-খুর জন্তু মাত্রেই জাওর কাটে, অর্থাৎ গিলিত খাদ্য পুনরায় উগ্‌রাইয়া চিবাইতে থাকে। ইহার নাম রোমন্থন। সেই জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিকে 'রোমন্থক' জন্তু বলে। এই



রকম চেরা-খুর নয়, এমন কোন জন্তুই জাওর কাটে না।

ইহাদের পায়ের ৩য় ও ৪র্থ আঙ্গুলের নখ খুরে পরিণত হইয়া, আঙ্গুল

দুইটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পায়ের পিছন দিকে ২য় ও ৫ম আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু চলিবার সময় সেগুলি মাটি স্পর্শ করে না।

উট ব্যতীত অন্যান্য রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলী চারি কোটরে বিভক্ত। খাদ্য-বস্তু প্রথম কোটরে জমা হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় কোটরে নীত হয়; সেখান হইতে ইহারা তাহা উগ্‌রাইয়া তুলিয়া পুনরায় চিবাইতে থাকে। ভালরূপ চিবান হইলে, সেগুলি তৃতীয় কোটরে সঞ্চিত হয়; তার পর চতুর্থ কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া জীর্ণ হইয়া যায়। উটের পাকস্থলী তিনটি কোটরে বিভক্ত।

সাধারণতঃ রোমন্থক জন্তুর উপরের চোয়ালে ছেদন-দন্ত এবং শ্ব-দন্ত বা কুকুরে-দাঁত নাই। কিন্তু সেই স্থানের মাড়ী খুব শক্ত। উপরের চোয়ালে দুই কসে ৬টা করিয়া ১২টা চিবাইবার দাঁত আছে। ইহাদের নীচের চোয়ালে সবশুদ্ধ ২০টা দাঁত দেখা যায়। তাহার মধ্যে ৬টা ছেদন-দন্ত ও ২টা কুকুরে-দাঁত। এই ৮টা দাঁতের দুইদিকে কতকটা ফাঁক। তার পর দুই কসে ১২টা চিবাইবার দাঁত। খাইবার সময় ইহারা জিহ্বার দ্বারা ঘাস, খড় প্রভৃতি জড়াইয়া, ছেদন-দন্ত ও উপরের শক্ত মাড়ীতে চাপিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। তখন খস্‌-খস্‌ শব্দ হইয়া থাকে।

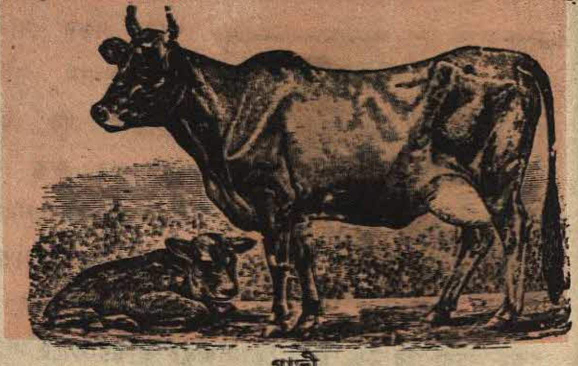
উট বাদে এই শ্রেণীর প্রায় সকল জন্তুরই শিং থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া, কৃষ্ণসার প্রভৃতির শিং ফাঁপা ও স্থায়ী; কিন্তু হরিণের শিং নিরেট ও অস্থায়ী, উহা প্রতি বৎসর একবার করিয়া পড়িয়া যায়।

গবাদি

এই বংশের প্রায় সকল জন্তুরই পুং-জাতির শিং হয়। ধিকাংশের স্ত্রী-জাতিরও শিং থাকে। ইহাদের শিং ফাঁপা, ডালপালাহীন ও স্থায়ী।

গরু

পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রকম গরু (Cow) দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কতক-গুলা পোষ মানে এবং মানুষের গৃহে পালিত হয়, আর কতকগুলা চিরকালই বন্য থাকিয়া যায়। ইহাদের কোন কোন জাতি আকারে ছোট, কোন কোন জাতি বড়। কোন কোন জাতির গলার চামড়া বেশ আঁট-সাঁট, আবার কোন কোন জাতির গলার চামড়া



গাভী

পর্দ্দার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। শিং কাহারো লম্বা ও বাঁকা এবং কাহারো বা খুব ছোট ও সোজা। পুং-গরুকেই ষাঁড় (Ox বা Bull) বলে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল রকম গরুরই কাঁধে ঝুঁটি বাহির হয় ; ষাঁড় অপেক্ষা গাভীর ঝুঁটি ছোট। বিলাতী গরুর ঝুঁটি থাকে না। উত্তর-ভারতেও একজাতীয় ঝুঁটিহীন গরু দেখিতে পাওয়া যায়।

গরুর ন্যায় মানুষের এমন উপকারী জন্তু আর নাই। ইহারা অতি সহজেই পোষ মানে এবং পালক-পরিবারের খুব বাধ্য হয়। সংসারের নানা কার্য্যে আমরা ইহাদের সাহায্য পাইয়া থাকি।

গরু সাধারণতঃ বেশ শান্ত, কিন্তু দুই একটা ক্ষেপা ষাঁড় কিছুতেই শাসন মানিতে চাহে না। গাভী আকারে প্রায়ই ছোট হইয়া থাকে। ইহাদের চারিটি স্তন। গাভীর একবারে একটির বেশী বাচ্ছা হয় না।

কর্ণাটের সমুদ্র-তীরে আমাদের এই ঝুঁটিওয়ালা গরু বহুকাল হইতে বন্য অবস্থায় বাস করিতেছে। ইহারা আকারে খুব বড়। আফ্রিকা ও চীনদেশের নানা স্থানে এবং মাদাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপেও এই গরু দেখা যায়।

গৌর বা গেরী গাই

কেপ্-কমোরিন্ হইতে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ এবং নেপাল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত—ভারতবর্ষের নানা স্থানের পার্ব্বত্য জঙ্গলে গৌর (Gour) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চেহারা প্রায় মহিষেরই মত। গো-বংশীয়ের মধ্যে এত বড় জন্তু আর নাই। উচ্চে ইহারা হাতের কম নহে ; কখনো কখনো ৪ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের শিং-ও প্রায় দুই হাত। গৌর-এর গায়ের রং কালো, কেবল পায়ের নীচের দিক্ সাদা। গরুর মত ইহাদের গলার চামড়া ঝুলিয়া পড়ে না। ইহাদের ভারতীয় 'বাইসন' বলা হইয়া থাকে।



গৌর

গৌর দল বাঁধিয়া বাস করে। ইহাদের স্বভাব মন্দ নহে, কিন্তু আক্রান্ত হইলে, ভয়ানক উগ্র হইয়া উঠে।

গয়াল বা মিথুন

গৌর অপেক্ষা গয়াল বা মিথুন আকারে কিছু ছোট। ইহাদের শিং তত বড় হয় না এবং বেশী বাঁকাও নহে। গায়ের রং প্রায় গৌর-এরই মত, কেবল পায়ের নীচের দিক্ ফিকে হল্‌দে। মণিপুর, কাছাড়, চট্টগ্রাম, মিশ্‌মি এবং লুসাই পর্ব্বতে যথেষ্ট গয়াল (Gayal) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল অঞ্চলে ইহাদের কতকগুলা গরুর ন্যায় পালিত হইয়া থাকে।



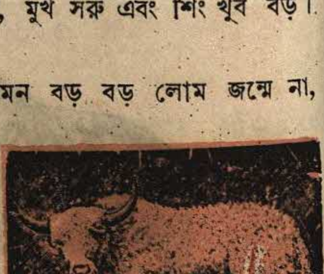
গয়াল

চম্‌রী

চম্‌রী (Yak) তিব্বতদেশ-বাসী। লাডাক ও কারাকোরামের পার্ব্বত্য প্রদেশেও ইহাদের দেখা যায়। ইহাদের লেজে চামর হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে 'চম্‌রী' বলে। আকারে ইহারা সাধারণ গরু অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহাদের গড়ন-পেটন বেশ মোটা-সোটা; পা ছোট ও দৃঢ়, কপাল চওড়া, মুখ সরু এবং শিং খুব বড়। স্ত্রী-জাতি আকারে কিছু ছোট হয়।

চম্‌রীর মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ও লেজের গোড়ায় তেমন বড় বড় লোম জন্মে না, কিন্তু দেহের দুই পাশ ও লেজের শেষদিক্ হইতে লম্বা লম্বা লোমের গোছা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। বন্য অবস্থায় ইহাদের গায়ের রং ঘন কটা বা কালো। ইহারা বেশ পোষ মানে। গৃহপালিত চম্‌রী ভিন্ন ভিন্ন রং-এর হইয়া থাকে।

চম্‌রী একেবারেই গরম সহ্য করিতে পারে না। সাধারণতঃ ইহারা সমুদ্র হইতে ১৫।২০ হাজার ফুট উঁচু পর্ব্বতের গায়ে দলে দলে বিচরণ করে।



চম্‌রী

মহিষ

আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র মহিষ (Buffalo) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, বুক চওড়া, পা বেঁটে ও দৃঢ় এবং শিং লম্বা, বাঁকা ও চেপ্টা। সাধারণ গরু অপেক্ষা ইহারা আকারে অনেক বড়।

গায়ের রং ঘন পিঙ্গল ; তবে দেশ-ভেদে কালো, মেটে এবং ধূসর মহিষও চক্ষে পড়ে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র এবং আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশে মহিষ পুষিবার রীতি আছে। মানুষের উপকারী হিসাবে ইহারা প্রায় গরুরই মত। আমাদের বোঝা বহা, চাষ-আবাদে সাহায্য করা, গাড়ী টানা—ইহাদের নিত্য কাজ। মহিষের দুধও খুব পুষ্টিকর। পোষা মহিষের স্বভাব মন্দ নহে, কিন্তু বন্য অবস্থায় ইহাদের দিকে চাহিতেও ভয় হয়।


মহিষ

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। বন্য মহিষের (B. Arni) চক্ষে এমন একটা বিদ্রোহের ভাব সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয়, এই বুঝি শিং-এর গুঁতায় বুকের হাড় গুঁড়া করিয়া দিল! একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে, মানুষ তো দূরের কথা, ইহারা বাঘ, সিংহ, হাতী কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

মহিষ জল-কাদা খুব ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় ইহারা এমন ভাবে জলের মধ্যে পড়িয়া থাকে যে, নাকের ছিদ্র দুইটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

বাইসন

উত্তর-আমেরিকার এক জাতের বন্য মহিষকে 'বাইসন্' বলে। এরূপ বিকটাকার জন্তু গো-বংশের মধ্যে অল্পই আছে। মস্ত মাথা, বাঁকা শিং, জ্বলন্ত চোখ ; শরীরের সম্মুখভাগ গোছা গোছা ঝাঁক্‌ড়া লোমে ভরা ; ইহার উপর আবার মাথা গোঁজ করিয়া শিং বাগাইয়া চলন! দেখিলেই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। ইহাদের কাঁধে ষাঁড়ের ন্যায় ঝুঁটি এবং লেজে গরুর ন্যায় কেশগুচ্ছ থাকে।


বাইসন্

বাইসন্ উঁচুতে তিন হাত, সাড়ে তিন হাতের কম নহে। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় কটা। ছোটবেলায় পুষিলে ইহারা পোষ মানে।

বাইসনের বিষয়ে যে কথা শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইবে, তাহা এখন পুরানো

ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পঙ্গপাল উড়িলে যেমন সমস্ত আকাশ ভরিয়া যায়, সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত দেখা যায় না, তেমনি প্রকাণ্ড এক একটা বাইসনের দল ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-আমেরিকার মাঠ-ঘাট ছাইয়া ফেলিত। এক এক দলে বিশ লক্ষ—ত্রিশ লক্ষ বাইসন্! যতদূর দৃষ্টি চলিত, বাইসন্ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। রেলগাড়ী ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা ছুটিয়াও সেরূপ কোন একটা দল পার হইতে পারিত না।

বাইসনের ভীড় ঠেলিয়া ট্রেন চালান অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিত। কখনো কখনো এঞ্জিনের ধাক্কায় কতকগুলি করিয়া বাইসন্ মারা পড়িত, কখনো কখনো বা এঞ্জিন সমেত সমস্ত ট্রেনখানা উল্টাইয়া লোকজন, জিনিষপত্র সব নষ্ট হইত। এরূপ ঘটনা একবার নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটিত।

এদিকে বাইসনের অত্যাচারে দেশের চাষ-বাসও প্রায় বন্ধ। অবস্থা যখন ক্রমে সঙ্গীন হইয়া উঠিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া বাইসন-বংশ ধ্বংশের উপায় স্থির করিলেন। তাহার ফলে, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বাইসন্ মারা পড়িতে লাগিল। এইরূপে নিহত হইতে হইতে ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারী বাগানে কয়েকটা ছাড়া এখন দেশে আর একটাও বাইসন্ নাই।

কস্তূরী বৃষ

আমেরিকার সুদূর উত্তরে—মেরুপ্রদেশে কস্তূরী বৃষের (Musk-Ox) বাস। আকারে তেমন বড় নহে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় ঘন লোমে ঢাকা বলিয়া ইহাদিগকে বেশ বড় দেখায়।



কস্তূরী বৃষ

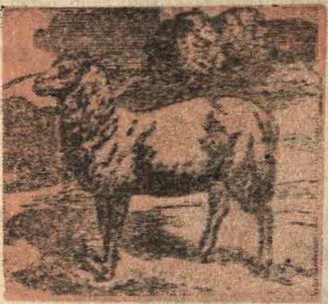
ইহাদের পুং-জাতির শিং খুব মোটা, বাঁকা ও চেপ্টা; উহাদের মূলভাগ প্রায় যুক্ত। শিং দুইটি মাথার দুইপাশ বেড়িয়া ক্রমে নিম্নমুখী হয়, শেষে আবার উল্টা দিকে বাঁকিয়া খাড়া হইয়া উঠে। স্ত্রী-জাতির শিং-এর এরূপ বাহার নাই। কস্তূরী বৃষ দলে দলে বাস করে; স্বভাব তেমন দুর্দ্দান্ত নহে; কিন্তু আক্রান্ত হইলে, সমস্ত দল ক্ষেপিয়া যখন শিং

বাগাইয়া ছুটিয়া আসে, তখন কাহারো সাধ্য নাই যে, ইহাদের গতিরোধ করে। কস্তূরী বৃষের মাংস এস্কিমোজাতির বড়ই প্রিয়। এই মাংস হইতে এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হয় বলিয়া, ইহাদের নাম হইয়াছে—'কস্তূরী বৃষ'। ইহাদের চর্ম্মেও তাহাদের নানা কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

ছাগাদি

ভেড়া বা মেষ-গোষ্ঠী

মেষের (Sheep) চেহারা বেশ গোলগাল, ঘাড় ছোট, পা বেঁটে, শিং বাঁকা ও চেপ্টা



এবং লোম ঝাঁক্ড়া ও কোঁক্ড়া। ছাগের ন্যায় ইহাদের দাড়ি গজায় না। মেষের মাথার খুলি বড়ই শক্ত। শিং নাই এমন মেষকেও ঢুঁ মারিয়া মোটা মোটা তক্তা ফাটাইতে দেখা গিয়াছে।

পোষা মেষ ছাড়া পৃথিবীতে ১০।১২ রকম বুনো মেষও দেখিতে পাওয়া যায়। বুনো মেষ দলে দলে বিচরণ করে। তাহাদের শিং খুব লম্বা এবং লেজ খুব ছোট। এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে এক রকম পোষা ভেড়া দেখা যায়, মাংস ও চর্ব্বির ভারে তাহাদের লেজ ঠিক বাবুই পাখীর বাসার মত ঝুলিয়া পড়ে। তাহাদিগকে 'দুম্বা' ভেড়া বলে। ইহাদের মাংস খুব সুস্বাদু।

বার্ব্বারি ভেড়া



বার্ব্বারি ভেড়া

সকল রকম বুনো ভেড়ার মধ্যে আফ্রিকার 'উদাদ্' (Udad) বা 'বার্ব্বারি ভেড়া' (Barbary Sheep) খুব প্রসিদ্ধ। ইহারা উঁচুতে প্রায় দুই হাত; ইহাদের শিং দুইটিও প্রকাণ্ড। এই ভেড়ার সম্মুখের দুই পায়ের চারি পাশ ও গলা হইতে চমরীর ন্যায় লম্বা লম্বা লোমের গোছা ঝুলিয়া পড়ে।

আর্গালি ভেড়া

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশ 'আর্গালি ভেড়ার' (Argali) জন্মস্থান। আকারে ইহারা এক একটি বড় গর্দ্দভের মত। ইহাদের কাণ ও লেজ ছোট, গায়ের লোমও তেমন বড় নহে, কিন্তু শিং দুইটি প্রকাণ্ড। লম্বে সেগুলি প্রায় ৪ ফুট এবং তাহাদের বেড়ও ২ ফুটের কাছাকাছি। এই শিং আগাগোড়াই খাঁজকাটা এবং মাথা বেড়িয়া নীচের দিকে ঘুরানো।

মেরিণো ভেড়া

স্পেন্‌দেশ ছাড়া পূর্ব্বে আর কোথাও 'মেরিণো ভেড়া' (Merino) পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন এই ভেড়া গৃহপালিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের গায়ের লোমে বহুমূল্য কাপড় প্রস্তুত হয়।

ছাগ-গোষ্ঠী

ছাগের গড়ন লম্বাটে ; পা সরু, মুখ লম্বা, লেজ ছোট, শিং চেপ্টা এবং কাণ বড় ও অল্পাধিক ঝোলা। ইহাদের শিং পিছন দিকে বাঁকানো ; কোন কোন জাতের শিং স্ক্রুর মত পেঁচানো। ছাগী আকারে ছোট। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই দাড়ি থাকে।

শীতপ্রধান দেশের ছাগের আকার খুব বড় এবং লোম খুব ঝাঁকড়া। কাশ্মীর ও তিব্বতদেশীয় ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়। এশিয়া-মাইনর ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে 'এঙ্গোরা' (Angora) নামে একজাতীয় ছাগ আছে, তাহাদের বড় বড় চিক্কণ লোমেও উত্তম শীতবস্ত্র তৈয়ার হইয়া থাকে।



এঙ্গোরা ছাগ

গৃহপালিত ছাগ ও মেষের চেহারায় অনেক প্রভেদ, কিন্তু বন্য অবস্থায় এই উভয় জন্তুর কোন কোনটাতে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত যত রকম বুনো ছাগের বিষয় জানা গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ইউরোপ ও এশিয়া-বাসী। বুনো ছাগ সর্ব্বদাই দলে দলে বিচরণ করে। তাহাদের খুরের গড়ন এরূপ যে, পাহাড়-পর্ব্বতের খুব ঢালু পিচ্ছিল স্থানেও অনায়াসে চলাফেরা, লাফালাফি করিতে পারে। এ বিষয়ে পোষা ছাগের শক্তিও কম নহে।

গৃহপালিত ছাগের মধ্যে আমাদের দেশের 'রাম ছাগল' বেশ বড় হয়। বাজীকরের শিক্ষাগুণে ইহারা নানা ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইতে পারে।

মার্খোর্



মার্খোর্

সকল রকম বন্য ছাগের মধ্যে হিমালয় প্রদেশের 'মার্খোর্' (Markhor) খুব প্রসিদ্ধ। মার্খোর উঁচুতে ৪ ফুট। ইহাদের গায়ের রং ধূসর: শিং বেশ বড় এবং পেঁচানো; দাড়ি লম্বা ও ঝাঁক্ড়া; গলায়, কাঁধে ও বুকে বড় বড় লোম জন্মে। বুকের লোম দাড়ির সহিত মিশিয়া থাকায়, মনে হয়, যেন দাড়ি বড় হইয়াই সমস্ত বুকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

আইবেক্স্

এক জাতীয় বন্য ছাগকেই, 'আইবেক্স্' (Ibex) বলে। এশিয়া ও ইউরোপের দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতে ইহাদের বাস। দেশভেদে আকারে-প্রকারে কিছু কিছু তফাৎ থাকিলেও ইহাদের সব জাতির চেহারাই প্রায় এক রকম।

হিমালয়ের আইবেক্স্ উঁচুতে প্রায় আড়াই হাত; ইহাদের শিং খুব জমকালো; উহার ডগা পিঠের দিকে বাঁকানো এবং সম্মুখের দিক্ আগাগোড়া খাঁজ কাটা। আল্পস্ পর্ব্বতের আইবেক্স আকারে কিছু ছোট।

আইবেক্সের স্বভাব খুব চঞ্চল। ইহারা ৮।১০টিতে এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া সারাদিনই ছুটাছুটি লাফালাফি করিয়া বেড়ায় এবং খাদ্যের সন্ধানে পর্ব্বতের অতি দুর্গম স্থানেও উঠিয়া থাকে। প্রত্যেক দলে একটি পুং-আইবেক্স্ প্রহরীর কার্য্য করে। বিপদের লক্ষণ দেখিলেই, সে একটা শব্দ করে, আর অমনি নিমেষের মধ্যে সমস্ত দলটা কোথায় যে ছুটিয়া পালায়, তাহার ঠিকানা নাই।

শিকারীর দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়া, ইহারা



আইবেক্স

ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠে এবং শিকারীকে এমন প্রবল বেগে আক্রমণ করে যে, শেষে তাহারই প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়িয়া যায়।

টাহ্‌র্

টাহ্‌রের (Tahr) গড়ন ছাগ ও অ্যান্টিলোপের গড়নের মাঝামাঝি। এই মাঝামাঝি গড়নের জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে ছাগ বংশের অন্তর্গত অন্য একটি জাতি (Hemitragus) বলিয়া মনে করেন। ইহারা হিমালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে—তুষার ও সমতল প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী যে উচ্চতা— সেই প্রদেশের প্রাণী।



টাহ্‌র্

আকারে ইহারা মার্খোর্ অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহাদের শিং তেমন বড় হয় না এবং দাড়িও নাই; গায়ের রং মেটে; ঘাড়, গলা, বুক, পেট এবং পায়ের সম্মুখদিক্ কালো। সকল জাতীয় ছাগীরই দুইটি করিয়া স্তন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-টাহ্‌রের স্তনের সংখ্যা ৪টি। এই জাতীয় এক শ্রেণীর ছাগ ভারতের পশ্চিমঘাটে দেখা যায়। তাহাদের 'নীলগিরির বন্য ছাগল' বলে। কিন্তু ইহাদের স্ত্রী-জাতির স্তনের সংখ্যা দুইটি।

গোরাল



গোরাল

গোরালের (Capricon) জন্মস্থান হিমালয়প্রদেশ —ভূটান হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত। চেহারা এবং স্বভাব অনেকটা ছাগলের মত বটে, কিন্তু ইহারাও ছাগল ও অ্যান্টিলোপের মা ঝা মা ঝি জন্তু। গোরাল লম্বে ৪ ফুট এবং উঁচুতে ৩০ ইঞ্চি; ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে ধূসর।

স্যাময়

ইউরোপের আল্পস্, পিরিনীস্ প্রভৃতি পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে স্যাময় (Chamois) ছাগের বাস। ইহাদের শরীরের বাঁধন বেশ দৃঢ়; গায়ের রং বাদামী, তলপেট ও মুখের রং একটু ফিকে: কাণ খাড়া, শিং হুকের মত পিছন দিকে বাঁকানো, লেজ ছোট। ইহারাও ছাগ-অ্যান্টি-লোপের মাঝামাঝি জন্তু।



স্যাময়

স্যাময় দলে দলে বাস করে। ইহাদের স্বভাব বড়ই চঞ্চল। পাহাড়ের খুব পিচ্ছিল স্থানেও ইহারা স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি, লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। স্যাময়ের দর্শন, ঘ্রাণ, ও শ্রবণ-শক্তি খুব প্রখর। কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে, চক্ষুর নিমিষে লাফাইতে লাফাইতে ইহারা পাহাড়ের চূড়া হইতে চূড়ান্তরে পালাইয়া যায়। একমাত্র 'আইবেক্স' ছাড়া অপর কোন ছাগ-জাতীয় জন্তু ইহাদের মত পর্ব্বতের উচ্চস্থানে বিচরণ করিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে আল্পস্-পিরিনীসের তুষারাবৃত স্থানে ইহারা ভ্রমণ করে। শীত আরম্ভ হইলেই নীচে

নামিতে থাকে। ইহাদের কোমল চামড়া ও মাংসের জন্য, শিকারীদের অত্যাচারে ক্রমশঃ ইহারা সংখ্যালঘু হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে এক সুইট্‌জারল্যাণ্ডের 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ছাড়া ইহারা আর কোথ্যও নাই বলিলেও চলে।

অ্যাণ্টিলোপ বা কৃষ্ণসারাদি

হরিণের কথা বলিবার আগে, দেখিতে অনেকটা হরিণের মত অথচ হরিণ নহে,—এমন একদল জন্তুর কথা বলিব। ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'অ্যাণ্টিলোপ' বলা হয়; আমাদের দেশের 'কৃষ্ণসার' প্রভৃতি এই দলভুক্ত। শিং পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়, হরিণ অপেক্ষা গরু, ছাগল, ভেড়ার সহিতই ইহাদের সম্পর্ক নিকট। সেই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে গো-বংশের মধ্যেই ধরিয়াছেন। সেই কারণেই ইহাদের এক জাতি—'নীলগাই'-এর মাংসকে অনেক হিন্দু গো-মাংসের ন্যায় মনে করেন। কিন্তু এই বংশের কৃষ্ণসার ও কুরঙ্গকে পুরাকাল হইতে শীকার ও ভক্ষণ দুইই চলিয়া আসিতেছে। ইহারা বারটি পরিবারে বিভক্ত।

গরু প্রভৃতির শিং যেমন তাহাদের মাথার হাড় হইতে স্বতন্ত্র অথচ সেই হাড়ের উপর স্থাপিত, অ্যাণ্টিলোপের শিং-ও ঠিক সেই প্রকার। কিন্তু প্রকৃত হরিণের শিং তাহাদের মাথার হাড়েরই অংশবিশেষ; সেই হাড়ই বড় হইয়া শিং-এ পরিণত হইয়াছে। তার পর, গরু প্রভৃতির ন্যায় অ্যাণ্টিলোপের শিং ফাঁপা, ডাল-পালাহীন ও বহুদিন স্থায়ী, কিন্তু হরিণের শিং নিরেট, ডাল-পালাযুক্ত ও অস্থায়ী।

এই দলের জন্তুগণের শরীরের গড়ন বেশ সুন্দর; ছাঁদ লম্বাটে, চোখ ভাসা ভাসা, পা সরু সরু, খুর ছোট ছোট। বেশীর ভাগ অ্যাণ্টিলোপের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিং হয়। জাতি হিসাবে কোনটার শিং বড়, কোনটার ছোট, কোনটার স্ক্রুর মত পাকানো, কোনটার বা বেশ মসৃণ।

আমেরিকা ব্যতীত পৃথিবীর আর সর্ব্বত্রই অ্যাণ্টিলোপ আছে। ইহাদের অধিকাংশই কিন্তু আফ্রিকা-দেশবাসী। ইহারা সর্ব্বদাই দলে দলে বিচরণ করে। দেশভ্রমণে বাহির হইবার সময়, কোন কোন দলে পনর বিশ হাজার পর্য্যন্ত অ্যাণ্টিলোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নু

আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে দুই জাতীয় 'নু' দেখা যায়। এক জাতির রং ঘোর কালো (Connochætes), কেবল লেজ সাদা; আর এক জাতি নীলাভ কালো (Gorgon Taurinus)।



এই জন্তুর চেহারা নিতান্তই অদ্ভুত; ঘোড়ার দেহে যেন মহিষের মাথা! ইহারা উঁচুতে প্রায় ৩ হাত। ইহাদের মাথা চওড়া ও চেপ্টা; ঘাড়ের উপর, সম্মুখের দুই পায়ের মাঝখানে, গলার নীচে ও লেজে খুব বড় বড় লোম জন্মে। নাক, মুখ, এবং চোখের চারিপাশের লোম বড় বড়, কিন্তু গায়ের আর আর জায়গার লোম ছোট। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শিং থাকে।

নু

খুব তাড়াতাড়ি ছুটিবার শক্তি থাকিলেও নু সহজে ছুটিতে চাহে না। হঠাৎ আক্রান্ত হইলে, ইহারা সার্কাসের ঘোড়ার মত লেজ উঁচু, মাথা নীচু আর নানা রকম মুখভঙ্গী করিয়া আক্রমণকারীর চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। সে দৃশ্য নিতান্তই অদ্ভুত ও হাস্যকর।

ইহারা দলে দলে বাস করে। এক এক দলে ২০।২৫টা হইতে কখনো কখনো ৪০।৫০টা পর্য্যন্ত নু দেখিতে পাওয়া যায়। ঘন জঙ্গল অপেক্ষা জলাশয়ের কাছাকাছি খোলা মাঠে চরিতেই ইহারা ভালবাসে।

কৃষ্ণসার

ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে কৃষ্ণসার (Black-buck) দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে 'কালসার' বলে। সংস্কৃত ভাষায় 'মৃগ' বলিতে এই প্রাণীকেই বুঝায়, 'চিতা-হরিণকে' নয়। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় কটা; কিন্তু তলপেট গলা ও চোখের চারিদিক্ সাদা। পুং-জাতি লম্বে তিন হাতের কাছাকাছি, তাহাদের শিং-ও প্রায় সওয়া হাত; স্ত্রী-জাতি এত বড় হয় না আর তাহাদের শিং-ও থাকে না। কালসারের শিং-এর গোড়ার দিক্ স্ক্রুর ন্যায় পেঁচানো। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলে দুই তিন হাজার পর্য্যন্ত কালসার দেখা যায় ইহাদের চেহারা যেমন হরিণের মত, তেমনি হরিণের ন্যায় দ্রুত দৌড়িতে এবং লাফাইতেও ইহারা পটু।



কৃষ্ণসার

বিপদের আশঙ্কা দেখিলে স্ত্রী-কালসার কৌশলে নিজের বাচ্ছাটিকে বড় বড় ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া রাখে; তার পর কিছু দূরে গিয়া শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। শত্রু তাড়া করিয়া যায়, সে-ও এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতে থাকে। এইভাবে শত্রুকে ক্রমাগত বাচ্ছার নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়া, শেষে কোন ঝোপে লুকাইয়া পড়ে। বিপদ কাটিলে, চুপি চুপি বাচ্ছার কাছে আসিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করে।

গ্যাজেল্ বা কুরঙ্গ

এশিয়া ও আফ্রিকা ২০।২১ জাতীয় কুরঙ্গের (Gazelle) জন্মস্থান। ভারতবর্ষের নানা



কুরঙ্গ

স্থানে এবং আরব প্রভৃতি দেশেও কুরঙ্গ দেখা যায়। বঙ্গদেশে কুরঙ্গ নাই, কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য ও যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা এবং পাঞ্জাবে ইহাদের (G. Bennetti) সংখ্যা খুব বেশী। ইহারা উঁচুতে প্রায় দেড় হাত। ইহাদের গায়ের রং বাদামী, কিন্তু পেট, পায়ের পিছন দিক্ ও উরু সাদা, লেজ কালো, শিং গাঁইটযুক্ত ও প্রায় এক ফুট লম্বা।

কুরঙ্গের চোখ অতি সুন্দর এবং চাহনি ও ভাব-ভঙ্গী চমৎকার। সেইজন্য ভারতবর্ষের ও পারস্য প্রভৃতি দেশের কবিগণ কুরঙ্গের চোখের সহিত সুন্দরী স্ত্রীলোকের চোখের তুলনা করিয়াছেন।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং হরিণের ন্যায় খুব দ্রুত দৌড়িতে পারে। দৌড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে উচ্চ লম্ফ দিয়া চলা ইহাদের অভ্যাস।

স্প্রিং-বাক্

আফ্রিকায় যত রকম কুরঙ্গ আছে, তাহাদের মধ্যে 'স্প্রিং-বাক্'ই (Springbuck) প্রধান। স্প্রিং-বাক্ দেখিতে প্রায় কুরঙ্গের মত, কেবল উঁচুতে আরো ৩।৪ ইঞ্চি বড় ইহাদের পিঠের দাঁড়ার উপর দিয়া লম্বালম্বি বড় বড় সাদা একটা লোমের রেখা থাকে। ইহারা ইচ্ছা করিলে সেই লোমগুলি ফুলাইয়া তুলিতে অথবা নামাইয়া রাখিতে পারে।

স্প্রিং-বাকের সংখ্যা এত বেশী যে, এক জায়গায় অনেক দিন থাকিলে ইহাদের খাদ্যের অভাব হইয়া পড়ে, সেই জন্য বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

একবার ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিকারী 'গর্ডন কামিং' স্প্রিং-বাকের দেশভ্রমণের সময় তাহাদের একটা প্রকাণ্ড দল দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "যে দিকে চাই—মাঠ, ঘাট, পাহাড়, বন,—সবই একেবারে স্প্রিং-বাকে ভরা। তাহারা গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া যাইতেছিল; দলের পর দল চলিয়াছে, ঠিক যেন নদীর স্রোতের মত স্প্রিং-বাকের স্রোত চলিয়াছে! তাহার আর শেষ নাই। আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া দেখিলাম; এই সময়ের মধ্যে যতগুলা আমাদের সম্মুখ দিয়া পার হইল, তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম হইবে না।"

শুনিয়াছি, স্প্রিং-বাকের ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে অনেক সময় সিংহ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত জন্তুও চেপ্‌টিয়া মারা পড়ে।

জেম্‌স্‌-বাক

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুপ্রদেশে 'জেম্‌স্‌-বাক'-এর (Jamesbuck) জন্মস্থান। আকারে ইহারা এক একটি বড় গাধার মত। ইহাদের শরীরের উপরিভাগের রং

ধূসর, নীচের দিক্ প্রায় সাদা ; পিঠের মাঝামাঝি দুই পাশে দুইটি কালো রেখা এবং শিরদাঁড়ার উপর একটি কালো ডোরা দেখা যায়। শিং লম্বে আড়াই হাতের কম নহে।

জেম্‌স্‌-বাক খুব সাহসী ও বলশালী। ইহাদের প্রকাণ্ড শিং ঠিক সঙ্গীনের মত ধারালো। ইহাই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে আসিলে ইহারা শিং বাগাইয়া দাঁড়ায়। ফলে যাহা হয়, ছবিখানা



জেম্‌স্‌-বাক

দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। অবশ্য অনেক সময় ইহারাও প্রাণ হারায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আক্রমণকারীকে ভাল রকম শিক্ষা না দিয়া ছাড়ে না।

কুডু

আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চল 'কুডু'র (Kudu) জন্মস্থান। ইহাদের চেহারা খুব সুন্দর এবং শিং খুব বাহারযুক্ত। পুং-কুডু উঁচুতে প্রায় ৩ হাত হইয়া থাকে। তাহাদের শিং-ও লম্বে ২½ হাতের কম নহে। স্ত্রী-জাতির শিং থাকে না।

কুহুর গায়ের রং মেটে। ইহাদের ঘাড়ে ও গলায় লম্বা লম্বা লোম জন্মে এবং পিঠ হইতে কয়েকটি সাদা সাদা ডোরা পেটের দিকে নামিয়া আসে।


কুহু

কুহু সচরাচর স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে একত্র থাকে, কখনো কখনো ৫।৬টিতে দল বাঁধিয়াও বিচরণ করে। ইহারা সাঁতার দিতে বিলক্ষণ পটু। শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে, কুহু প্রায়ই সাঁত্‌রাইয়া নদী পার হইয়া পালায়। ইহাদের লাফাইবার শক্তিও অদ্ভুত। এক লাফে ১০।১২ হাত উঁচুতে উঠা ইহাদের পক্ষে কিছুই কঠিন নহে।

বন-জঙ্গলে ছুটিবার সময়, কুহু মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া, প্রকাণ্ড শিং-এর ভার কাঁধের উপর রাখে। ইহাতে সুবিধা এই যে, ডাল-পালা ও লতায় শিং আট্‌কাইয়া তাহাদের গতিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

ইল্যাণ্ড্

এক জাতীয় অ্যান্টিলোপের মধ্যে ইল্যাণ্ড্ (Eland) আকারে বড়। আফ্রিকার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও মধ্যভাগে ইহাদের বাস। উচ্চে ইহারা প্রায় চারি হাত এবং স্থূলতায় এক একটি বড় ষাঁড়ের মত। গায়ের রং গাঢ় ধূসর।


ইল্যাণ্ড

ইল্যাণ্ডের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিং বাহির হয়। স্ত্রী জাতির শিং কিছু বেশী লম্বা। ইহাদের শিং-এর গোড়ার দিক্ পেঁচানো এবং শেষদিক্ ছুঁচ্‌ল। গরুর ন্যায় ইহাদের গলায় গল-কম্বল এবং লেজে কেশের গুচ্ছ থাকে।

ইল্যাণ্ড্ ফাঁকা মরুতেও বাস করে, গভীর জঙ্গলেও থাকে। ইহাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত জলপান না করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

চৌশিঙ্গা

ভারতবর্ষে যত রকম অ্যান্টিলোপ্ আছে, তাহাদের মধ্যে চৌশিঙ্গা (Chowsingha) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। পাঞ্জাব, নেপাল এবং মধ্যভারতের জঙ্গলে ইহাদের বাস। ইহারা লম্বে ২; হাতের বেশী নহে এবং উঁচুতে ১২ হাতেরও কম। ইহাদের গায়ের রং মেটে; পেট ও পায়ের ভিতর পিঠ্ সাদা। চারিটি করিয়া শিং বাহির হয় বলিয়া ইহাদের 'চৌশিঙ্গা' (Fourhorned Antelope) বলে। চৌশিঙ্গার পিছনের দুইটি শিং ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয়, কিন্তু সম্মুখের দুইটি দেড় ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। অধিকাংশ অ্যান্টিলোপের শিং গাঁইটযুক্ত, কিন্তু ইহাদের শিং বেশ মসৃণ।



চৌশিঙ্গা

নীলগাই

ভারতবর্ষের নানা স্থানে—বিশেষতঃ উত্তরবিহার, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের জঙ্গলে যথেষ্ট নীলগাই (Nylgao বা Blue Bull) দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্নবঙ্গ ও আসামে নীলগাই নাই। নীলগাই লম্বে প্রায় পাঁচ হাত এবং উঁচুতেও সওয়া তিন হাতের কাছাকাছি। ইহাদের পিছনের পা অপেক্ষা সম্মুখের পা কিছু বড়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ঘাড়ে বড় বড় লোম জন্মে এবং লেজেও কেশের গুচ্ছ থাকে। শিং কেবল পুং-জাতিরই দেখিতে পাওয়া যায়; লম্বে উহা ৮।৯



নীলগাই

ইঞ্চির বেশী নহে। ইহাদের গায়ের রং ধূসর, তাহার উপর নীলের আভা; ঘাড়, গলা ও লেজের লম্বা লোমগুলি প্রায় কালো।

নীলগাই ছোট ছোট পাহাড়ে এবং ঝুপী জঙ্গলপূর্ণ মাঠে চরিতে ভালবাসে; ঘন জঙ্গলে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে একত্র চরিয়া বেড়ায়; কখনো কখনো ৫।৭টিতে দলবদ্ধ হইয়াও বিচরণ করে। স্ত্রী-জাতির একবারে একটি, সময় সময় দুইটি বাচ্ছা হইয়া থাকে।

হরিণাদি

হরিণের (Deer) গড়ন-পেটন বেশ সুন্দর; দেহের ছাঁদ লম্বাটে, চোখ ভাসা ভাসা,



শিং ডালপালাযুক্ত, পা লম্বা ও সরু এবং খুর ছোট। শরীর হাল্‌কা বলিয়া ইহারা খুব তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারে। ইহারা ছোট বড় নানা জাতের হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গো-বংশীয় জন্তুদের শিং তাহাদের মাথার হাড় হইতে স্বতন্ত্র, হরিণের শিং কিন্তু সেরূপ নহে। ইহাদের মাথার হাড়ই বড় হইয়া শিং-এ পরিণত হইয়াছে। এই শিং নিরেট, অস্থায়ী এবং সাধারণতঃ ডালপালাযুক্ত। শিং দুইটি প্রতি বৎসর একবার করিয়া পড়িয়া যায়। পুরাতন শিং পড়িয়া গেলে, তাহাদের মূলদেশে চামড়া-ঢাকা ছোট ছোট দুইখানি হাড় উঁচু হইয়া থাকে। ক্রমে সেই হাড়ের উপর দুইটি গুটি জন্মে। সেই গুটি বাড়িতে বাড়িতে শেষে শিং-এর আকার ধারণ করে। শিং যতদিন নরম থাকে, ততদিন তাহাদের উপর মখমলের ন্যায় কোমল চর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা শক্ত হইয়া উঠিলে, চর্ম্ম শুকাইয়া শিথিল হইয়া পড়ে। তখন হরিণ ডালপালায় ঘসিয়া শিং-এর উপরকার ঐ চর্ম্ম একেবারে তুলিয়া ফেলে।

সচরাচর কেবল পুং-হরিণেরই শিং থাকে। কিন্তু 'বলগা' হরিণের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিং দেখা যায়। 'কস্তূরী মৃগের' আবার মোটেই শিং থাকে না। হরিণীর স্তন চারিটি।

হরিণ দলে দলে বাস করে। কতকগুলি সর্দ্দার হরিণ এই সমস্ত দলে প্রহরীর কাজ করিয়া থাকে। কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তাহারা এক প্রকার ভয়সূচক শব্দ করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। কিন্তু শত্রু একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলে, তাহারা হরিণী ও ছানাগুলিকে মাঝখানে রাখিয়া, চারিদিকে শিং বাগাইয়া দাঁড়ায় এবং প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এই উপায়ে অনেক সময় ইহারা

হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

কস্তূরী মৃগ

তিব্বত, সিকিম, কাশ্মীর প্রভৃতি হিমালয়-প্রদেশ এবং সাইবিরিয়া, মধ্য-এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম চীন কস্তূরী মৃগের (Musk Deer) বাসস্থান। আকারে ইহারা তেমন বড় হয় না—লম্বে দুই হাত এবং উঁচুতে এক হাতের কিছু বেশী। ইহাদের গায়ের রং উপর দিক্ ধূসর, নীচের দিক্ সাদা ; গড়ন-পেটন, শ্রী-ছাঁদ কিছুই তেমন সুন্দর নহে।

কস্তূরী মৃগের স্ত্রী-পুরুষ কোনটারই শিং থাকে না। পুং-জাতির উপর পাটির কুকুরে-দাঁত নীচের চোয়ালের দুই পাশে বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের নাভিদেশে



কস্তূরী মৃগ

একটি ছোট চামড়ার থলি থাকে, তাহার মধ্যে এক প্রকার উগ্রগন্ধ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া দানা বাঁধিয়া যায়। ইহারই নাম 'মৃগনাভি'। স্ত্রী-জাতির নাভিমূলে থলি থাকে না।

কস্তূরী মৃগ একেবারেই গরম সহ্য করিতে পারে না ; সেই জন্য শীতপ্রধান দেশে এবং পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে ইহারা বাস করে। ইহাদের খুরের গঠন পাহাড়-পর্ব্বতের উপর চলা-ফেরা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

রেড-ডিয়ার বা লাল হরিণ

ইউরোপের নানা স্থানে এবং এশিয়ার উত্তরাংশে লাল হরিণের (Red Deer) বাস। পূর্ব্বে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট 'লাল হরিণ' দেখিতে পাওয়া যাইত ; শিকারীদের অত্যাচারে ক্রমে ইহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া

আসিয়াছে। এখন কোন কোন দেশ একেবারে 'লাল হরিণ' শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও কোথাও বা 'রিজার্ভ ফরেষ্টে' কতকগুলি করিয়া রক্ষিত হইতেছে।

লম্বে ইহারা সাড়ে চার হাতের কম নহে এবং উঁচুতেও আড়াই হাতের কিছু বেশী। ইহাদের গায়ের রং গ্রীষ্মকালে লাল্‌চে মেটে, শীতকালে ধূসর। ছোটবেলা ইহাদের গায়ে সাদা সাদা ছিট থাকে।



রেড-ডিয়ার

'লাল হরিণ' আকারে যেমন বড়, ইহাদের শিং-ও তেমনি প্রকাণ্ড। এক একটি লম্বে ২½ হাতের কম নহে; আজকাল ১২টি চূড়াযুক্ত শিং-ই বেশী দেখা যায়, কিন্তু এক সময়ে এমন অনেক 'লাল হরিণ' দেখিতে পাওয়া যাইত, যাহাদের শিং-এর চূড়ার সংখ্যা ৫০।৬০টির কম ছিল না।

বৎসরের কয়েক মাস ইহাদের পুং-জাতি একা একা বিচরণ করিলেও বাকী সময় 'লাল হরিণ' দল বাঁধিয়া বাস করে; কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক দলে কেবল একটিমাত্র সর্দ্দার পুং-হরিণ থাকে। স্ত্রী-জাতির ইহাদের এক সংখ্যার কোন হিসাব নাই। সেই সর্দ্দারের ইঙ্গিতমত সকলকে চলিতে হয়। অনেক সময় দলের অধিকার লইয়া দুইটা জোয়ান পুং-হরিণে ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ইহাদের শিং। মারামারি করিতে করিতে কখনো কখনো শিং-এ শিং-এ এমন আটকাইয়া যায় যে, ইহারা প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাহা ছাড়াইতে পারে না। ফলে, দুইটাতেই অনাহারে শুকাইতে শুকাইতে মারা পড়ে। যদি কোন গতিকে একটা রক্ষা পায়, তবে সে-ই দলের সর্দ্দার হইয়া বসে।

এশিয়ার নানাস্থানে আরো কয়েক জাতীয় বড় বড় হরিণ আছে, আকারে তাহারাও প্রায় 'লাল হরিণেরই' মত এবং তাহাদের গায়ের রং-ও লাল্‌চে। কাশ্মীরের 'হেঙ্গুল' (Cashmere Stag) তাহাদের মধ্যে প্রধান।

কাকার

ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে একজাতীয় ছোট হরিণ দেখা যায় হিন্দীতে ইহাদিগকে 'কাকার' (Muntjac বা Rib-faced Deer) বলে। ইহাদের অস্বাভাবিক ডাকের অনুকরণে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। রংপুর ও দার্জ্জিলিং জেলায়ও ইহাদের দেখা যায়। বাংলায় ইহাদের 'মায়া হরিণ' বলে।



কাকার

কাকার উঁচুতে এক হাতের কিছু বেশী। ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে বাদামী, পিঠ্‌ অপেক্ষা পেটের রং ফিকে, শিং এ দুইটি করিয়া ডাল থাকে।

কাকার পাহাড়িয়া ঘন জঙ্গল ভালবাসে। ভারতবর্ষ হইতে ইহারা ক্রমে মালয় উপদ্বীপে ও সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মাংস খুব সুস্বাদু।

সম্বর

সম্বর (Sambar) ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র, ব্রহ্মদেশ এবং লঙ্কাদ্বীপের উঁচু নীচু পাহাড়িয়া জঙ্গলে বাস করে। আসাম, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্যাচল ও মহীশূর যথেষ্ট সম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা যে 'লাল হরিণের' কথা পড়িয়াছ, সম্বর কোন অংশে তাহাদের চাইতে ছোট নহে। ইহাদের গায়ের লোম মোটা ও কর্কশ, গলার লোম বেশ বড়। গায়ের রং ঘন মেটে, কিন্তু তলপেট ও পায়ের ভিতর পিঠ্‌ সাদা। কাছাড়ের জঙ্গলে এক জাতীয় সম্বর আছে, তাহাদের ছানার গায়ে সাদা সাদা চিত্র দেখা যায়।



সম্বর

সম্বরের শিং বেশ বড় বড়, তাহাতে তিনটিমাত্র ডাল বাহির হয়; লম্বে এক একটি শিং প্রায় আড়াই হাত। অন্যান্য

হরিণের মত ইহারা অনেকগুলাতে দল বাঁধিয়া বাস করে না; সাধারণতঃ ৩।৪টি, কখনো কখনো বা ১০।১২টি এক সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারাও রাত্রিচর; সারারাত লতা, পাতা ও ঘাস খাইয়া এবং কৃষকের ক্ষেতে চরিয়া, দিনের বেলা জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রাম করে। মলক্কা ও ফিলিপাইন-দ্বীপে এবং মালয়-উপদ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সম্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

চিতা হরিণ বা চিতেল

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ, আসামে, হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে, সুন্দরবনে এবং লঙ্কাদ্বীপে চিতেল হরিণ (Spotted Deer) দেখিতে পাওয়া যায়; লম্বে ইহারা তিন হাতের উপর, কিন্তু উঁচুতে স্থান ভেদে কোথাও দুই হাত ছাপাইয়া উঠে, কোথাও বা দেড় হাত। ইহাদের গায়ের রং লাল্‌চে, তাহার উপর সাদা সাদা ফোঁটা; সেইজন্যই ইহাদিগকে 'চিতেল হরিণ' বলে। চিতেলের মাথা ও ঘাড়ের রং ফিকে ধূসর; পা, তলপেট, গলা ও কাণের ভিতর পিঠ, প্রায় সাদা; শিং লম্বে দুই হাতের কম নহে, উহাতে তিনটি করিয়া ডাল থাকে।



চিতা হরিণ

প্রায় আর সব হরিণেরই মত, চিতেলও দলে দলে বাস করে। দিনের বেলা ইহারা ঝোপে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর চরিতে বাহির হয়। বিশ্রামের সময় ছানাগুলিকে মাঝখানে রাখিয়া বড় বড় ধাড়ী হরিণ তাহাদের চারিপাশে অবস্থিতি করে। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তখন প্রত্যেকে তাহার মুখ বাহির দিকে রাখে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক দলের কয়েকটা প্রহরীও থাকে।

এল্ক হরিণ

হরিণজাতির মধ্যে এল্কের (Elk) মত এত বড় জন্তু আর একটিও নাই। উঁচুতে এক একটা ঠিক সাধারণ ঘোড়ার মত। এশিয়া ও ইউরোপের উত্তর-ভাগ এবং উত্তর আমেরিকা ইহাদের জন্মস্থান। আমেরিকার এল্ককে 'মুজ' (Moose) বলে।

এল্কের শরীর লম্বাটে, কিন্তু ঘাড় খুব ছোট; গায়ের রং স্থান-ভেদে কোন কোন জাতের ঘন মেটে, কোন কোন জাতের একটু ফিকে, আবার কাহারো কাহারো বা পীতাভ ধূসর। ইহাদের পুং-জাতির-গলা হইতে এক একটা চর্ম্মের থলি ঝুলিয়া পড়ে। কখনো কখনো স্ত্রী-জাতির গলদেশেও থলি দেখিতে পাওয়া যায়।

এল্কের স্ত্রী-জাতির শিং থাকে না, পুং-জাতির শিং কিন্তু দেখিবার মত জিনিস; উহার গোড়ার দিক্ গোল, শেষদিক্ হাতের পাতার মত চেপ্টা এবং প্রায় এক হাত, সওয়া হাত চওড়া। ঐ চওড়া অংশের ধারে ধারে আঙ্গুলের মত কয়েকটা ডাল বাহির হয়।



এল্ক্ হরিণ

ইহাদের শিংএর আর একটা বিশেষত্ব এই—ঘোড়া, গাধা, যেমন মাথা না নাড়িয়া ইচ্ছামত শুধু কাণ নাড়িতে পারে, ইহারাও তেমনি ইচ্ছামত শুধু শিং নাড়িতে পারে; দরকার হইলে শিং তুইটি হেলাইয়া কাঁধের উপর শোওয়াইয়া রাখিতেও পারে; ইহাতে সুবিধা এই, জঙ্গলে ছুটাছুটি করিবার সময় ডাল-পালায় শিং আটকাইয়া ইহাদের গতিরোধ হইবার ভয় থাকে না।

ঘাড় ছোট বলিয়া এল্ক্ মুখ নামাইয়া মাঠের ছোট ছোট ঘাস খাইতে পারে না, বড় বড় ঘাসের ডগা এবং গাছের কচি কচি পাতা খাইয়াই জীবনধারণ করে।

পূর্ব্বে সুইডেন্‌বাসীরা বল্গার ন্যায় এল্কের দ্বারা তাহাদের চাকাহীন গাড়ী টানাইত, কিন্তু রাজবিধি অনুসারে তাহা এখন রহিত হইয়াছে।

বল্‌গা হরিণ

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার উত্তরভাগে অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী হিমপ্রধান-দেশসমূহে বল্‌গা হরিণের (Reindeer) বাস।

দেশ-ভেদে ইহারা ছোট, বড়, মাঝারি—নানা রকমের হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার বল্‌গা হরিণ খুব বড় বড় হয়। ইহাদের 'ক্যারিবু' (Caribou) বলে। উঁচুতে এক এক একটা প্রায় তিন হাত। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর ; মুখ, ঘাড় ও গলা সাদাটে, পা মেটে।

সাধারণ হরিণ হইতে কোন কোন বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ দেখা যায়। হরিণ মাত্রেই প্রায় ছিপ্‌ছিপে হালকা ধরণের হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের গড়ন-পেটন বেশ মোটা-সোটা এবং শরীরের বাঁধুনি বেশ দৃঢ়। তার পর, অন্যান্য হরিণের কেবল পুং-জাতিরই শিং থাকে, কিন্তু ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিং বাহির হয়। বল্‌গা হরিণের এক একটি শিং লম্বে প্রায় ৫ ফুট।



বল্‌গা হরিণ

এই হরিণ ছাড়া সাইবিরিয়া, নরওয়ে, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশের লোকদের সংসার চলাই কঠিন। আমরা গরু ও ঘোড়া পুষিয়া যে সকল কাজ পাই, সেখানকার লোকে, বল্‌গা হরিণের দ্বারা সেই সব কাজ করাইয়া থাকে। তাহাদের বোঝা বহা, হাল চষা, গাড়ী-টানা—এ সব কাজই বল্‌গা হরিণকেই করিতে হয়। তাহা ছাড়া তাহারা এই হরিণের দুধ ও মাংস খায়, চর্ব্বি জ্বালায় এবং চর্ম্মে পোষাক প্রস্তুত করে।

উষ্ট্রাদি

উট (Camel) দুই জাতিতে বিভক্ত। এক জাতি বেশ বড়, তাহাদের পিঠে একটি কুঁজ (Camelus Dromedarius), আর এক জাতি ছোট (C. Bactrianus), তাহাদের পিঠে দুইটি কুঁজ। বড় জাতীয় উট আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা স্থানে, বিশেষতঃ আরব, পারস্য ও মিসর দেশে এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু, পাঞ্জাব ও



দুই-কুঁজ-বিশিষ্ট উট

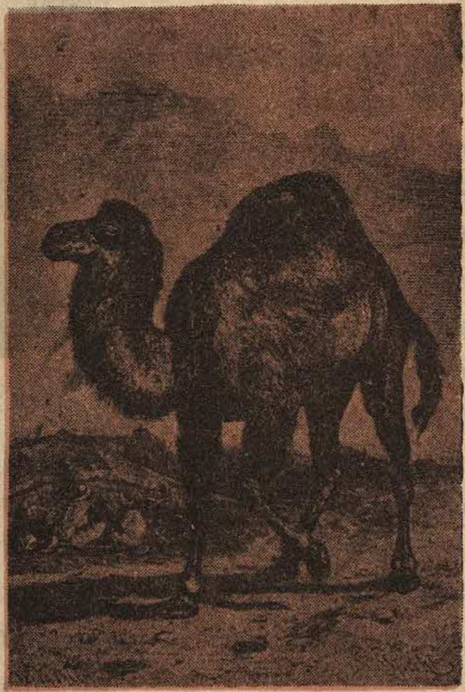
রাজপুতানায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া, ইটালী, স্পেন্ এবং উত্তর-আমেরিকাতেও ইহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে 'আর্‌বী উট' (Arabian Camel) বলে। 'আর্‌বী উট' উঁচুতে প্রায় ৫ হাত। ছোট জাতীয় উট আফগানিস্থান হইতে চীনের পূর্ব্ব এবং সাইবিরিয়ার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত—মধ্য এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে 'তিব্বতী উট' (Bactrian Camel) বলে।

উটের দাঁতের সংখ্যা ৩৪। সাধারণতঃ রোমন্থক জন্তুদের উপর মাঢ়ীতে শ্ব-দন্ত ও ছেদন-দন্ত থাকে না, উটের কিন্তু উপরের মাঢ়ীতে সম্মুখদিকে ৬টা ছোট ছোট ছেদন-দন্ত আছে। ইহাদের পাকস্থলীও অন্যান্য রোমন্থকদের মত চারি কোটর-বিশিষ্ট নহে—তিনটি মাত্র কোটরে বিভক্ত। উটের খুরও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। রোমন্থক দলের আর সব জন্তুর খুর শক্ত ও ছোট, উটের খুর নরম ও চওড়া; উহার পশ্চাদ্দিকে শৃঙ্গীয় আবরণযুক্ত মাংসপিণ্ড থাকে। তাই চলিবার সময় শরীরের চাপে ইহাদের খুর আরো বেশী চওড়া হইয়া পড়ে। আর একটি বিষয়েও উটের বিশেষত্ব আছে। জানু পাতিয়া বোঝা লইতে হইলে, অথবা মাটিতে শুইতে হইলে, যে যে অঙ্গের উপর চাপ পড়ে, উটের সেই সেই অঙ্গে কড়া লোমহীন শক্ত চামড়া দেখা যায়।

উট দেখিতে কদাকার। প্রকাণ্ড শরীর, লম্বা পা, ছোট মাথা, পিঠের উপর কুঁজের বোঝা—কুৎসিত যত দূর হইতে হয়। ইহাদের গায়ের লোমও সকল স্থানে সমান নহে। কোথাও ছোট ও ঘন, কোথাও বা বড় ও পাত্‌লা। সাধারণতঃ ছোট জাতীয় উটের গায়েই বড় বড় লোম জন্মিয়া থাকে।

উট বড় কষ্টসহিষ্ণু। আরব, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে ও আমাদের রাজপুতানায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে। মরুভূমি যে কি ভয়ানক স্থান, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। হাজার, দু'হাজার, দশ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এক একটা বালির মাঠ! দিনের বেলা রৌদ্রের তাপে সেই সকল মাঠ একেবারে আগুন হইয়া উঠে এবং সারাদিনই সেই আগুনের ঝড় বহিতে থাকে। কোথাও একটু ছায়া নাই, একবিন্দু জল নাই! সেই সকল সর্ব্বনেশে মাঠে

যাতায়াত করিতে উটই মানুষের একমাত্র বাহন। উটের পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কোটর আছে, তাই অমন আগুনের মত স্থানেও ৮।১০ দিন জল না পাইলেও ইহাদের কোন কষ্ট হয় না। উট ইচ্ছামত নাকের ছিদ্র বন্ধ করিতে পারে বলিয়া, ঝড়ের সময়েও এক কণা বালি নাকের মধ্যে ঢুকিতে পায় না।



এক কুঁজ-বিশিষ্ট উট

উটের পায়ের খুর এমন ভাবে গঠিত যে, চলিবার সময় শরীরের চাপে উহা আরো বেশী চেপ্টা ও চওড়া হইয়া পড়ে, তাই বালির মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে না।

পিঠে ২০।২৫ মণ বোঝা লইয়া ক্রমাগত পনর কুড়ি দিন চলিয়া এই সকল ভয়ানক মরুভূমি পার হয়, উট ছাড়া এমন আর কোন প্রাণী-ই নাই। এই জন্য উটের আর এক নাম 'মরুভূমির জাহাজ'!

উটের ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। মরুভূমি পার হইবার পূর্ব্বে সঞ্চিত জল ফুরাইয়া গেলে, কোথায় জল আছে, ইহারা বহু দূর হইতেও ঘ্রাণের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে এবং দৌড়িয়া সেখানে গিয়া আরোহীরও প্রাণ বাঁচায়, নিজেও বাঁচিয়া যায়। উটের কুঁজ মেদ বা চর্ব্বিতে ভরা। খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে ঐ চর্ব্বি দ্বারাই ইহাদের শরীর পুষ্ট হইতে থাকে।

ইহারা বেশ স্থির ও শান্ত, তবে একবার গোঁ ধরিলে আর রক্ষা নাই। অনেক সময় অকারণে ইহাদের স্বভাব বিগ্‌ড়াইয়া যাইতে দেখা যায়।

গাছের ডাল-পালা ও পাতা উটের প্রধান খাদ্য। ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলে কাঁটাগাছের পাতাও খাইয়া থাকে ; খেজুর ইহাদের বড়ই প্রিয়।

আফ্রিকা ও আরব দেশের লোকে ইহাদের দুগ্ধ পান করে, মাংস আহার করে এবং লোমে বস্ত্র ও চর্ম্মে জুতা তৈয়ারি করিয়া থাকে।

লামা



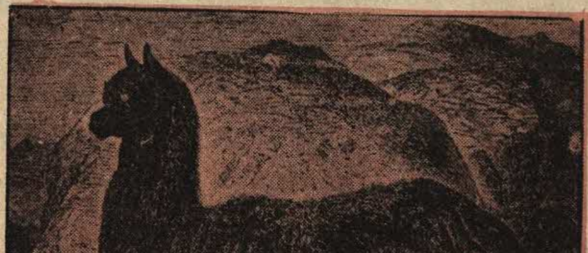
লামা

দক্ষিণ-আমেরিকায় উট-বংশের কয়েক প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের মধ্যে 'লামা' (Llama) খুব প্রসিদ্ধ। ইহাদের চেহারা কতকটা উটেরই মত এবং স্বভাব-প্রকৃতিও প্রায় সেইরূপ।

লামার মুখ ও কাণ ছুঁচ্‌ল, পা ছোট ও সরু, লেজ খুব ছোট; গায়ে বেশ বড় বড় লোম জন্মে; তাহাতে মোটা শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের পিঠে কুঁজ নাই, কিন্তু উটের ন্যায় গায়ে ও পায়ে কড়া এবং পাকস্থলীতে জল সঞ্চয়ের কোটর আছে। উট অপেক্ষা ইহাদের দাঁতের সংখ্যা ২টি কম।

লামার একটা কু-অভ্যাস এই যে, কেহ খোঁচা মারিলে অথবা অন্য কোন রকমে বিরক্ত করিলে, ইহারা ক্রমাগত থুথু নিক্ষেপ করিতে থাকে। কখনো কখনো সম্মুখের পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়াও অত্যাচারীর অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

আল্‌পাকা



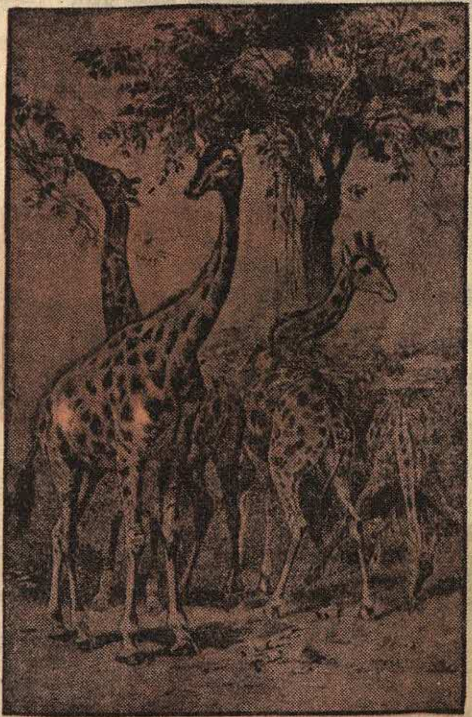
আল্‌পাকা

লামা ও আল্‌পাকা (Alpaca) ভিন্ন জাতীয় জন্তু নহে; এক রকম লামাকেই আল্‌পাকা বলে। দক্ষিণ- আমেরিকার পেরু প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। আল্‌পাকার গায়ে বড় ও ছোট—দুই রকম লোম জন্মিয়া থাকে। বড় লোমগুলি মোটা ও কর্কশ, ছোটগুলি সরু ও নরম। এই ছোট লোমে সূতা অথবা রেশম মিশাইয়া 'আল্‌পাকা' নামে সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করা হয়।

জিরাফ

জিরাফ (Giraffe) দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ; ইহারা উঁচুতে প্রায় উনিশ ফুট। ঘাড় উঁচু করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, মনে হয়, এক একটি তালগাছ ! পৃথিবীর আর কোন জানোয়ার এত উঁচু হয় না।

জিরাফের গায়ের রং হল্‌দে, তাহার উপর মেটে মেটে ছাপ, অনেকটা গুলবাঘের ছাপের মত। দেখিলেই উট আর গুলবাঘের কথা মনে হয়। ইহাদের পিছনের পা অপেক্ষা সম্মুখের পা অনেক বড়, তাই কাঁধ হইতে লেজের দিক্ ক্রমশঃ নীচু দেখায়। ঘাড় খুব বেশী লম্বা, কিন্তু অন্যান্য রোমন্থক জন্তুর মত ইহারা মাথা নামাইয়া ঘাস, খড় প্রভৃতি খাইতে পারে না ; কেবল গাছের উঁচু ডাল হইতে কচি কচি ডাল-পালা ও পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। জল খাইবার দরকার হইলে, জিরাফ সম্মুখের দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায় অথবা জানু পাতিয়া বসে। এইরূপ অবস্থায় ইহাদের ঘাড় কতক নীচু হয় ; কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকিতে পারে না।



জিরাফ

জিরাফের মাথায় ছোট ছোট দুইটি শিং বাহির হয় ; কপালের মাঝখানের হাড় একটু উঁচু হইয়াও আর একটি খুব ছোট শিং-এর মত দেখায়। এই তিনটি শিং-ই চামড়া দিয়া ঢাকা এবং উহাদের মাথায় এক এক গোছা লোম থাকে। জিরাফের চোখ খুব বড় বড় এবং তাহা চক্ষু-কোটর হইতে অনেকখানি বাহির হইয়া থাকে। সেইজন্য ঘাড় না ফিরাইয়াও ইহারা সকল দিকের বস্তু দেখিতে পায়। ইহাদের জিভের কার্য্যও খুব আশ্চর্য্যজনক। জিরাফ ইচ্ছা করিলে তাহা বাড়াইতে, কমাইতে, সরু বা চওড়া করিতে পারে। জিরাফের নাসারন্ধ্র

দীর্ঘ। প্রয়োজন হইলে ইহারা তাহা বন্ধ করিয়া রাখে। ইহাদের ঘাড়ে ঘন, মোটা ও খাড়া লোম জন্মে। লেজ বেশ বড়; তাহার শেষদিকে কেশের গুচ্ছ থাকে। জিরাফের পিছনের পায়ে ভয়ানক জোর। সময় সময় ইহাদের লাথির চোটে সিংহ, চিতা প্রভৃতিও লেজ গুটাইয়া পলায়ন করে।

জিরাফ খুব তাড়াতাড়ি দৌড়িতে পারে। দৌড়িবার সময় ইহারা ব্যাঙের মত লাফাইতে লাফাইতে অগ্রসর হয়। উঁচু নীচু পাহাড়িয়া জায়গায় ইহাদের ছুটিবার উৎসাহ খুব বাড়িয়া উঠে। সে সময় ইহাদের কাছে দ্রুতগামী ঘোড়াকেও অনেক সময় হার মানিতে হয়।

জিরাফ দলে দলে বাস করে। প্রত্যেক দলে ছোট বড় নানা আকারের জিরাফ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-জিরাফের একবারে একটি করিয়া ছানা হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার তিন দিন পরে ছানাগুলি মায়ের আশে পাশে ছুটিয়া বেড়ায়।

অদন্তবর্গ



ইহাদের কাহারো মুখের সম্মুখ দিকে একটিও দাঁত নাই; সেইজন্য ইহাদিগকে "অদন্ত" বলে। পিপীলিকাভুক্ একেবারেই দন্তহীন, কিন্তু শ্লথ ও আর্ম্মাডিলোর চর্ব্বণ-দন্ত আছে। স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে ইহারা অতি নিম্ন শ্রেণীর জানোয়ার। ইহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ খুবই অল্প।

শ্লথ


শ্লথ

তোমরা এরূপ কোন জন্তুর কল্পনা করিতে পার কি, যে সারা জীবন পা উঁচু ও মাথা নীচু করিয়া রাত-দিন গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়া বেড়ায়? ক্ষুধা পাইলে এই অবস্থায় খায়. বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে এই অবস্থায় বিশ্রাম করে এবং ঘুম পাইলে এই অবস্থায় ঘুমায়? কল্পনা করা কঠিন বটে, কিন্তু সত্য সত্যই দক্ষিণ-আমেরিকায়

কিন্তু সত্য সত্যই দক্ষিণ-আমেরিকায় এইরূপ অদ্ভুত এক রকম জন্তু আছে। তাহাদের নাম 'শ্লথ' (Sloth)।

শ্লথের ছেদন ও শ্ব-দন্ত নাই. কিন্তু উপর মাঢ়ীর দুই কসে ১০টি ও নীচের মাঢ়ীর দুই কসে ৮টি করিয়া চর্ব্বণ-দন্ত আছে। ইহাদের নখগুলি খুব বড় ও হুকের মত বাঁকানো। জাতিভেদে কোন কোনটার পায়ে ৩টি নখ, কোন কোনটার বা দুইটি। সেই নখ ডালে আট্কাইয়া ইহারা স্বচ্ছন্দে গাছে গাছে ঝুলিয়া বেড়ায় এবং ফুল, পাতা ও কুঁড়ি খাইয়া জীবনধারণ করে। এক গাছের পল্লবাদি শেষ হইলে আহারের চেষ্টায় দুলিতে দুলিতে অপর গাছে চলিয়া যায়। জলের অভাব ইহারা শিশিরের দ্বারাই মিটাইয়া থাকে। শ্লথের পায়ের গড়ন এরূপ যে কিছুতেই ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে না। জল হইতে উঠাইয়া মাঠে ছাড়িয়া দিলে কৈ মাছের যে দুর্দ্দশা হয়, ভূমিতে শ্লথের দশাও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। নখের দ্বারা মাটি আঁচ্ড়াইয়া অতি কষ্টে একটু আধটু চলিতে পারে মাত্র।

এক জাতীয় শ্লথকে দক্ষিণ-আমেরিকার লোকে 'আই-আই' বলে। উহাদের মাংস খাইতে তাহারা খুব ভালবাসে।

পিপীলিকাভুক্

পিপীলিকাভুক্ (Ant-eater) দুই জাতীয়। এক জাতি দক্ষিণ-আমেরিকাবাসী ; অপর জাতীর জন্মস্থান সিংহল ও ভারতবর্ষ। আমেরিকার পিপীলিকাভুক্ (Vermilingua) লম্বে প্রায় ৪½ হাত। ইহাদের মাথা লম্বাটে ও মুখ খুব ছুঁচ্‌ল ; পিঠে ও ঘাড়ে বড় বড় লোম জন্মে ; শরীরের দুই পাশের লোমও লম্বা এবং লেজ খুব ঝাঁক্ড়া ; গায়ের রং কটা, কেবল গলা, বুক, তলপেট এবং লেজের ভিতর-পিঠ্ কালো ও কটায় মিশানো।

ইহাদের প্রত্যেক পায়ে ৫টি করিয়া আঙ্গুল থাকে। সম্মুখের পায়ের চারিটা আঙ্গুলের নখ বড় বড় ও বাঁকানো ; পঞ্চম আঙ্গুলটি ছোট ও প্রায় নখহীন। পিছনের পায়ের নখগুলি তেমন বড় নহে। পিপীলিকাভুক্ একেবারে দন্তহীন।

পিঁপ্ড়া, উই ও তাহাদের ডিম খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে ইহাদের জিভ খুব লম্বা ও সরু—দেখিতে অনেকটা কেঁচোর মত। তাহার উপর আঠাযুক্ত লালা থাকে। পিঁপ্ড়া প্রভৃতির গায়ে সেই জিভ লাগাইয়া ইহারা মুখের ভিতর টানিয়া লয়। সহজে খাদ্য-দ্রব্য না জুটিলে, বড় বড় নখের দ্বারা পিঁপড়া, উই প্রভৃতির বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং একদিক্ হইতে ধাড়ী, বাচ্ছা ও ডিম—যতগুলা পায়, জিভে আট্কাইয়া উদরসাৎ করে।

নিদ্রা অথবা বিশ্রামের সময় ইহারা মাথা হেলাইয়া বুকের বড় বড় লোমের,



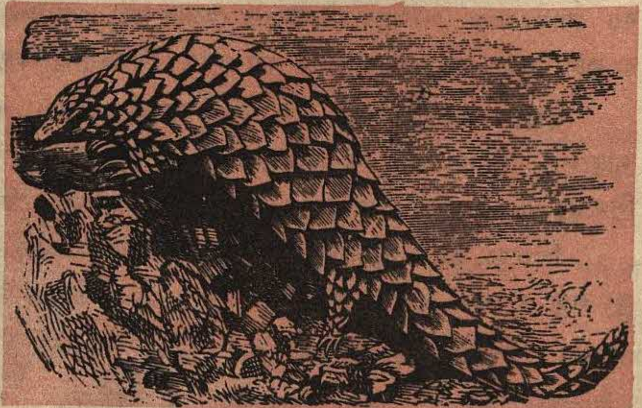
পিপীলিকাভুক্

মধ্যে রাখে এবং ঝাঁক্ড়া লেজ পিঠের উপর তুলিয়া ধরে। তখন দূর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে শুক্না ঘাসের আটি বলিয়া ভ্রম হয়। পিপীলিকাভুক্ রাত্রিচর; সারারাত আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের স্ত্রী-জাতির একবারে একটির বেশী ছানা হয় না।

বনরুই

দাক্ষিণাত্য, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা নিম্নবঙ্গের রংপুর প্রভৃতি অঞ্চল এবং সিংহল অপর এক জাতীয় পিপীলিকাভুকের জন্মস্থান; ইহাদের সমস্ত শরীর রুই মাছের মত বড় বড় শল্ক বা আঁইসে ঢাকা। সেই জন্য ইহাদিগকে 'বনরুই বলে; স্থানবিশেষে 'বজ্র-কীট (Pangolin) নামও চলিত আছে। সিকিম, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও জাভায় আকারে ছোট দুই জাতীয় বনরুই-ও দেখা যায়।

বনরুই (M. Pentadactyla) মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। লম্বে ইহারা লেজশুদ্ধ ২¾ হাতের বেশী হয় না। আমেরিকার পিপীলিকাভুকের ন্যায় ইহাদেরও মুখ ছুঁচল, জিভ্ লম্বা এবং পায়ের নখ বড়। আঠা-যুক্ত জিভ্ বাড়াইয়া পিঁপড়া, উই প্রভৃতি ধরিতে ইহারাও বেশ পটু।



বনরুই

ইহারা খুব নিরীহ জন্তু; ভয় পাইলে, মাথা তলপেটের নীচে লুকায় এবং তাহার উপর দিয়া লেজ ঘুরাইয়া, পিঠের সহিত চাপিয়া ধরে। সেই অবস্থায় ইহাদিগকে ঠিক এক একটি বলের

মত দেখায়। কাঁটাগুলি তখন সর্ব্বাঙ্গে খাড়া হইয়া উঠে। এই কাঁটা-ই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। আঘাত লাগিবার ভয়ে কোন হিংস্র জন্তুই ইহাদের নিকটে যাইতে সাহস করে না।

কোন কোন ঔষধে বনরুই-এর কাঁটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্ম্মাডিলো বা বর্ম্মধারী

'আর্ম্মাডিলো' (Armadillo) দক্ষিণ-আমেরিকাবাসী। ইহাদের মাথা, ঘাড় ও পিছনের দিকে বর্ম্মের ন্যায় তিনখানা শক্ত আবরণ থাকে ; পিঠেও তিনখানা আবরণ দেখা যায়। কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে ইহারা তাল-গোল পাকাইয়া গোলার আকার ধারণ করে। তখন এই শক্ত আবরণগুলি খুব কাছাকাছি হইয়া শরীরের সমুদয় নরম অংশ একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। কাজেই কেহ সহজে ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।



আর্ম্মাডিলো

ইহারা ৩।৪ জাতিতে বিভক্ত। বড় জাতীয় বর্ম্মধারী লম্বে প্রায় দুই হাত, কিন্তু ছোট জাতি লম্বে আধ হাতেরও কম। ইহাদের পায়ের নখ খুব বড় ও ধারালো। এই নখ দিয়া মাটি খুঁড়িয়া ইহারা পিঁপড়া ও ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খায়। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার পচা মাংসেই ইহাদের রুচি দেখা যায়। গলিত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে ইহারা কাক, শকুনের চাইতে কোন অংশে কম নহে।

দ্বিগর্ভবর্গ

পূর্ব্বে যে সকল স্তন্যপায়ী জন্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের ছানা প্রায়ই একটু বড়-সড় হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এখন এমন কয়েকটা জন্তুর কথা বলিব, যাহাদের ছানা অতি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডের মত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। সে এমন অসহায় অবস্থা যে, মাতৃগর্ভের মত অন্য নিরাপদ আশ্রয় ভিন্ন তখন তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। সেই জন্য এই বর্গের জন্তুদের স্ত্রীজাতির তলপেটে চর্ম্মের এক একটা থলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই থলির মধ্যেই মায়ের স্তনের বোঁটা থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইহারা ছানাগুলিকে সেই থলির মধ্যে রাখিয়া দেয়। ছানাগুলি সেখানে থাকিয়া মায়ের দুধ খাইতে খাইতে ক্রমে বড় হইয়া উঠে। এই চর্ম্মের থলিটি দ্বিতীয় একটি গর্ভের মত। সেইজন্য এই বর্গের জন্তুদিগকে 'দ্বিগর্ভ' বলা হইয়া থাকে।

ক্যাঙ্গারু

দ্বিগর্ভ জন্তুগণের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর (Kangaroo) স্থান সকলের উপরে। ইহাদের তলপেটের থলি এত বড় যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় ছানাও তাহার মধ্যে সহজে আশ্রয় লইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি দ্বীপ ক্যাঙ্গারুর জন্মস্থান। ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাতের (Macropus) ক্যাঙ্গারু উঁচুতে প্রায় ৩½ হাত কিন্তু ছোট জাতীয়েরা এক একটি খরগোসের মত (Hypsiprymnodon)। মাঝারি এক জাতীয় আছে, তাহাদের 'ওয়ালাবী' (Wallaby) বলে। জাতি-হিসাবে ইহাদের গায়ের রং কালো, কটা, ধূসর প্রভৃতি নানা রকমের হইয়া থাকে।



ক্যাঙ্গারু

ক্যাঙ্গারুর চেহারা অতি অদ্ভুত। ইহাদের বুক, পিঠ, সম্মুখের পা, ঘাড় এবং মাথা ক্রমশঃ সরু ও ছোট, কিন্তু পিছনের পা ও লেজ যেমন মোটা তেমনি লম্বা। ক্যাঙ্গারুর এই দুই অঙ্গে ভয়ানক জোর। ইহারা পিছনের দুই পায়ে ও লেজে ভর দিয়া যখন বসে, তখন মনে হয়, ঠিক যেন তে-পায়ায় বসিয়া আছে। পাগুলি সমান না হওয়ায় ইহারা চারি পায়ে চলিতে কষ্টবোধ করে; কেবল পিছনের পায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া চলাই ইহাদের স্বভাব।

ক্যাঙ্গারুর উপর মাঢ়ীতে তিন জোড়া ও নীচের মাঢ়ীতে এক জোড়া ছেদন দন্ত এবং উপর ও নীচের প্রতি কসে ৫টি করিয়া মোট ২০টি চর্ব্বণ-দন্ত থাকে। ঘাস, খড় প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। সেই জন্য গরুর ন্যায় ইহাদিগকে মাঠে মাঠে চরিতে দেখা যায়। কেবল এক জাতীয় ক্যাঙ্গারু গাছে চড়িয়া কচি কচি পাতা খাইয়া থাকে।

ইহাদের সম্মুখের পায়ে ৫টি এবং পিছনের পায়ে ৪টি করিয়া নখ-যুক্ত আঙ্গুল থাকে


ক্যাঙ্গারু-শিশুর স্তন্যপান

পিছনের পায়ের তৃতীয় আঙ্গুলটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়: তাহার নখ যেমন শক্ত, তেমনি ধারালো।

২৯ দিন মাত্র মাতৃগর্ভে থাকিয়া ক্যাঙ্গারুর ছানা ভূমিষ্ঠ হয়। তখন সেটি দেখিতে ঠিক এক টুক্‌রা মাংসের মত— লম্বে ১ ইঞ্চির বেশী নয়। মাতা সেই অসহায় ছানাটিকে আপন পেটের থলির মধ্যে রাখিয়া পালন করিতে থাকে। মায়ের দুধ খাইতে খাইতে ছানাটি বড় হইয়া উঠিলে, ক্রমে বাহিরে আসিয়া চরিতে আরম্ভ করে। ভয় পাইলে অপেক্ষাকৃত বড় বড় ছানাগুলিকেও মায়ের থলির মধ্যে আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে। একবারে ইহাদের একটিমাত্র ছানা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় ক্যাঙ্গারুর পেটে থলি নাই। তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় লোম আছে। ছোট ছানা সেই লোমের মধ্যে থাকিয়াই লালিত-পালিত হয়।

ক্যাঙ্গারু খুব নিরীহ জন্তু। সহজে কাহাকেও কিছু বলে না, কিন্তু আক্রান্ত হইলে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে সম্মুখের দুই পা দিয়া শত্রুকে জড়াইয়া ধরিয়া পিছনের পায়ের বড় বড় নখ-দ্বারা এমন জোরে পেটে খোঁচ মারে যে, তাহার নাড়ী-ভূঁড়ি বাহির হইয়া যায় বেগতিক দেখিলে, ইহারা জলে নামিয়া দাঁড়ায়। যদি সেখানেও কোন শত্রু তাড়া করিয়া আসে, তবে তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে ছাড়ে না।



কোয়ালা

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ কোয়ালার (Koala) জন্মস্থান। ইহাদের চেহারা অনেকটা ভালুকের মত। শরীর তেমনি মোটা-সোটা, মাথা তেমনি প্রকাণ্ড, গায়ের লোম তেমনি ঘন এবং পায়ের নখ তেমনি বড় ও ধারালো। ভালুকের মত ইহারাও কতকটা পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া চলে। ইহাদের লেজ নাই; ইহারা লম্বায় প্রায় দুই হাত।



কোয়ালা

পেটের একটি থলি ভিন্ন, খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য কোয়ালার মুখের দুই কসেও দুইটি থলি থাকে। ইহারা মাটিতে ভাল রকম চলিতে পারে না; তাড়া দিলে, ছুটিয়া

গাঁছের উপর উঠে। ডালে ডালে এমন সহজভাবে চলাফেরা করে যে, দেখিলেই মনে হয়, সারাজীবন গাছে বাস করিবার জন্যই ইহাদের সৃষ্টি।

ইহাদের একবারে একটিমাত্র ছানা হয়। ছানাটি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ের কাঁধে চড়িয়া বেড়ায়।

ইহাদের চর্ম্ম খুব কোমল এবং মাংসও সুস্বাদু। অতি সহজেই ইহারা পোষ মানে।

অপোসম্

সাধারণতঃ দ্বিগর্ভ জন্তু মাত্রেই অষ্ট্রেলিয়াবাসী। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে এই বর্গের (Opossum) কোন জন্তু নাই। কেবল অপোসমের কয়েক জাতি আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় ২৩।২৪ জাতিতে বিভক্ত। আকারে কোন কোনটা ইদুরের মত, কোন কোনটা বিড়ালের মত (Didelphys Virginiana), কোন কোনটা বা লম্বে প্রায় দুই হাত। অপোসমের উপর মাঢ়ীতে ১০টি এবং নীচের মাঢ়ীতে ৬টি ছেদন-দন্ত থাকে। ইহাদের লেজ খুব লম্বা; পিছনের পা ও লেজের দ্বারা ইহারা আমেরিকার বানরের ন্যায় গাছের ডাল-পালা ও জিনিষ-পত্র ধরিতে পারে।

অপোসমের তলপেটেও থলি আছে, কিন্তু সকল জাতীয় অপোসমের থলি সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত নহে। ইহাদের এক একবারে ৬টা হইতে ১৬টা পর্য্যন্ত খুব ছোট ছোট বাচ্ছা হইয়া থাকে। যাহাদের পেটে থলি আছে, তাহাদের ছানা ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেই থলির মধ্যে থাকিয়াই লালিত-পালিত হয়; বেশ বড় সড় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বাহিরে আসে না। যাহাদের ভাল রকম থলি নাই, তাহারা ছানাগুলিকে আপন আপন পেটের শিথিল চর্ম্মের ভাঁজে ভাঁজে রাখিয়া পালন করে। দুধ খাইতে খাইতে একটু বড় হইলেই, ছানাগুলি মায়ের পিঠে চড়িয়া বেড়ায়। পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে মায়ের লেজের সহিত তাহারা আপন আপন লেজ জড়াইয়া রাখে। হঠাৎ বিপদে পড়িলে, অপোসম্ ঠিক শিয়ালের মত মরার ভাণ করিয়া আক্রমণকারীকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। ইহারা খুব মাংসাশী; পাখী ইঁদুর, ব্যাঙ, নানাজাতীয় কীট-পতঙ্গ, কাঁকড়া,



অপোসম

চিংড়ি ও মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য। অপোসম্ সময় সময় ফলও খায়।

উড়ো অপোসম্

উড়ো অপোসম্‌ও (Flying Opossum) অষ্ট্রেলিয়ার জন্তু। লেজ বাদে লম্বে ইহারা এক ফুটের বেশী হয় না। মাটিতে ইহাদিগকে কচিত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদা ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ানো এবং গাছের ফল, ফুল ও কুঁড়ি খাইয়া দিন কাটানো ইহাদের স্বভাব। তাড়া দিলে লাফ দিয়া শূন্যে উঠিয়া উড়িতে উড়িতে ইহারা বহু দূরে চলিয়া যায়।

ডিম্ব-প্রসবকারীবর্গ

এই বর্গের জন্তু সমস্ত জন্তুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন বর্গীয়। ইহারা সকলেই ডিম পাড়ে। ইহারা আজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এই বর্গে মাত্র দুই জাতীয় প্রাণীকে দেখা যায়। এক প্লাটিপাস, অপর জাতি নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতীয় পিপীলিকাভূক, ইহার নাম 'একিড্‌না' (Echidna)। একিড্‌না কাঁটাচুয়ার ন্যায় দেখিতে। বালি এবং পাথরের খোঁদলে বাস করে।

হংস-ছুছুন্দরী

ক্যাঙ্গারু, অপোসম্, কোয়ালা প্রভৃতি জন্তু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে খুবই নিম্নশ্রেণীভুক্ত; কিন্তু 'হংস-ছুছুন্দরী' সকলের নীচে। ইহারাও অষ্ট্রেলিয়াবাসী। ইহাদের ইংরাজি নাম 'প্লাটিপাস' (Platypus)। ইহাদের শরীরের গড়ন অদ্ভুত রকমের। কঙ্কাল কতকটা সরীসৃপের মত হইলেও, মোটামুটি ইহাদিগকে ছুঁচার মত দেখায়। কিন্তু ইহাদের আঙ্গুলগুলি হাঁসের মত চামড়া দিয়া জোড়া এবং ঠোঁটও ঠিক হাঁসের ঠোঁটের মত লম্বা ও চেপ্টা। এই উভয় প্রাণীর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয় ইহাদের নাম হইয়াছে 'হংস-ছুছুন্দরী'।



হংস-ছুছুন্দরী

সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী মাত্রেই শাবক প্রসব করে এবং সেই সকল শাবক মাতৃগর্ভ হইতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রাণীতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহারা স্তন্যপায়ী হইলেও, শাবক

প্রসব না করিয়া পাখীদের মত ডিম পাড়ে এবং সেই ডিমে তা' দিয়া বাচ্চা ফুটায়। তার পর স্তন্যপায়ীদের মত স্তনের দুধ খাওয়াইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকে।

হংস-ছুচুন্দরী জলের ধারে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে। পায়ের আঙ্গুল জোড়া বলিয়া ইহারা হাঁসের মত স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিতে পারে। কাঁকড়া, চিংড়ি ও নানা প্রকার জলজ কীট ইহাদের খাদ্য। ইহারা রাত্রিচর।

পশু-পক্ষী

পক্ষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পক্ষী মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণিগণের দ্বিতীয় শাখার অন্তর্গত। পশুদের প্রায় সকলেরই শরীরে লোম আছে. পাখীদের কিন্তু লোম নাই লোমের পরিবর্তে ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পাখীর পালক তিন রকমের হইয়া থাকে। ইহাদের ডানা ও পুচ্ছে যে সকল বড় বড় পালক দেখা যায় সগুলিকে ইংরাজিতে 'কুইল' এবং বাঙ্গলায় 'বীরের' পালক বলে; আর অন্যান্য অঙ্গে পশমের মত যে সকল ছোট ছোট কোমল পালক থাকে সেই গুলিকে 'আচ্ছাদক' বা 'পর বলে। আরেক রকম পালক হয় মাথার চুলের ন্যায় তাহাকে 'ফিলো' (Filo) বলে। অন্যান্য পালক তুলিয়া ফেলিলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পায়রার পালক তুলিয়া ফেলিলেই এই পালক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝা যায়। এই তিন রকম পালকই খুব হাল্কা।

শুধু যে পাখীর পালকই হাল্কা তাহা নহে. ইহাদের শরীরের অনেকগুলি বড় বড় হাড় ঠিক বাঁশের মত ফাঁপা সুতরাং বিলক্ষণ হাল্কা। পাখী শূন্যে বিচরণ করিয়া থাকে। শরীর হাল্কা না হইলে বাতাসের মধ্যে ভাসিবে কিরূপে? ফাঁপা ও হাল্কা হইলেও এই সকল হাড় কিন্তু বেশ শক্ত।

সকল পাখীর বুকের হাড় এক রকম নহে। যাহারা উড়িতে পারে, তাহাদের বুকের হাড় চওড়া এবং ঐ সকল হাড়ের তলদেশের মধ্যস্থল 'জলিবোট'-নৌকার তলার মত প্রলম্বিত। উড়িবার সময় ইহাদিগকে ক্রমাগত ডানা নাড়িতে হয়; তাহাতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। বুকের চওড়া হাড় ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশী হইতেই ইহারা সেই শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু যে

সকল পক্ষী উড়িতে পারে না, তাহাদের বুকের হাড় সাধারণ নৌকার তলদেশের ন্যায় গোলাকার।

মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির যেমন হাত বা সম্মুখের পা আছে, পাখীদেরও তেমনি ডানা আছে। পশু ও পক্ষীর এই দুই অঙ্গে কোন প্রভেদ নাই। একের হাত বা পা অপরের ডানাতে পরিণত হইয়াছে। কেবল পাখীদের উড়িবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া উহা ভিন্ন আকার পাইয়াছে মাত্র। ডানার পালকগুলি ইহাদিগকে উড়িতে এবং পুচ্ছের পালকগুলি, নৌকার হালের মত, গতি নিয়মিত করিতে ও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতে ফিরিতে সাহায্য করে।

পশুদের যেমন ঠোঁট, পাখীদের তেমনি চঞ্চু। পাখীর উপর ও নীচের চোয়াল শৃঙ্গময় পদার্থে আবৃত হইয়া চঞ্চুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের চঞ্চুর মূলে নাসিকার এবং চক্ষুর পাশে কর্ণের ছিদ্র থাকে। পালক সরাইয়া ফেলিলেই তাহা দেখা যায়। পাখীর দাঁত নাই, জিভ্ আছে। কেবল ঈগল, বাজ-জাতীয় পক্ষীদের চঞ্চুতে একটি দাঁতের মত আছে তাহাকে 'ফেস্টুন' বলে। আর দাঁত আছে 'করমোরাণ্ট'দের। বেশীর ভাগ পাখীর জিভও শৃঙ্গময় পদার্থে গঠিত। উহা খাদ্য-দ্রব্য গিলিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আস্বাদ গ্রহণের পক্ষে কোন কাজেই আসে না।

পাখীর পায়ের কাজও অদ্ভুত। পায়ের মাংসপেশী এরূপ ভাবে গঠিত যে, পাখী পা বাঁকাইলে, উপরদিক্ হইতে উহাতে টান পড়ে। তাহার ফলে পায়ের অঙ্গুলগুলি মুড়িয়া বা দুমড়াইয়া বন্ধ হইয়া যায়। পাখী ইচ্ছাপূর্ব্বক পা সোজা বা খাড়া না করিলে, আঙ্গুলগুলি কিছুতেই খুলে না। মাংসপেশীর টানে আঙ্গুল মুড়িয়া বন্ধ হয় বলিয়া, ঘুমন্ত অবস্থাতেও গাছের শাখা হইতে ইহাদের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ডালে বসিবামাত্র শরীরের ভারে ইহাদের পা আপনা-আপনি বাঁকিয়া যায়, আর আঙ্গুলগুলিও সেই মুহূর্ত্তে দুমড়াইয়া খুব জোরে শাখা আঁকড়াইয়া ধরে। সুতরাং ইহারা পড়িয়া যাইবে কিরূপে?

পশু অপেক্ষা পাখীর রক্ত গরম। সরীসৃপ ও মাছের রক্ত ঠাণ্ডা। ইহাদের একবারে ছানা হয় না। প্রথমে ডিম হয়। ধাড়ী পাখী ডানায় ঢাকিয়া সেই ডিমে তা দিয়া থাকে। পাখীর শরীরের উত্তাপে ডিমের ভিতর ছানা বর্দ্ধিত হয় এবং যথা সময়ে চঞ্চুর দ্বারা খোলা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসে।

পাখীর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি খুবই উন্নত ধরণের এবং প্রখর, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি একেবারে নাই। ইহাদের চক্ষুর কার্য্য খুব আশ্চর্য্যজনক। অপর কোন প্রাণীরই এইরূপ অদ্ভুত শক্তি নাই। নিমেষের মধ্যে ইহাদের চক্ষু দূরবীণ হইতে অণুবীক্ষণে পরিণত হয়।

পক্ষী সম্বন্ধে মোটামুটি কয়টি কথা বলা হইল। ইহাদিগকে এই পুস্তকে সাত ভাগে বা বর্গে বিভক্ত করা হইতেছে :—

১। দণ্ডচারীবর্গ
২। মাংসাশীবর্গ
৩। কপোতবর্গ
৪। কর্ষকবর্গ
৫। দীর্ঘজঙ্ঘবর্গ
৬। সন্তরকবর্গ
৭। ধাবকবর্গ

প্রত্যেক বর্গ আবার নানা বংশ, গণ ও জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছুই বলা হইবে না এবং তাহা সম্ভবপরও নহে।

পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ

পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ হাজার রকমের পক্ষী আছে। এখন বিভিন্ন পক্ষীদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্ব্বে আকাশে উড্ডীয়মান এই জীবটির উৎপত্তির বিবরণ জানিয়া রাখ।

বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল জীব-জন্তু দেখিতে পাই, ইহারা যে ঠিক ইহাদের আদি পূর্ব্বপুরুষের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা এই সকল জীবের সুদূর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যে ঠিক ইহাদের আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, এক জাতীয় জীব কালক্রমে বংশপরম্পরায় এতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যা:. যে, উহাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং পরবংশীয়দের মধ্যে আকৃতিগত কোনই সাদৃশ্য থাকে না। এইরূপে এক জাতি হইতে ক্রমে ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়।

পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ **সরীসৃপ**। টিক্‌টিকি, গিরগিটির বংশ হইতেই পক্ষী উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের মনে বিস্ময় জাগে যে সুন্দর সাবলীল গতি বিশিষ্ট গরমরক্ত পক্ষী আর কোথায় কদাকার ঠাণ্ডারক্ত সরীসৃপ! কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এক বৎসরে বা এক শত বৎসরে হয় নাই; অতি অল্পে অল্পে বহু যুগ ধরিয়া এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ কথা আজ অবিশ্বাস করিবার কোন উপায়ই নাই।

এই পরিবর্ত্তনের যুগে, কান এক সময়ে এমন প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যাহারা না সরীসৃপ, না পক্ষী; অথচ এই উভয় জাতীয় প্রাণীর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ উহাদের দেহে বর্ত্তমান ছিল। এখানে সেই অদ্ভুত প্রাণীর একখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইহাদের নাম 'আর্কিয়প্টেরিক্স' (Archœopteryx)। আর্কিয়প্টেরিক্সের দেহ গিরগিটির মত, তাহাতে যেন ২ খানা পায়রার ডানা! লাঙ্গুল দীর্ঘ, তাহার দুই পাশে পক্ষীর পুচ্ছের ন্যায় সারি সারি পালক। ৪ খানা পায়ের মধ্যে পিছনের ২ খানা পক্ষীর মত, সম্মুখের ২ খানা সরী-সৃপের মত। প্রতি পায়ে পাখীর ন্যায় 'পর' এবং মস্তিষ্কও ঠিক পক্ষীর মত, অথচ ইহাদের মুখে সরীসৃপের ন্যায় বড় বড় দাঁত!

আর্কিয়প্টেরিক্স কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং কত যুগ হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে! আন্দাজ প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাভেরিয়া দেশের গিরি-প্রস্তরে ইহাদের একটি সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া গিয়াছে। সেই দেহ পরীক্ষা করিয়াই

নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে পক্ষী জন্মিবার বহু পূর্ব্বে সরীসৃপ জন্মিয়াছিল এবং সেই সরীসৃপ হইতেই যুগ-যুগান্তের পরে পক্ষীর উৎপত্তি হইয়াছে।



আর্কিয়প্টেরিক্স

দণ্ডচারীবর্গ

এই বর্গের পাখীদের পায়ের গড়ন গাছের ডালে ডালে বিচরণ করিবার বা দাঁড়ে বসিবার বিশেষ উপযোগী। সেইজন্য ইহাদিগকে "দণ্ডচারী" বলা হইয়া থাকে।

আজ পর্য্যন্ত দণ্ডচারী-দলের প্রায় ১৬০০০ রকম পাখীর কথা জানা গিয়াছে। ইহাদের পা ছোট ও দুর্ব্বল; পায়ের ৪টি আঙ্গুলের মধ্যে ৩টি সম্মুখদিকে ও ১টি পিছনদিকে। সুন্দর সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণে ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয়ও দিয়া থাকে।

আমাদের পল্লী-গৃহের আশ-পাশে, আমাদের বাগান-বাগিচায়, আমাদের বন-জঙ্গলে সর্ব্বদাই যে সকল পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের বেশীর ভাগই দণ্ডচারীবর্গ-ভুক্ত। ইহাদের শ্রী-ছাঁদ যেমন সুন্দর, অধিকাংশের গলার স্বরও তেমনি মিষ্ট। পৃথিবীতে যত রকম গায়ক-পক্ষী আছে, তাহারা সকলেই এই বর্গের অন্তর্গত।

বায়সাদি

পাতিকাক

বাঙ্গলাদেশে সচরাচর দুই জাতীয় কাক দেখিতে পাওয়া যায়; 'পাতিকাক' ও 'দাঁড়কাক'। পাতিকাকের (Common House-Crow) ঘাড়, গলা, বুক ও পেটের কতকটা ধোঁয়াটে কালো; বাকি অংশ কুচ্‌কুচে কালো।

পাতিকাক ভোর না হইতে সকলের আগে চরিতে বাহির হয়, আবার সন্ধ্যা-

কালে সকলের পরে বাসায় ফিরিয়া আসে। দিনের বেলা সারাক্ষণই পল্লীর কাছাকাছি থাকিয়া যত রকমে পারে গৃহস্থকে জ্বালাতন করিয়া মারে।

স্বজাতির প্রতি ইহাদের ভালবাসা যেমন খুব বেশী, দলের একটা কাক বিপদে পড়িলে, যেমন দলশুদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসে এবং যতক্ষণ না সঙ্গী বিপদ্-মুক্ত হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না, তেমনি দলের কোনটা শাস্তির যোগ্য হইলে, তাহাকেও ইহারা সহজে ছাড়ে না। এরূপ স্থলে মানুষের মধ্যে যেমন 'পঞ্চায়েতির' চলন আছে, ইহাদের মধ্যেও তেমনি পঞ্চায়েতি-সভা বসিতে দেখা যায়। ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত কাক সেই সভাতে যোগ দেয়। কিছুক্ষণ বাক্-বিতণ্ডা চলে। শেষে সকলে মিলিয়া তাড়া করিয়া আঁচ্ড়াইয়া কাম্ড়াইয়া অপরাধীকে এমন নির্য্যাতন করিতে থাকে যে, বেচারার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়।


পাতিকাক

কাক পেটের জ্বালায় সর্ব্বদাই অস্থির। রাস্তার পচা ইঁদুর, ব্যাঙ, হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের ভাত, মাছ-তরকারি যাহা পায়, ইহারা তাহা দ্বারাই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। কাঁচা-পাকা সিদ্ধ-অসিদ্ধ, পচা-ধ্বসা— কোন কিছুতেই ইহাদের অরুচি দেখা যায় না। পথ-ঘাটের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া লোকের উপকার করিতে এমন আর দ্বিতীয়টি নাই।

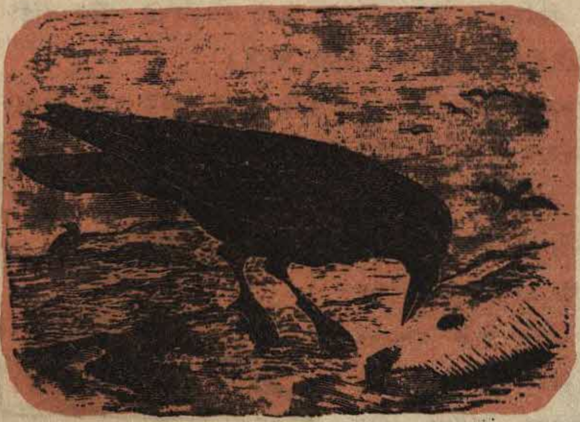
কাকের বাসায় কোনই শ্রী-ছাঁদ নাই। প্রতি বৎসর বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে ইহাদের ছানা হয়; ডিমের সংখ্যা ৪।৫টি, রং নীল্‌চে।

কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়ে, একথা মিথ্যা নয়। কাক নিজের ডিম মনে করিয়া কোকিলের ডিমে তা দেয় এবং নিজের বাচ্ছা মনে করিয়া কোকিলের ছানাগুলিকেও খুব যত্নে পালন করে।

দাঁড়কাক

পাতিকাক অপেক্ষা দাঁড়কাক (Indian Jungle-Crow) কিছু বড়। পাতিকাক রোগা ধরণের, কিন্তু দাঁড়কাক বেশ মোটাসোটা; ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ কুচ্‌কুচে কালো ও স্বর খুব গম্ভীর।

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়; আমাদের বাঙ্গলা



দাঁড়কাক

দেশেও যথেষ্ট আছে। ইহাদের স্বভাব ও চাল-চলন প্রায় পাতিকাকেরই মত ; খাদ্যাদি এবং রুচি সম্বন্ধেও বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে খুব ভাব। একটি যদি হঠাৎ মরিয়া যায়, তবে অন্যটি দুঃখে মৃত্যু পর্য্যন্ত একাকী বাস করে। সাধারণত ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে না, জোড়ায় জোড়ায় থাকে। পঞ্চায়েতি বা মরা-জীব ভক্ষণের সময় দল বাঁধিয়া জোট হয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে দাঁড়কাকের ছানা হয়। পাতিকাকের মত ইহাদের বাসাও নেহাৎ অগোছালো ধরণের।

এই দুই রকম কাক ছাড়া হিমালয় অঞ্চলে আর এক রকম কাক (Jackdaw) দেখা যায় ; তাহাদের বুক, পিঠ ও ঘাড় ধূসর সাদাটে। আফ্রিকাতেও এই জাতীয় কাক আছে।

আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও কয়েক রকম বড় বড় কাক দেখা যায়। তাহাদের কতকগুলিকে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল, কাশ্মীর ও তিব্বতে দেখা যায়। উহাদের মধ্যে 'ডোম কাক'কে (European Raven) কখনও কখনও শীতকালে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সমতল ভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাগ্‌পাই

'ম্যাগ্‌পাই'ও (Magpie) কাক-বংশের পাখী। ইংলণ্ড হইতে চীনের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ম্যাগ্‌পাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকাতেও এই পাখী আছে। আমাদের দেশের হাঁড়িচাঁচার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য খুব বেশী। হিমালয় প্রদেশে তিন চার জাতের ম্যাগ্‌পাই দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে 'লাল ঠোঁট নীল ম্যাগ্‌পাই' বা 'নীলকান্ত' (U. Erythrorhyncha) দেখিতে খুবই সুন্দর।

ম্যাগ্‌পাই গাছের খুব উঁচু ডালে বাসা তৈয়ারি করে এবং একটিমাত্র দরজা রাখিয়া, বাসার চারিদিক্‌ কাঁটাতে ভরিয়া দেয়। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের এক একটি বাসা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় দুইমাস সময় লাগে।

ইহারা একবারে ৪।৫টি ডিম পাড়ে; ডিমের রং ফিকে সবুজ, তাহার উপর কটা ছোপ্‌।



ম্যাগ্‌পাই

হাঁড়িচাঁচা

হাঁড়িচাঁচা (Tree-pie) কাক-বংশের পাখী। বাঙ্গলাদেশের স্থানবিশেষে ইহাদের 'টেঁকিলেজা' এবং 'টাকা-চোর' নামেরও চলন আছে।

হাঁড়িচাঁচার মাথা, ঘাড়, গলা, বুক ও পিঠের উপরিভাগ কতক ফিকে কালো, কতক খয়েরি এবং কতক হল্‌দে ও কালোতে মেশানো; ডানার উপরকার ৪টি ছোট পালক হল্‌দে, বাকিগুলি কালো; লেজের ১২টি পালকের মাঝের ২টি খুব বড় এবং দুই পাশেরগুলি পর পর ক্রমশঃ ছোট; লেজের সব পালকেরই শেষদিক্‌ কালো। ইহাদের শরীরের বাকি অংশ ফিকে হল্‌দে।



হাঁড়িচাঁচা

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এই পাখী খুব বেশী; বঙ্গদেশেও বিরল নহে। ইহারা অনেক সময় স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায়। কখনো কখনো ৫।৭টি পাখীকেও একত্র দেখা যায়। হাঁড়িচাঁচা খুব চঞ্চল; ২০।২৫ সেকেণ্ডের বেশী কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; এক গাছ হইতে অন্য গাছে অথবা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় ইহারা ক্রমাগত 'ক্যাক্‌-ক্যাক্‌—ক্যাক্‌-ক্যাক্‌—ক্যা' রবে চীৎকার করিতে থাকে।

হাঁড়িচাঁচা কীট-পতঙ্গ, টিক্‌টিকি-গিরগিটি, ছোট পাখী এবং মাঝে মাঝে বাদুড় মারিয়া খায়;

বাসায় ঢুকিয়া পাখীদের ডিম ও কচি কচি ছানা চুরি করিয়া খাইতেও ওস্তাদ্! সময় সময় ইহারা শুধু ফল-ফুল খাইয়াই জীবনধারণ করে।

নন্দন-পক্ষী

এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি যে সকল দ্বীপ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে 'নিউগিনি' ও 'আরু' প্রভৃতি দ্বীপে নন্দন-পক্ষীর (Birds of Paradise) বাস। এই দ্বীপগুলি ঘন গাছপালায় ও সুন্দর লতাগুল্মে পূর্ণ— দেখিতে যার-পর-নাই রমণীয়। প্রকৃতির এই নন্দন-কাননে নন্দন পক্ষী সুখে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল দ্বীপ ছাড়া মলক্কা-দ্বীপে এক জাতীয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে তিন জাতীয় নন্দন-পক্ষী আছে।

এই পাখী প্রায় ৫০ জাতিতে বিভক্ত। অধিকাংশ পুরুষ পাখীর ডানা ও লেজে রং-এর যেরূপ বাহার, আমেরিকার হামিং-বার্ড' ছাড়া, অন্য কোন পাখীতে সেরূপ



বড় জাতীয় নন্দন-পক্ষী

দেখা যায় না। তাহাদের দিকে চাহিলে, রামধনুর সবগুলি রং যেন একসঙ্গে ঝিক্-ঝিক্ করিতে থাকে।

ছবিতে যে পাখীটি দেখিতেছ, উহার মাথা ও গলা মখ্মলের মত কোমল সবুজ

পালকে ঢাকা এবং দুই ডানার নীচে হইতে এক এক গোছা সোনালী পালক দুইদিকে ছড়ানো। ইহারা যখন ডানা মেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তখন এই সকল পালকে কি অপরূপ শোভা ফুটিয়া উঠে, তাহা নিজে না দেখিলে অনুভব করা যায় না।

নন্দন-পক্ষী কাকের নিকট জ্ঞাতি। কেবল শীত ও বসন্তকালেই ইহাদের শরীর সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে; গ্রীষ্ম আরম্ভ হইলেই এক একটি করিয়া পালক খসিতে থাকে। বর্ষাকালে ইহাদিগকে দেখিলে পাটকিলে রংএর কাক বলিয়াই মনে হয়। নন্দন-পক্ষীর ঠোঁটও ঠিক কাকের ঠোঁটের মত এবং ডাকও অনেকটা সেইরূপ।

ইহারা নানা রকম ফল এবং কীট-পতঙ্গাদি খাইয়া জীবনধারণ করে। একবারে ইহাদের ২টি করিয়া ডিম হয়: ডিমের রং হল্‌দেটে গোলাপী, তাহার উপর কটা ও ধূসর ছিট।

বাওয়ার-বার্ড

সৌখীন লোক বসবাসের উপযোগী ঘর-বাড়ী ছাড়া যেমন আরামের জন্য সুন্দর সুন্দর বিশ্রামাগার প্রস্তুত করিয়া থাকে, পশু-পক্ষীর মধ্যে প্রায় কোন জাতিকেই সেরূপ করিতে দেখা যায় না। অনেকেই বাসস্থান নির্ম্মাণে আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু সেটা তাহাদের প্রয়োজন অনুসারেই করে, আরাম বা বিলাসিতার জন্য করে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দেশে "বাওয়ার-বার্ড" (Bower-Bird) নামে কাক ও নন্দনপক্ষীর জ্ঞাতি এক রকম পাখী আছে, ইহাদিগকে ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের জন্য রীতিমত বিহার-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। এই সকল কুঞ্জ বাস করিবার জন্য নহে, কেবল বিহারেরই জন্য।

নিবিড় বনের মধ্যে এইরূপ কুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। বাওয়ার-বার্ড আশ্চর্য্য কৌশলে ডাল-পালা সাজাইয়া উহা তৈয়ারি করে। ডাল-পালাগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানের দুই পাশে এমন সুন্দর করিয়া সাজায় যে, একটিও খোঁচা বা গাঁইট্ ভিতরের দিকে থাকে না।



বাওয়ার-বার্ড

তার পর বিহারের জন্য যতটা স্থানের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র

ফাঁক রাখিয়া ইহারা দুই পাশের ডাল- পালার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহতে কুঞ্জটি দেখিতে বেশ, সুন্দর হইয়া উঠে।

শুধু কুঞ্জ তৈয়ারি করিয়াই বাওয়ার বার্ড ক্ষান্ত হয় না, নানা রঙের পাখীর পালক, ভাল ভাল রঙিন পাথর, শামুক-ঝিনুকের চক্‌চকে খোলা এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিস আনিয়া দরজার দুই পাশে ঝুলাইয়া দেয়। সাজাইবার মাল-মশলা বেশী হইলে কুঞ্জের বাকি অংশও পরিপাটি করিয়া তুলে।

এইরূপে কুঞ্জটি শোভাযুক্ত হইলে, বাওয়ার-বার্ড দলে দলে একত্র হইয়া, উহার ভিতর ছুটাছুটি করিয়া খেলায় ও আমোদে দিন কাটায়। অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন জঙ্গলে পাশাপাশি এইরূপ অনেক কুঞ্জ দেখিতে প্যাওয়া যায়। ইহারা বেশ পোষ মানে। পোষা পাখীকেও বিহার-কুঞ্জ বানাইতে দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ 'মালী বাওয়ার-বার্ড' (Gardener Bower-bird) এবং 'স্যাটিন বাওয়ার-বার্ড' (Satin Bower-bird) এই দুই জাতীয়কেই বেশী দেখা যায়।

এই পাখী নিরামিষভোজী ; কেবলমাত্র ফল খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের পুরুষ-জাতির রং উজ্জ্বল বেগুনি ; স্ত্রী-পক্ষী ও ছানাগুলি সবুজের আভাযুক্ত বাদামী।

ছাতারিয়া বা সাত ভাই

বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি পল্লীতেই ছাতারে (Babbler) পাখী দেখা যায়। ইহাদের পালকের রং আগাগোড়াই ফিকে কটা ; চোখ ও ঠোঁট সাদা। ডানা ছোট বলিয়া ইহারা ভাল উড়িতে পারে না। কিন্তু পা শক্ত বলিয়া বেশ লাফালাফি করিতে পারে ; চলিবার সময় ঠিক চড়ুই পাখীর মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। ৬/৭টি পাখী সর্ব্বদাই এক সঙ্গে থাকে বলিয়া ইহাদের আর এক নাম "সাত ভাই।



ছাতারে

ইহাদের স্বভাব খুব চঞ্চল ; গাছের ডালে কিংবা মাটিতে কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—শুধু "ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌" চীৎকার আর লাফালাফি। দলের একটি যদি কোন কারণে উড়িয়া যায়, তবে পর পর আর সবগুলিই উড়িতে আরম্ভ করে এবং ৫/৭ হাত মাত্র দূরে গিয়া আবার এক সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে। ইহারা গাছের খুব নীচু ডালে এবং গাছ-পালার নীচে মাটিতে চরিয়া

বেড়ায় ; বাসা বাঁধিবার সময় নীচু ডালেই বাঁধে। ইহাদের একবারে ৩/৪টি করিয়া ডিম হয় ; সেগুলির রং নীল। ইহাদের বাসায় পাপিয়ারা ডিম পাড়িয়া যায়।

ছাতারে নানা জাতীয় হয়। আমাদের বাঙ্গলা দেশেই এক রকম ছোট জাতের ছাতারে (Chrysomma sinensis) দেখা যায়, তাহাদের হিন্দি নাম 'গোলাব-চসম্' (Yellow-eyed Babbler)। ইহারা লম্বায় ৬½ ইঞ্চির বেশী হয় না। ইহাদের হল্‌দে চোখের চারিধারে আঙটির মত লাল বৃত্ত থাকে। ইহাদের ডাক কিন্তু 'সাতভাই ছাতারে'র ন্যায় 'ক্যাচ-ক্যাচে' নয়। ইহারা বেশ মিষ্ট সুরেই ডাকিয়া থাকে।

নানা রকম পোকা-মাকড় ও আতা, পেঁপে প্রভৃতি ফলই ছাতারের খাদ্য।

বুল্‌বুলি

পারস্য, মিশর, প্যালেষ্টাইন্, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে ও ভারতবর্ষে নানা জাতীয় বুল্‌বুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের সংখ্যা কিছু কমও নয়। সাধারণতঃ বুলবুলির স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই একই প্রকার দেখিতে হয়। কখনও কখনও যে ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নয়। কালো-জাতীয় বুলবুলি ছাড়া এক রকম সবুজ-জাতীয় বুলবুলিও (Green Bublul) আমাদের দেশে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে 'হারেয়া বা হরবোলা' (Chloropsis) গায়কপক্ষীদের মধ্যে খুবই উচ্চস্থান অধিকার করে। নানা প্রকার পাখীর ডাক নকল করিতে পারে বলিয়াই ইহার নাম 'হরবোলা' হইয়াছে। ইহারা যখন একসঙ্গে ৭।৮টিতে মিলিয়া এক একটিতে নানা পাখীর আওয়াজ করিতে থাকে, তখন দূর হইতে মনে হয় বহু জাতীয় পাখীর যেন এক সভা বসিয়াছে। 'ফটিকজল'ও (Iora) এই সবুজ-বুলবুলির অন্তর্গত পাখী।



বাঙ্গলাদেশে যে দুই রকম বুল্‌বুলি খুব প্রসিদ্ধ, তাহাদের এক জাতির ছাঁদ বেঁটে ও রং কালো, তাহাদিগকে 'কালো বুল্‌বুলি' বলে ; আর এক জাতির ছাঁদ লম্বাটে ও রং কটা, তাহাদিগকে 'সিপাহি বা চীনে বুল্‌বুলি' বলে !

কালো বুল্‌বুলি

কালো বুল্‌বুলি (Red-vented Bulbul) আকারে ৫।৬ ইঞ্চির বেশী নহে। ইহাদের মাথা ও ঝুঁটি মিশ্‌মিশে কালো , ঘাড়ের নীচে হইতে গায়ের আর সব পালক ফিকে

কালো ; লেজের বেশীর ভাগ এবং ডানার কতকগুলি পালকের শেষদিক্ সাদা ; লেজের গোড়া টুক্‌টুকে লাল।

ইহাদের স্বর বেশ মিষ্ট। এই জন্য লোকে আদর করিয়া বুল্‌বুলি পুষিয়া থাকে। এই পাখীর স্বভাব খুব চঞ্চল। এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। খাবার চেষ্টায় সারাদিন এ গাছ, সে গাছ করিয়া বেড়ায়। আতা, ডালিম্, পেঁপে, কলা, তেলাকুচা, বট ও অশ্বত্থের ফল এবং পোকা-মাকড় ইহাদের প্রধান খাদ্য।



কালো বুলবুলি

গাছের নীচু ডালে, ঘন পাতার ঝুপির মধ্যে ইহারা সুন্দর সুন্দর বাসা তৈয়ারী করে। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে ইহাদের ছানা হয়। ছোটবেলায় পুষিলে বুল্‌বুলি্ বেশ পোষ মানে। অনেকে আবার পোষা বুলবুলি লইয়া লড়াই খেলাও করিয়া থাকে।

সিপাহি বুল্‌বুলি



সিপাহি বুল্‌বুলি

ইহাদের মাথা ও ঝুঁটি কালো ; ডানা ও লেজ খয়েরি ; বুক, পেট্ ও গলার কতক সাদা এবং কতক ফিকে কটা। সিপাহিদের পাগ্‌ড়ির মত এই জাতীয় বুল্‌বুলির মাথার তুই পাশ লাল বলিয়া, লোকে ইহাদিগকে 'সিপাহি বুল্‌বুলি' (Red-whiskered Bulbul) বলিয়া থাকে।

ইহাদিগকে ঘন জঙ্গলের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। স্বভাব খুব চঞ্চল বলিয়া ইহারা ছ'দণ্ডও এক জায়গায় স্থির হইয়া বসে না ; কেবল এ গাছ, ও গাছ লাফালাফি করিতে থাকে। এই পাখীর মিষ্ট ডাক অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

কালো বুল্‌বুলির মত ইহাদের বাসাগুলিও বেশ সুন্দর ; ডিমের রং গোলাপী, তাহার উপর ছিট্ ছিট্।

নাইটিঙ্গেল্

'নাইটিঙ্গেল্' (Nightingale) বুলবুলি ও দোয়েলের খুব নিকট জ্ঞাতি। ইউরোপের

গায়ক পক্ষীদের মধ্যে নাইটিঙ্গেলের স্থান সকলের উপরে। ইহাদের গানের এক একটি ঝঙ্কার কানে যেন অমৃত ঢালিতে থাকে। মুঘল রাজরাজড়াদের বর্ণনায় এবং পারস্য দেশীয় কাব্যে যে বুলবুলির কথা শোনা এবং পড়া যায়, তাহা পারস্যদেশীয় নাইটিঙ্গেল্ (L. hafizi)। নাইটিঙ্গেল্কে হিন্দিতে "বুলবুল বস্ত"।" (L. philomela) বলে।

ইউরোপের প্রবল শীত ইহাদের পক্ষে অসহ্য। তাই সেখানে কেবল গ্রীষ্মকালে এই পাখীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে ইহারা আফ্রিকাতে বাস করে।


নাইটিঙ্গেল্

নাইটিঙ্গেল খুব অহঙ্কারী পাখী। ইহাদের গানের অনুকরণে কেহ শিস্ দিতে আরম্ভ করিলে ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না, পর পর সুর চড়াইয়া তাহাকে হারাইয়া দিতে চেষ্টা করে। যদি কিছুতেই সে শিস্ দেওয়া বন্ধ না করে, তবে রাগিয়া গিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে।

নাইটিঙ্গেল্ শুক্না ঘাস ও পাতা দিয়া এমন কৌশলে বাসা তৈয়ারি করে যে, খুব নিকট হইতেও সহজে তাহা দেখা যায় না। বাসার কারিকুরি এমন সুন্দর যে, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। ইহারা একবারে ৪।৫টি ডিম পাড়ে; ডিমগুলির রং ফিকে বাদামী। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষে এত ভাব যে, একটিকে ছাড়িয়া আর একটি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। একটি হঠাৎ মরিয়া গেলে অন্যটি অনাহারে শুকাইতে শুকাইতে মারা পড়ে।

দোয়েল আদি

দোয়েল

ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই দোয়েল (Magpie-Robin) আছে; তবে মধ্যভারত ও বঙ্গদেশে খুব বেশী। শ্যাম, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশেও দোয়েলের অভাব নাই। 'শ্যামা'র সহিত ইহাদের নিকট সম্বন্ধ।

ইহাদের পুরুষ-জাতির মাথা, ঘাড়, গলা, পিঠ, ডানা ও লেজ চক্চকে কালো;

বুক, পেট ও লেজের গোড়া সাদা; লেজের দুই পাশের চারিটি করিয়া পালক সাদা। স্ত্রী-জাতির গলা ও বুক ধূসর এবং গায়ের বাকি পালক ফিকে কালো। দেশ-ভেদে ইহাদের আকারে এবং গায়ের রং-এ কিছু কিছু তফাৎ হইতেও দেখা যায়।



দোয়েল

দোয়েল ফাঁকা গাছ-পালাই বেশী পছন্দ করে। সাধারণতঃ একটা, কখনো কখনো এক জোড়া পাখী এক সঙ্গে আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। কীট-পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য। কীট-পতঙ্গাদি দেখিতে পাইলে, ইহারা ডাল-পালার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া লাফাইতে লাফাইতে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। তারপর লেজের পালক ছড়াইয়া শিস্ দিতে দিতে আবার ডালে গিয়া বসে। অনেক সময় ইহাদিগকে লেজ ছড়াইয়া নৃত্য করিতেও দেখা যায়।

দোয়েলের স্বর খুব মিষ্ট। বসন্তকালে বাসা বাঁধিবার ও ডিম পাড়িবার সময় আসিলে ইহাদের পুরুষ-জাতির গানের উৎসাহ খুব বাড়িয়া যায়। শীত পড়িলেই কিন্তু সব শেষ। স্ত্রী-দোয়েলের শিস্ দিবার শক্তি নাই।

দোয়েল ঘন ঝুপির মধ্যে বাসা তৈয়ারী করে এবং এক একবারে ৪টি করিয়া ডিম পাড়ে; ইহাদের ডিমের রং ফিকে সবুজ, তাহার উপর খয়েরি ছোপ্।

শ্যামা

দাক্ষিণাত্যে মালাবারে, চেরাপুঞ্জী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি আসাম-অঞ্চলে ও মধ্যভারতের নানা স্থানে শ্যামা (Shama) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বাহিরে— সিংহল প্রভৃতি দেশেও শ্যামা আছে। ইহারা মানুষের ঘর-বাড়ী হইতে দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে, থাকিতে ভালবাসে।

শ্যামার মাথা, ঘাড়, গলা, পিঠ্, ডানার বাহিরদিক্ এবং লেজ চক্চকে কালো;

লেজের গোড়া ও দুই পাশ সাদাটে এবং বুক, পেট ও ডানার ভিতরপিঠ্ খয়েরি। আকারে এক একটি পাখী ৬৷৭ ইঞ্চির বেশী নহে।



শ্যামা

শ্যামা প্রায়ই একা একা চরিয়া বেড়ায়। কখনো বা একসঙ্গে এক জোড়া পাখীও দেখা যায়। পোকা-মাকড়ের আশায় ইহারা গাছের খুব নীচু ডালে বসিয়া থাকে এবং একটা কিছু নজরে পড়িলে অমনি উড়িতে উড়িতে আসিয়া খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলে।

ইহাদের গান বড়ই মিষ্ট। ভারতবর্ষের খুব কম পাখীই এমন মিষ্ট গান করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের ঠিক পূর্ব্বে ও পরে ইহাদের গান শুনিতে পাওয়া যায়।

পোষা শ্যামা আপনার স্বাভাবিক সুমিষ্ট গান ছাড়া অন্য পাখীর ডাকেরও বেশ নকল করিতে পারে।

থ্রাস্

থ্রাস্ (Thrush) দোয়েল-শ্যামারই জ্ঞাতি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ার উত্তরাংশে এবং শীতকালে ভারতবর্ষে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম, ব্রহ্ম, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বহু জাতীয় থ্রাস্ আছে।

থ্রাস্ নানা জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ইউরোপের 'গায়ক থ্রাস্' (T. philomelus) খুব প্রসিদ্ধ। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই, এমন কি, প্রবল ঝড়বৃষ্টির সময়ও ইহাদের গান শুনিতে পাওয়া যায়। নানা রকম পোকা-মাকড় ইহাদের প্রধান খাদ্য। শামুকের মাংস খাইতে ইহারা বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। শামুক ধরিতে পারিলেই থ্রাস্ পাখী পাথরের উপর আছাড় দিয়া উহার খোলা ভাঙ্গিয়া ফেলে; তার পর ভিতরের মাংস খায়। নানা রকম পাকা ফলও



থ্রাস্

ইহাদের খুব প্রিয়। বৎসরের কয়েক মাস কেবল ফল খাইয়াই ইহারা বাঁচিয়া থাকে। থ্রাস্ পাখী খড়, কুটা, ঘাস, পাতা, কাগজ, নেক্ড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পেয়ালার আকারে বাসা তৈয়ারি করে এবং প্রবল শীত হইতে ছানা গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য, উহার ভিতর পিঠ্ মাটি দিয়া লেপিয়া ফেলে। ইহারা এক সঙ্গে ৫টি করিয়া ডিম পাড়ে; ডিমের রং সবুজ, তাহার একদিকে কালো ছিট্। বাঙ্গলা দেশে এই গোষ্ঠীর এক জাতীয় পাখী আছে, তাহাকে 'দামা' (Orange-headed Ground Thrush) বলে। ইহারা মাটি হইতে তিন চার ফুট উচ্চে ঝোপের মধ্যে বাসা করে। ভিজা মাটির ভিতর ঠোঁট ঢুকাইয়া কেঁচো বাহির করিয়া খায়। ইহারা দেখিতে যেমন সুন্দর, গলার আওয়াজও তেমন মিষ্ট।

অনুকারী পক্ষী

অনুকারী পক্ষীর (Mocking-Bird) জন্মস্থান আমেরিকা। গায়ক পক্ষীদের মধ্যে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে। গান গাওয়া ছাড়া এই পাখীর আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ইহারা পশু-পক্ষীর ডাকের এমন অবিকল নকল করিতে পারে যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহারা যখন বিড়ালের ডাকের অনুকরণ করে, তখন অন্য বিড়াল ছুটিয়া আসে। যখন কুকুরের ডাক ডাকে, তখন অপর কুকুর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কখনো ইহারা নাইটিঙ্গেলের মধুর-স্বরে কর্ণ শীতল করিয়া দেয়, আবার কখনো বা ঈগলের বিকট চীৎকারে ছোট ছোট পশু-পক্ষীর অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পাখীর চাতুরীতে কেবল যে ইতর প্রাণীরাই প্রতারিত হয়, তাহা নহে; অনেক সময় মানুষকেও খুব অপদস্থ হইতে হয়। শিকারী হয়ত কোন বিশেষ পক্ষীর সন্ধানে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ অনুকারী পক্ষী সেই পাখীর ডাক ডাকিয়া উঠিল। শিকারীর



অনুকারী পক্ষী

মহা স্ফূর্তি। শেষে অনুসন্ধান করিয়া যখন আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিল, তখন সে বেচারা 'বোকা' বনিয়া গেল।

জীবজন্তুর ডাক ছাড়া ইহারা কামারের হাতুড়ীর শব্দ, রাস্তায় গাড়ী চলার শব্দ, এঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ— এক কথায় প্রায় সকল প্রকার শব্দই নকল করিতে পারে। এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আর কোন প্রাণীতেই দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই— ইহারা কখন্ যে কাহার ডাক ডাকিয়া উঠে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। হয়তো থ্রাস পাখীর অনুকরণে মিষ্ট সঙ্গীত করিতে করিতে হঠাৎ গর্দ্দভের ডাক ডাকিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণেই শিয়ালের ডাক ডাকিয়া দেশশুদ্ধ কুকুরের দলকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিল।

এই পাখী আকারে ছোট—লম্বায় আধ হাতের বেশী নহে। ইহারা থ্রাসেরই জ্ঞাতি। ইহারা মাটি হইতে ৫।৬ হাত উঁচুতে ঘন ঝুপীর মধ্যে বাসা তৈয়ারী করে এবং এক একবারে ৩ হইতে ৬টি করিয়া নীল্‌চে-সবুজ ডিম পাড়ে। বৎসরে ইহাদের দুইবার ছানা হয়।

লায়ার পাখী

লায়ার পাখীর (Lyre-Bird) জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া। ইহারা আকারে বেশ বড়। পুরুষ-জাতির লেজের দুই পাশের দুইটি চওড়া পালক বড় হইয়া বীণা-যন্ত্র বা 'লায়ার' নামক বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের আকার ধারণ করে। সেই জন্যই ইহাদিগকে 'লায়ার পাখী' বলা হয়।

ইহাদের গায়ের রং মেটে; ডানা ও গলার নীচের-দিক্ লাল; লেজের যে দুইখানা চওড়া পালক সাপের ফণার মত বাঁকিয়া থাকে, উহাদের সম্মুখ-দিক্ ধোঁয়াটে এবং পিছনদিক্ ফিকে ধূসর। ঐ দুইটি পালকের দুই প্রান্ত কাপড়ের পাড়ের মত ঈষৎ লাল। লায়ার পাখীর লেজে খেজুর-পাতার মত সরু সরু আরো ১৬টি পালক দেখা যায়।

ইহারা খুব লাজুক পাখী। সারাদিনই ঝুপি-ঝাপি অথবা বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। স্বাভাবিক স্বর বেশ উচ্চ হইলেও, ইহারা এমন কোমল স্বরে গান করে যে, খুব কাছে না থাকিলে তাহা শুনিতেই পাওয়া যায় না। ইহারা ইচ্ছা করিলে অন্য পশু-পক্ষীর ডাকেরও বেশ নকল করিতে পারে। গান গাহিবার সময় এই

পাখী ময়ূরের মত লেজ ছড়াইয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরে এবং ডানা মাটিতে লুটাইয়া পায়ের দ্বারা মাটি আঁচ্ড়াইতে থাকে। ইহাদের পা বেশ শক্ত ; উঁচু-নীচু অসমান জায়গাতে এবং পাহাড়-পর্ব্বতের পিচ্ছিল গায়ে ইহারা অক্লেশে ছুটাছুটি করিতে পারে, কিন্তু ডানা দুর্ব্বল বলিয়া ভালরূপ উড়িতে পারে না ; উড়িবার বা ছুটিবার সময় লেজ গুটাইয়া রাখে।


লায়ার পাখী

ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে ইহারা গাছের কোটরে বা পাহাড়ের ফোকরে সুন্দর বাসা তৈয়ারি করিয়া থাকে। বাসা যদি খোলা জায়গায় বাঁধিবার দরকার হয়, তবে ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার একটি ছাদ তৈয়ারি করে। বাসাগুলি দেখিলেই এই পাখীরা যে কত সৌখীন, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। ইহাদের ডিমের সংখ্যা একটি ; রং সাদা, মাঝে মাঝে লাল্চে ছিট্।

লায়ার পাখী নানা রকম পোকা, মাকড় খাইয়া জীবনধারণ করে।

সদা-সোহাগী

পৃথিবীর নানা স্থানেই এই বংশের পাখী আছে ; আমাদের দেশেও ১০৷১১ রকম সদা-



আমেরিকার সদা-সোহাগী

সোহাগী (Flycatcher) দেখিতে পাওয়া যায়। পালকের সৌন্দর্য্যের জন্য ইহারা খুব প্রসিদ্ধ।

এই পাখী লম্বে প্রায় এক ফুট। জাতি-ভেদে ইহাদের আকার ও গায়ের রং নানা রকমের হইয়া থাকে। এ দেশে এক রকম সদা-সোহাগী দেখা যায়, তাহাদের পুরুষ জাতির মাথা, ঘাড় ও শরীরের নীচের দিক্ টুক্‌টুকে লাল; ডানা কালো, ডানার বড় বড় কুইল্ পালকের শেষদিক্ সাদা; ঠোঁটের চারিপাশ নীল্‌চে বেগুনি; পা গোলাপী এবং চোখ মেটে লাল। স্ত্রী-জাতি দেখিতে তেমন সুন্দর নহে; তাহাদের বুক, পিঠ্ ও ঘাড় লাল্‌চে-কটা।

মধ্য-আমেরিকায় এক রকম সদা-সোহাগী আছে, তাহাদের পুরুষ-জাতির ডানা যেমন সুন্দর, লেজের লম্বা পালকগুলিও তেমনি চমৎকার! সেকালের মেক্সিকো দেশের রাজারা এই পাখীর পালকের সাজ পরিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

সদা-সোহাগী ঘন জঙ্গলই বেশী পছন্দ করে এবং অনেক সময় একা একাই চরিয়া বেড়ায়। কীট-পতঙ্গই ইহাদের খাদ্য।

সাধারণতঃ পুরাতন গাছের কোটরে বাসা বাঁধিয়া ইহারা একবারে ৩।৪টি ডিম পাড়ে; ইহাদের ডিমের রং ফিকে-হল্‌দে।

শা' বুলবুলি

আমাদের দেশের নানাস্থানেই শা' বুল্‌বুলি (Paradise Flycatcher) আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশী নহে। বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহারা বন-জঙ্গলেই বাস করে, কেবল শীতকালের কয়েক মাস পল্লীর আশে-পাশে দেখা দেয়। ইহাদের নাম বুলবুলি হইলেও ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি।

ইহাদের মাথা, ঘাড় ও গলা চক্‌চকে কালো, তাহার উপর সবুজের আভা; ডানার দুই একটি পালকও কালো; এগুলি ছাড়া গায়ের আর সব পালকের রং ধোঁয়াটে সাদা। এই পাখীর মাথাও চূড়াযুক্ত। ইহাদের পুরুষ-জাতির

লেজের মাঝখানের দুইটি পালক আর সব পালকের চাইতে প্রায় ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা ; স্ত্রী-জাতির লেজ এত বড় হয় না এবং তাহার পিঠ ও লেজ পাটকিলে রঙের।

পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য ; ইহারা খেজুরের রস খাইতে খুব ভালবাসে এবং অনেক সময় এই রসের লোভেই শিকারীর ফাঁদে পড়িয়া মারা যায়। একবারে ইহাদের ৫।৬টি করিয়া ডিম হয়।

নীল কট-কটিয়া

আমাদের দেশে শা-বুলবুলির এক জাতি পাখী, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনার কিয়দংশ ব্যতীত হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্ব্বত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায় ; উহাদের নাম 'নীল কট-কটিয়া' (Verditer Flycatcher)।

ইহাদের সারা দেহ উজ্জ্বল নীল্‌চে সবুজ। ঠোঁট ও চোখের নিকটে কিয়দংশ কেবল কাল।

ইহারা গাছপালা সমৃদ্ধ স্থানেই বাস করিতে ভালবাসে। টেলিগ্রামের তারের উপর বসিয়া যখন গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ শূন্যে উঠিয়া পতঙ্গ ধরিয়া খায়, তখন সূর্য্যের আলো পড়িয়া ইহাদের বড়ই মনোরম দেখায়।

চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে ইহার চারিটি ফিকে গোলাপী রঙের ডিম পাড়ে।

ফিঙ্গা আদি

ফিঙে

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই ফিঙে (Black Drongo or King Crow) আছে। চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশেও ফিঙের অভাব নাই। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ চক্‌চকে কালো, তাহার উপর নীলের আভা ; ডানা ও লেজের ভিতরপিঠ্‌ ধোঁয়াটে কালো ; শরীরের তুলনায় ফিঙের লেজ খুব বেশী লম্বা এবং তাহার শেষদিক্‌ মাছের লেজের মত দুই ভাগে চেরা। বাঙ্গলা দেশে আরেক জাতীয় ফিঙে (D. coerulescens) দেখা যায় তাহার তলপেটের পালকগুলি সাদা (White-bellied Drongo)।

ফিঙে ঘন বন-জঙ্গল অপেক্ষা ফাঁকা স্থান বেশী ভালবাসে এবং উড়িতে উড়িতে খাদ্য সংগ্রহ করা বেশী পছন্দ করে। অনেক সময় ইহাদিগকে ঘরের চালে বাগানের বেড়ার উপরে, গাছের শুক্‌না ডালে এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর বসিয়া কীট-পতঙ্গের সন্ধান করিতে দেখা যায়। বসিয়া থাকিতে থাকিতে যেই একটি পোকা নজরে পড়ে, অমনি বিদ্যুদ্বেগে উড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।



ফিঙে

ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষের পিঠে চড়িয়া, তাহাদের গায়ের পোকা ধরিয়া খাইতেও ইহারা বেশ পটু। ফড়িং, প্রজাপতি ও বাদ্‌লা-পোকা ধরিবার সময়, ইহারা উড়িতে উড়িতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় দেয়।

ফিঙে যেমন সাহসী, তেমনি হিংসুটে। ছোট ছোট পাখী তো দূরের কথা, ইহাদের ভয়ে কাক, চিল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অস্থির। কাছে না আসিলেও তাড়া করিয়া গিয়া ঠোকরের পর ঠোকর দিয়া তাহাদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারে। বিশেষতঃ কাকের উপর ইহাদের রাগ্‌টা যেন বড় বেশী!

ডিম পাড়িবার পর ইহাদের মেজাজ এমন বিগ্‌ড়াইয়া যায় যে, কুকুর, বিড়াল, গরু, বাছুর—কাহাকেও বাসার কাছে ঘেঁসিতে দেয় না; এমন কি, মানুষকেও তাড়া করিয়া দুই চারি ঠোকর বসাইয়া দেয়।

ইহাদের ডাক তেমন মিষ্ট নহে, শিস্‌ কিন্তু বড়ই মিষ্ট। ইহারা শেষ রাত্রে জাগিয়া উঠে এবং অতি মিষ্ট স্বরে শিস্‌ দিয়া পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে থাকে। সে স্বর এমন মধুর যে, ফিঙের শিস্‌ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহারা আবার পাখীর উপকারী বন্ধু। বাজ-শিক্‌রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উহাদের ডাক নকল করিয়া ডাকিয়া অন্যান্য পাখীদের সাবধান করিয়া দেয়।

সরু সরু ডাল-পালা ও খড়-কুটা দিয়া ইহার গাছের উঁচু ডালে বাসা তৈয়ারি করে এবং একবারে ৩।৪টি ডিম পাড়ে; ইহাদের ডিমের রং ফিকে লাল, তাহার উপর বেগুনি ছিট্।

ভীমরাজ

ভীমরাজ (Racket-tailed Drongo) ফিঙা-বংশের পাখী। ইহাদের চেহারা ঠিক বড় বড় ফিঙের মত। আমাদের দেশের নানা স্থানে—বিশেষতঃ সুন্দরবন, আসাম ও শ্রীহট্টে দলে দলে ভীমরাজ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালয় অপেক্ষা ইহার গভীর

জঙ্গল বেশী পছন্দ করে।

এই পাখী কখনো একটি, কখনো এক জোড়া, কখনো বা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া আহার অন্বেষণে গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি নানা রকম পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য

ভীমরাজ বেশ পোষ মানে এবং আমেরিকার অনুকারী পক্ষীর মত গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশু-পক্ষীর ডাকের বেশ নকল করিতে পারে। এই গুণের জন্যই ইহাদের এত আদর। ইহারা গাছের খুব উঁচু ডালে বাসা তৈয়ারি করে; ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৩।৪টি, রং ফিকে গোলাপী, তাহার উপর লাল্‌চে-পাটকিলের ছিট।

ভীমরাজেরই জ্ঞাতিভাই 'কৃষ্ণরাজ বা কেশরাজ'ও (Hair-crested Drongo) অন্যান্য পশু-পক্ষীর ডাক বেশ নকল করিতে পারে। কেশরাজ (Chibia hottentota) সুন্দরবন অঞ্চলে, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, আসাম ও পূর্ব্বঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার-ব্যবহার ও খাদ্য ভীমরাজেরই ন্যায়।

টুনটুনি

ইহারা লম্বে লেজ শুদ্ধ সাড়ে ৬ ইঞ্চির বেশী নহে। স্ত্রী-জাতি লম্বায় পাঁচ ইঞ্চির বেশী হয় না। ইহাদের পিঠের পালক হল্‌দে ও কটায় মেশানো, তাহার উপর সাদা ছিট। বুক ও পেট ফিকে হল্‌দে; মাথা ধূসর।


টুনটুনির বাসা

ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায় টুনটুনি (Tailor-Bird) দেখা যায়। সব শুদ্ধ পাঁচ জাতীয় টুনটুনি আমাদের দেশে পাওয়া যায়। গাছ-পালার মধ্যে ইহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ক্রমাগত লাফালাফি করিয়া বেড়ায়।

নানা জাতীয় কীট ও কীটের ডিম ইহাদের খাদ্য। খাইবার সময়ও ইহারা দোয়েলের মত লেজ উঁচুতে তুলিয়া লাফাইতে থাকে।

টুনটুনির আর এক নাম 'দর্জ্জী পাখী'। দর্জ্জী যেমন সূঁচ্‌ ও সূতার সাহায্যে কাপড় সেলাই করে, এই পাখীও তেমনি কাছাকাছি ২।৩টি পাতা ঠোঁট দিয়া ফুঁড়িয়া


রেনের বাসা

গাছের ছালের আঁস দিয়া সেলাই করিয়া থলির মত বাসা তৈয়ারি করে। তার পর তুলা ও পশম দিয়া উহার ভিতর-পিঠ বেশ নরম ও গরম করিয়া লয়। এই কাজে ইহাদের দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

টুনটুনি একবারে ২টি হইতে ৪টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের ডিমের রং লালচে, তাহার উপর পাটকিলে ছিট্।

রেন্

ইউরোপের নানা স্থানেই 'রেন্' (Wren) দেখিতে পাওয়া যায়। টুনটুনির সহিত ইহাদের নিকট সম্বন্ধ। ইহারা সাধারণতঃ গাছের পাতা সেলাই করিয়া বাসা তৈয়ারি করে না বটে, কিন্তু ইহাদের বাসাও দেখিবার যোগ্য। দুই এক জাতীয় আবার টুনটুনির ন্যায় সেলাই করিয়াও বাসা বাঁধে। আমাদের দেশেও ইহারা কম নহে, বহু জাতীয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দিতে ইহাদের 'ফুট্‌কি' বলে।

এই পাখীর স্বর বেশ মিষ্ট। কিন্তু স্বভাব চঞ্চল বলিয়া, ইহাদিগকে একদণ্ডও স্থিরভাবে বসিয়া গান গাইতে দেখা যায় না।


রেন্

ওরিওল

ইউরোপের নানা স্থানে, বিশেষতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশে এক রকম পাখী দেখা যায়, ইংরাজিতে তাহাদিগকে 'ওরিওল্' (Oriole) এবং কখন কখন 'ম্যাঙ্গো-বার্ড'ও (Mango-bird) বলে। সিংহল ব্যতীত ভারতবর্ষের সব স্থানে ইহাদের দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে ইহাদের 'হল্‌দে পাখী' এবং হিন্দিতে 'পিলক' বলা হয়। ইহাদের পালকের রং-ও হল্‌দে এবং কালোতে মেশানো। 'গৃহস্থের খোকা হোক্'-এর মাথার দিক্ মিশ্‌মিশে কালো, ইহাদের সেদিকে কালোর নাম-গন্ধও নাই ; মাথা, ঘাড়, গলা, বুক, পেট্ সবই ঝক্‌ঝকে হল্‌দে। 'খোকা হোক্'-এর চাইতে ইহাদের ডানা ও লেজে কালো পালকের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশী। ইহা ছাড়া আরও দুই

জাতীয় ওরিওল দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'কালো-গলা' (Black-naped) ওরিওল অল্প দেখা গেলেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। চীনদেশেও ইহাদের দেখা যায়। অপর জাতির গায়ের রঙ কাল্‌চে লাল (Marroon Oriole)।



ওরিওল্ বা হল্‌দে পাখী

'খোকা হোক্'-এর মত এই পাখীর ডাকও বেশ মিষ্ট। খাদ্যাখাদ্য এবং চালচলনও অনেকটা একই রকম। বাসা বাঁধিতে ইহারাও এমন কৌশলের পরিচয় দেয় যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। মনে হয় বাসা তো নয় যেন ঠিক একটি দোল্‌না!

আমেরিকাতেও এই জাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার পাখী ও ইউরোপের পাখী (Golden Oriole) দেখিতে প্রায় একই রকমের। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে ইহারা সাদার ওপর কালো বা লাল্‌চে-পাট্‌কিলে রঙের ২।৩টি ডিম পাড়িয়া থাকে।

গৃহস্থের খোকা হোক্

গ্রীষ্মকালে নানা রকম ফল পাকিয়া উঠিলে, যে সকল পাখী আমাদের বাগান-বাগিচায় আসিয়া দেখা দেয়, তাহাদের মধ্যে 'গৃহস্থের খোকা হোক্'-ই প্রধান। স্থান বিশেষে 'বেনেবৌ' এই নামেরও চলন আছে। কিন্তু আসলে 'বসন্ত বউরী'রই অপর নাম বেনেবৌ। আকারে ইহারা এক একটি শালিকেরই মত। ইহাদের গায়ের রং

প্রায় আগাগোড়াই উজ্জ্বল হল্‌দে, কেবল মাথা, বুক, গলা এবং ডানা ও লেজের কিছু কিছু মিশ্‌মিশে কালো আর ঠোঁট ও চোখ টুক্‌টুকে লাল।

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ইউরোপের উত্তরাংশ ছাড়া আর প্রায় সকল দেশেই এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলাদেশে খুব বেশী না হইলেও ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; কিন্তু স্বভাব খুব নিরীহ বলিয়া, ইহারা এমনভাবে গাছের উঁচু ডালে পাতার ঝুপির মধ্যে লুকাইয়া থাকে যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এই পাখীর ডাক বেশ মিষ্ট। সেই ডাকের অনুকরণেই ইহাদের 'গৃহস্থের খোকা হোক্' নামের সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে ইহাদিগকে 'হল্‌দিয়া বসন্ত' বলে।

'গৃহস্থের খোকা হোক্' কখনো ছোট ছোট দলে, কখনো বা স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায় এবং নানা রকম মিষ্ট ফল ও পোকা খাইয়া জীবনধারণ করে।

ঘাস, খড়, পালক প্রভৃতি দিয়া ইহারা গাছের ডালে এমন সুন্দর বাসা তৈয়ারি করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের বাসা কখনো পেয়ালার আকারে ডালের উপর সোজাভাবে আবদ্ধ থাকে, কখনো বা থলির



বেনেবৌ বা গৃহস্থের খোকা হোক্

আকারে ডাল হইতে ঝুলিয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যে গাছে ফিঙে বাসা করে সেই গাছকে ইহারা নিজেদের বাসা বাঁধিবার জন্য বাছিয়া লয়। লাজুক ও নিরীহ পাখী বলিয়াই ইহারা কোতোয়াল-ফিঙের আশ্রয়েই নিরাপদে থাকিতে পছন্দ করে।

একেবারে ইহাদের ৪।৫টি করিয়া ডিম হয়। ডিমগুলির রং ফিকে বেগুনি; মাঝে মাঝে লাল্‌চে ছিট্।

ময়না

হিমালয়ের পাদদেশ আলমোড়া হইতে আসাম-ব্রহ্মদেশ, মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর হইতে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও পশ্চিমঘাটের কানাড়ার উত্তর পর্য্যন্ত, পাহাড়িয়া জঙ্গলে 'ময়না'র (Grackle or Hill-Myna) জন্মস্থান। মান্দ্রাজের কোন কোন প্রদেশেও শালিক-বুলবুলির মত ইহারা পল্লীর আশে-পাশে চরিয়া বেড়ায়। সিংহলেও এই পাখীকে দেখা যায়।

ময়নার মাথা ও গায়ের বেশীর ভাগ পালক চক্‌চকে কালো ; ডানার শেষের কয়েকটি পালকের মাঝামাঝি সাদা, কিন্তু ডানা না মেলিলে, সকল সময় তাহা দেখা যায় না ; ঠোঁট কমলা-লেবুর রংএর মত লাল এবং পা ফিকে হল্‌দে। ইহাদের চোখের উপর হইতে মাথার দুই পাশে কানের মত দুইটি বস্তু বাহির হয় ; ঐ গুলির রং কোন কোন জাতের সাদা, কোন কোন জাতের হলদে। এই জন্যই 'রূপাকানী' ও 'সোনাকানী' ময়না নামের সৃষ্টি হইয়াছে।



ময়না

ইহারা বেশ পোষ মানে ; পোষা অবস্থায় ময়না যেমন কথা বলিতে শিখে, সেরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে খুব কম পাখীকেই দেখা যায়। শুধু কথা নয়—মানুষের হাসি, কান্না, হাঁচি ও কাসির ইহারা এমন অবিকল নকল করিতে পারে যে, তাহা কোন পাখীর পক্ষে সম্ভব বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না।

পোকা-মাকড়, ফল-শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য ; পোষা-ময়না ভাত ও ছাতু খুব পছন্দ করে।

ইহারা খড়-কুটা দিয়া গাছের ফোকরে বা পাহাড়ের ফাটলে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাসের ভিতর বাসা তৈয়ারি করে। একবারে ইহাদের ২৷৩টি ডিম হয় ডিমের রং নীল্‌চে।

ভাটশালিক

শালিক (Common Myna) ময়নার জাত ভাই। হিন্দিতে শালিককেও ময়না বলে।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ভাটশালিক আছে! বাঙ্গলাদেশে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী। বন-জঙ্গল অপেক্ষা ইহারা পল্লীর আশ-পাশে বাস করিতে ভালবাসে। কাক-চিল-চড়াই-এর মতন ইহারাও মানুষের বসতির মধ্যে বাস করে।

ইহাদের মাথা, ঘাড়, গলা ও বুকের কতকটা চক্‌চকে কালো ; ডানা ও লেজের বাহির পিঠ্ গাঢ় খয়েরি : ডানার শেষদিকের দুই একটি পালক সাদা ; লেজের শেষদিক্‌ও সাদা : ঠোঁট গাঢ় হল্‌দে এবং পা ফিকে হল্‌দে। চলিবার সময় প্রতি পদক্ষেপে ইহাদের মাথা উঁচু-নীচু হইতে থাকে।


ভাটশালিক

শালিক পাখী দুই দুইটি বা চারি চারিটি করিয়া এক একদিকে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। পোকা-মাকড় ইহাদের প্রধান খাদ্য হইলেও, ঐ সকলের অভাবে অনেক সময় ইহাদিগকে ফল ও শস্য খাইতেও দেখা যায়। পোষা শালিক ভাত ও ছাতু খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

শালিক পাখী এক গাছে অনেকগুলিতে একসঙ্গে রাত্রি যাপন করে, কিন্তু বেশ মিলিয়া-মিশিয়া চুপচাপ্ থাকা ইহাদের স্বভাব নহে। সন্ধ্যাকালে বাসায় ফিরিয়া এবং ভোরবেলা বাসা ছাড়িবার সময় ৫।৭ কুড়ি শালিক মিলিয়া যে ভয়ানক চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দেয়, তাহা সহ্য করিবার মত কান খুবই অল্প আছে। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা সমানভাবে 'ক্যাঁচর্'—'ক্যাঁচর্' চলিতে থাকে। কোন কারণে ভয় পাইলেও শালিক পাখীর আওয়াজ খুব কর্কশ হইয়া উঠে ; ইহাদের স্বাভাবিক স্বর কিন্তু মন্দ নয়। পোষা অবস্থায় শিখাইলে ইহারা অনেক কথাই শিখিতে পারে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের ছানা হয়। গাছের কোটরে, ছাদের ফোকরে, দেওয়ালের ফাটলে, খোড়ো ঘরের চালে এবং গাছে-বাঁধা কলসির ভিতরে ইহারা বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৪।৫টি, রং নীল্‌চে সবুজ।

গাং-শালিক

গাং-শালিকের (Bank Myna) গায়ের বেশীর ভাগ পালকই ধূসর ; মাথা ও ঘাড় চক্‌চকে কালো, চোখ লাল্‌চে ; ঠোঁটের গোড়া লাল, শেষদিক্ হল্‌দে ; এবং পা ফিকে হল্‌দে। ভাটশালিক অপেক্ষা ইহারা আকারে কিছু ছোট। স্থানবিশেষে ইহাদের 'রাম শালিক'ও বলে।

গঙ্গা প্রভৃতি নদীর ভাঙন-পাড়ে ইহাদিগকে খুব বড় বড় ঝাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে খড়-কুটা সাজাইয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং একবারে ৩ হইতে ৫টি ফেকাসে নীল রঙের ডিম পাড়ে। অন্যান্য শালিকের মত ইহারাও বেশ কথা বলিতে পারে।

গো-শালিক

ভাটশালিক ছাড়া এদেশে আর যে কয় রকম শালিক আছে, তাহাদের মধ্যে 'গো-শালিক' (Pied Myna) ও গাং-শালিক' বিশেষ পরিচিত। গো-শালিক ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দিতে ইহাদের 'আবল্‌কা ময়না' বলে। ইহারা ভাটশালিকের মত মানুষের বসতির কাছে বাস করিলেও একটু খোলা জায়গায়—মাঠ, ঘাটই পছন্দ করে বেশী।

ইহাদের মাথা, ঘাড়, গলা, পিঠ্, লেজ ও ডানার বেশীর ভাগ কালো; চোখের চারিপাশ, বুক, পেট এবং ডানার বাকি অংশ সাদা। এই পাখীর ঠোঁটের গোড়ার দিক্ লাল, শেষদিক্ হল্‌দে; এবং পা ফিকে হল্‌দে।

ভাটশালিকের মত ইহারাও দলে দলে বাস করে, কিন্তু ইহাদের এক এক দলে ৮।১০টির বেশী পাখী দেখা যায় না। অনেক সময় কেবল স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে চরিয়া বেড়ায়। পোকা-মাকড় ও ফল-শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। কখন কখন ইহাদের ভাটশালিকের সহিত একই সঙ্গে সহর বা পল্লীর প্রান্তে আস্তাকুঁড়ের উপর বা গোচারণ-মাঠে পোকামাকড় খাইতে দেখা যায়।


গো-শালিক

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে গো-শালিকের ছানা হয়। খড়-কুটা, ঘাস প্রভৃতি দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ারি করিয়া ইহারা এক একবারে ৩।৪টি করিয়া ডিম পাড়ে; ডিমের রং চক্‌চকে নীল।

ছোটবেলায় পুষিলে ইহারাও বেশ পোষ মানে এবং যত্ন করিয়া শিখাইলে অনেক কথাই আওড়াইতে পারে।

বাবুই আদি

বাবুই

বাবুই-পাখী (Common Weaver-bird or Baya) দেখিতে অনেকটা স্ত্রী-চড়াই-এর মত; ইহাদের পালকের রং কিন্তু আরো বেশী ফিকে। আকারেও

বাবুই একটু ছোট ; চড়াই অপেক্ষা ইহাদের চঞ্চু এবং লেজ অল্প ছোট।

বাবুই নানা জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের কয়েক জাতি আমাদের দেশে বাস করে। তাল, খেজুর, বাবলা প্রভৃতি গাছে ইহারা এমন আশ্চর্য্য কৌশলে বাসা তৈয়ারি করে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কাপড় বুনিতে মানুষে যেমন সূতার 'টানা' ও 'পড়েন' দেয়, ইহারাও তেমনি তাল, নারিকেল ও খেজুর পাতা ঠোঁটে চিরিয়া অথবা সরু সরু লম্বা ঘাস লইয়া, টানা ও পড়েন দিয়া বাসা তৈয়ারি করে। এক একটি বাসা লম্বে ১½ হাতের কম নয়। বাসাগুলি যখন গাছে গাছে ঝুলিতে থাকে, তখন দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন জল রাখিবার ছোট ছোট মসক ঝুলিতেছে। কোন কোন গাছে অনেক সময় ৩০।৪০টি বাসাও দেখা যায়; ভিতরে প্রবেশ করিবার দরজা বাসার নীচের দিকে থাকে বলিয়া বাবুই পাখী বৃষ্টি-বাদলে কষ্ট পায় না। অনেক সময় ঘরের চাল হইতেও ইহাদের বাসা ঝুলিতেছে, দেখা যায়।



বাবুই পাখীর বাসা

বাবুই ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে। নানা রকম শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য ; অভাবে ইহারা কীট-পতঙ্গও খায়। একবারে ইহাদের ২ হইতে ৪টি করিয়া ডিম হয়; ডিমগুলির রং সাদা। বাচ্ছাবেলায় ছোট ছোট পোকাই ইহাদের একমাত্র খাদ্য।

মুনিয়া

মুনিয়া (Munia) বাবুই-গোষ্ঠীরই পাখী; ইহারা প্রায় ৩০।৩২ জাতিতে বিভক্ত। দেখিতে টুনটুনির মত ছোট হইলেও ইহাদের পালকের সৌন্দর্য্যের কাছে এমন কি, আমেরিকার কয়েক জাতীয় হামিং- বার্ড্‌কেও হার মানিতে হয়। এই পাখীর ঠোঁট খুব মোটা, ডানা ও লেজ ছোট এবং লেজের শেষদিক গোল।

পৃথিবীর নানা স্থানেই মুনিয়া আছে। ইহারা খুব বড় বড় দলে ঝাঁক বাঁধিয়া বাস করে। আমাদের দেশে এক এক জায়গায় এত বেশী মুনিয়া দেখা যায়



মুনিয়া

যে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। আমাদের দেশে যে কয়েক জাতিকে বেশী দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে 'নকল নুর' (Black-headed Munia), 'শাঁখারি মুনিয়া' (White-backed Munia) 'শিনবাজ' বা 'তেলে মুনিয়া' (Spotted Munia) এবং 'সর মুনিয়া'ই (White-throated Munia) প্রধান। এই জাতীয় আরেক রকম (Amandava) পাখী; 'লাল মুনিয়া'ও (Wax-bill) আমাদের দেশে খুব বেশী দেখা যায়।

নানা রকম ছোট ছোট শস্য ও শস্যের কণা ইহাদের একমাত্র খাদ্য।

চড়াই

চড়াই (House-Sparrow) আমাদের এত পরিচিত পাখী যে, ইহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালাবার-উপকূল



চড়াই

এবং আর কয়েকটি বৃষ্টিপ্রধান স্থান ভিন্ন, ভারতবর্ষের কি সহর, কি পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই যথেষ্ট চড়াই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে মানুষ, সেইখানেই এই পাখী। ইহারা দেওয়ালের গর্ত্তে, ছাদের কার্ণিসে, কড়ি-বরগার ফাঁকে অথবা খড়ের চালে— যেখানে একটু আশ্রয় পায়, সেইখানেই বাসা তৈয়ারি করে। মানুষের কাছে থাকিতে থাকিতে ইহাদের সাহস

এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, লোকজনের খুব কাছে আসিতে, এমন কি থালা হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেও ইহারা ভয় পায় না। পল্লীগ্রামে ঘোরো চড়াই, মেঠো-চড়াই, প্রভৃতি কথার চলন দেখা যায়। এ সব কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের পরিচায়ক নহে। একই জাতীয় পাখীর কতকগুলি ঘরে থাকে, এবং কতকগুলি শস্যের ক্ষেতে গিয়া কেবলমাত্র আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ইহারা কখনো স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে, কখনো বা দলে দলে বাস করে। বৎসরে ইহাদের ৩।৪ বার বাচ্ছা হয়; ডিম পাড়িবার সময় আসিলেই বাসার দখল লইয়া দুই তিন পরিবারের মধ্যে প্রায়ই লড়াই বাধিয়া যায়। অন্য সময় ইহারা বেশ মিলিয়া-মিশিয়া থাকে। ইহারা একসঙ্গে তিন হইতে পাঁচটি ডিম পাড়ে এবং ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটিতে ১৪ দিন সময় লাগে।

ক্যানারি

ক্যানারি (Canary) চটক-গোষ্ঠীরই পাখী। সর্ব্বপ্রথম 'ক্যানারি' নামক দ্বীপপুঞ্জে এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, সেইজন্যই ইহাদের নাম হইয়াছে ক্যানারি পাখী। বর্ত্তমানে যে পোষা ক্যানারি পাখী দেখা যায় তাহাদের গায়ের রং হল্‌দে; কিন্তু পিঠ্ অপেক্ষা পেটের দিক্ ফিকে। পূর্ব্বে বন্য অবস্থায় ইহাদের গায়ের রঙ ধূসর-পাট্‌কিলে ছিল। মানুষ ইহাদের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া নানারূপ সংমিশ্রণে বর্ত্তমানরূপে পরিণত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতেই এই পাখীকে প্রথম মানুষ পোষা আরম্ভ করে।



ক্যানারি

ক্যানারি খুব বড় বড় দলে ঝাঁক বাঁধিয়া বাস করে। গায়ক পক্ষীদের মধ্যে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে। যে গৃহে একটি পাখী থাকে, তাহার আশ-পাশ অনেক

দূর পর্য্যন্ত উহার গানের ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠে; কিন্তু পোষা অবস্থায় ইহারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুরে অন্যান্য পাখীদের সঙ্গীত নকল করিয়া গান গাহিতে পারে, বুনো অবস্থায় সেরূপ পারে না। শিক্ষা দিলে, ইহারা অনেক রকম ক্রীড়া-কৌতুকও দেখাইতে পারে। বন্য অবস্থায় এই পাখী ঘন গাছ-পালার মধ্যে বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের ডিমের রং নীল্‌চে সবুজ, তাহার উপর লাল্‌চে ছিট্। চড়াই-এর ন্যায় ইহারাও বৎসরে তিন চারিবার ডিম পাড়িয়া থাকে।

চাতক

চাতক (Common Swallow) প্রায় সকল দেশেই আছে। এমন কি, মেরু-প্রদেশেও চাতক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা খুব বেশী শীত কিংবা খুব বেশী গরম সহ্য করিতে পারে না; তখন যে স্থান সুবিধাজনক মনে করে, সেইখানে গিয়াই বাস করে। হিন্দিতে চাতককে 'আবাবিল' বলে।

ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। কোন কোন জাতির পালকের রং কালো ও বেগুনিতে মেশানো, কোন কোন জাতি কালো ও ধূসর, আবার কোন কোন জাতি নীল্‌চে বেগুনি।

ইহাদের ঠোঁট ছোট ও চ্যাপ্টা, ডানা কাস্তের মত বাঁকা, ডানার 'কুইল' পালকগুলি খুব বড় বড়; পা ছোট ও দুর্ব্বল এবং লেজ বেজায় লম্বা; লেজের শেষ পালক দুইটি অন্যান্য পালকের চাইতে প্রায় ৭।৮ ইঞ্চি বড়। চাতকের ডানা ও লেজের গড়ন দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইবার জন্যেই ইহাদের সৃষ্টি।

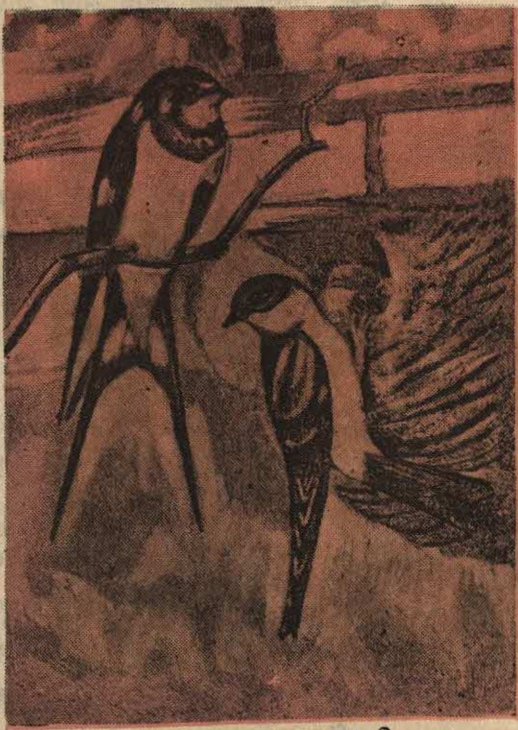
চাতক দেশভ্রমণকারী পাখী। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে ইহারা শীতপ্রধান দেশে চলিয়া যায়। গরম দেশে শীত পড়িতে আরম্ভ হইলে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেশে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস হইতে চাতক দেখিতে পাওয়া যায়। শীতের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া আবার সরিয়া পড়ে।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেওয়ালের গর্ত্তে অথবা কার্ণিসের উপরে মাটি দিয়া বাসা তৈয়ার করে, কতকগুলি অন্যান্য পাখীর মত ঘাস, খড়, পালক প্রভৃতি দিয়া বাসা বানায়, আর কতকগুলি কোন রকম বাসা না বাঁধিয়া গাছের কোটরে কিংবা নদীর ধারে গর্ত্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। একবারে ইহাদের তিন হইতে পাঁচটির বেশী ডিম হয় না, ডিমের রং সাদা, মাঝে মাঝে লাল্‌চে-কটা ছিট্।

চাতকের প্রধান খাদ্য পতঙ্গ, উড়িতে উড়িতেই ইহারা পতঙ্গাদি শিকার করিয়া থাকে। সময় সময় চাতক এত উঁচুতে উঠে যে, সহজ চোখে দেখাই

যায় না। মেঘ্‌লা দিনেই ইহাদের উড়িবার ও শিস্ দিবার উৎসাহ খুব বাড়িয়া যায়। তখন ঘন ঘন শিস্ দিতে থাকে।

চাতকের স্বর মিষ্ট, কিন্তু আমরা যে—'ফ — টি—ক্ জল',—'ফ—টি—ক্ জল' শুনিতে পাই, উহা প্রকৃত চাতকের শিস্ নহে, ছাতারে ও বুলবুলের মাঝামাঝি, বুলবুলের অন্তর্গত এক জাতীয় খুব ছোট পাখী, ঐ ভাবে শিস্ দেয়। উহাকে ইংরাজিতে 'আয়োরা' (Iora) বলে। অনেকে ভুল করিয়া চাতক ও ফটিক জলকে একই পক্ষী ভাবিয়া থাকেন। আসলে কিন্তু তাহা নয়, উহারা ভিন্ন বংশীয় পক্ষী।


চাতক নাকুটি

চাতকের খুব নিকট জ্ঞাতি, 'মার্টিন'কেও (Martin) আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নদীর ধারে ধারে, পাহাড়ের বা পাথরের খোঁদলে বাসা করিয়া থাকে। লম্বে ইহারা সাড়ে চার বা পৌনে পাঁচ ইঞ্চির বেশি হয় না।

নাকুটি

নাকুটি (Swift) চাতক-বংশীয় পাখী এবং দেখিতে প্রায় চাতকেরই মত। ইহাদের ডানার কুইল্ পালকগুলি লেজ ছড়াইয়া আরও খানিক বাহির হইয়া পড়ে। চাতকের মত ইহাদের লেজ বড় হয় না।

এই পাখীর মাথা, পিঠ্, ডানা এবং লেজের বাহিরদিক্ ধূসর ও কটায় মেশানো; গলা ও বুক ফিকে ধূসর এবং পেট্ ও লেজের ভিতরদিক্ সাদা।

বড় বড় নদীর চরে গর্ত্তের মধ্যে ইহারা বাসা তৈয়ারি করে এবং প্রায় সর্ব্বদাই ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী। চাতকের

মত শীতকালে এদেশে থাকিয়া, গ্রীষ্মের সময় ইহারাও অন্যত্র চলিয়া যায় নাকুটির ডিমের রং সাদা। ইহারা দুইটি হইতে চারিটি ডিম পাড়ে।

এই বংশের কোন কোন কোন পাখী সমুদ্রের তীরে তালগাছ প্রভৃতিতে বাসা তৈয়ারী করিয়া বাস করে। লোকে তাহাদিগকে 'তালচঞ্চু' বা 'তালচটক বা তালচাটা' (Palm Swift) বলিয়া থাকে।

হামিং-বার্ড

হামিং-বার্ডের (Humming-Bird) জন্মস্থান উত্তর-আমেরিকা ; আমেরিকার কেবল গ্রীষ্মপ্রধান বিভাগেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় ৪০০ জাতিতে বিভক্ত। ডানা ও বুকের গঠনের জন্য ইহাদের নাকুটির নিকট জ্ঞাতির মধ্যে পণ্ডিতগণ ভুক্ত করিয়াছেন।



নানা জাতীয় হামিং-বার্ড

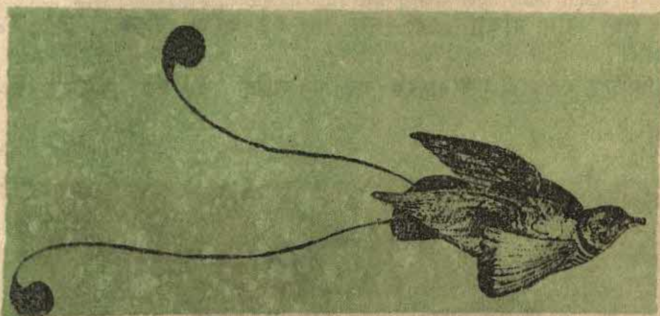
এই পাখী আকারে খুব ছোট। ইহাদের মধ্যে যাহারা বড় (Patagonagas), তাহারা লম্বে ৮ ইঞ্চির বেশী নহে ; যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট (Mellisuga minima) তাহারা এক একটি ভ্রমরের মত। যখন এই পাখী উড়িতে উড়িতে ফুলে ফুলে মধুপান করিতে থাকে, তখন ইহাদের ডানা হইতে গুন্ গুন্ শব্দ বাহির হয়। এই শব্দের অনুকরণেই ইহাদের নাম হইয়াছে 'হামিং-বার্ড'।

ইহাদের কোন কোন জাতির ডানা ছোট ও দুর্ব্বল ; সেই জন্য তাহারা বেশীক্ষণ ধরিয়া উড়িতে পারে না ; বেশীর ভাগ পাখীর ডানায় কিন্তু খুব জোর ; তাহারা সারাদিনই প্রায় উড়িয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ যাহারা বড় জাতীয় তাহাদেরই ডানার জোর দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

আকারে ছোট হইলেও হামিং-বার্ডের সর্ব্বাঙ্গ অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভরা। যখন হাজার হাজার পাখী একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িতে থাকে, তখন চক্ষুর উপর দিয়া যেন আলোকের তরঙ্গ বহিয়া যায়! মনে হয়, যেন উজ্জ্বলবর্ণ রামধনু শত শত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, অথবা বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য চুণী, পান্না ও হীরকের টুক্‌রা প্রজাপতির মনোরম পক্ষ ধারণ করিয়া শূন্যে বিচরণ করিতেছে!

হামিং-বার্ডের প্রধান খাদ্য কীট-পতঙ্গ ; কিন্তু তাহা হইলেও, ইহারা প্রজাপতির মত নাচিয়া নাচিয়া ফুলের মধু পান করিতে খুব ভালবাসে। ইহাদের ঠোঁট লম্বা এবং জিভ্ এমন ভাবে তৈয়ারি যে, ইহারা ইচ্ছা করিলে তাহা বাড়াইতে, কমাইতে ও এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে পারে। ফুলের কোরকের মধ্যে সরু ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া ইহারা জিভ্ দিয়া মধু পান করিয়া থাকে।

এই পাখী দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদের বাসাগুলিও তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মখমলের মত কোমল শেওলা এবং সরু সরু পালক ও তূলা



দীর্ঘপুচ্ছ হামিং-বার্ড্

দিয়া ছোট ছোট বাসা তৈয়ারি করিয়া, ইহারা একবারে ২টি মাত্র সাদা রঙের ডিম পাড়ে।

হামিং-বার্ড বেশ পোষ মানে। পোষা পাখীর তো কথাই নাই, বুনো পাখী ধরিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিলে, অনেক সময় তাহারাও আবার ফিরিয়া আসে।

হামিং-বার্ডেরই নিকট সম্পর্কীয় এক জাতি (Nectariniidæ) আমাদের দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় তাহাদিগকে 'মধুপায়ী' (Honey-Suckers বা Sun-birds) বলে। ইহারা ফুলের মধু খাইয়াই জীবনধারণ করে।

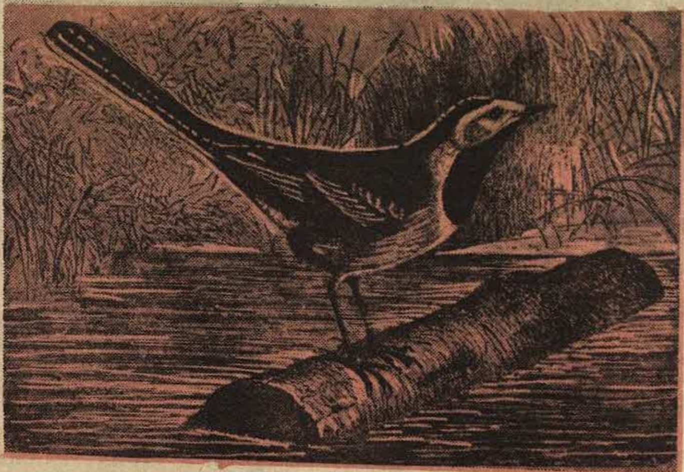
আমাদের দেশে ইহাদের জ্ঞাতি আরেক জাতীয় পক্ষী আছে, উহাদের নাম 'ফ্লাওয়ার-পেকার' (Flower-pecker)। সুন্দরবন, মধ্যভারত, আসাম ও আরাকানের জঙ্গলে ইহাদের দেখা যায়। ইহারাই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ছোট পাখী ; লেজ শুদ্ধ লম্বে ইহারা তিন ইঞ্চি বা উহার এক সূতা উর্দ্ধে হইয়া থাকে। ফুলের মধু ছাড়া, ইহারা ফলসা জাতীয় ছোট ছোট ফল খাইয়াও থাকে।

খঞ্জন

খঞ্জন (Wagtail) প্রধানতঃ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বাস করে। ইহারা ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকমের হইয়া থাকে। শীতকালে এক ভারতবর্ষেই কমপক্ষে

১২।১৩ রকম খঞ্জন দেখা যায়। সচরাচর আমরা যে দুই জাতীয় খঞ্জন দেখিতে পাই, তাহাদের এক জাতির (White Wagtail) কপাল ও মাথার দুই পাশ সাদা ; মাথার পিছনদিক্, গলা, এবং বুকের কতকটা কালো। ইহাদের গায়ের আর সব পালক ধূসর। অপর জাতির (Grey Wagtail) মাথা, পেট হল্‌দে ; বাকি অংশ ধূসর। ইহা ছাড়া আরেক জাতীয় (Pied Wagtail) খঞ্জনও আমাদের দেশে মন্দ দেখা যায় না। ইহারা দেখিতে দোয়েল পাখীরই মতন, কালো আর সাদায়! কেবলমাত্র ইহাদের ভ্রূর উপর সাদা রেখা টানা থাকে।

খঞ্জন দেখিতে যেমন ছিপ্‌ছিপে, ইহাদের স্বভাব তেমনি চঞ্চল। এই পাখীর ঠোঁট সরু, পা লম্বা, ডানা মাঝারি এবং লেজ বেশ বড় হইয়া থাকে। ক্রমাগত লেজ নাচাইতে নাচাইতে ইহারা খাবারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য।



খঞ্জন

খঞ্জন এমন ক্ষিপ্রতার সহিত মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া কীট-পতঙ্গ ধরে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নদীতে যখন ঢেউ উঠে, তখন জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া জলজ কীটাদি ধরিয়া খাইতেও ইহারা অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয়। ইহারা আবার খুব লাজুক পাখীও নয়। অনেক সময় নদী বা ঝিলের ধারে ধোপারা যেখানে পাটার উপর কাপড় কাচে, তাহার নিকটে কাচার সময় ইহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এইজন্যই বোধহয় হিন্দিতে ইহাদের 'ধোবিন' বলে।

গাছ-পালার শিকড়ের মধ্যে, নদীর ধারে ঝুপীর ভিতরে অথবা এই রকম

কোন লুকানো স্থানে ইহারা ঘাস, খড়, শেওলা, পালক প্রভৃতি দিয়া অতি সুন্দর বাসা তৈয়ারি করে। এক একবারে ৪।৬টি করিয়া, বৎসরে ইহাদের ৩।৪ বার ছানা হয়; ডিমের রং ফিকে সবুজ।

খঞ্জনের স্বর বেশী উঁচু নয় বটে, কিন্তু বেশ মিষ্ট। ভোর হইতে না হইতে অনেক সময় ইহাদের সুমিষ্ট ডাক শুনিতে পাওয়া যায়।

ভরত পাখী

আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সব জায়গাতেই ভরত পাখী (Skylark) দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী (Indian Skylark) এবং নানা জাতিতে বিভক্ত। নানা জাতির মধ্যে আমাদের দেশের কয়েকটি জাতির হিন্দি নাম—চণ্ডুল (Crested Lark), বাগেরী (Social Lark), আগ্গিন (Singing Bush-Lark), ইত্যাদি।

ইউরোপে যে জাতি গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদের পিঠের দি়ক ঘন কটা, পেটের দিক্ ফিকে হল্‌দে; বুক ও পেট ছিট্‌যুক্ত; বুকের চাইতে পেটের ছিট্ বেশী হাল্‌কা। ভরত পাখী (Alauda gulgala) ঘন গাছ-পালা পছন্দ করে না। ঘাসে ভরা ছোট ছোট পাহাড়, মাঠ-ঘাট, পুকুরের পাড় এবং ধানক্ষেতের আল্ বা বাঁধ ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ইহারা প্রায়ই একা একা চবিয়া বেড়ায়, কিন্তু শীতকালে ইহাদিগকে ছোট ছোট দলেও বাস করিতে দেখা যায়। ইহারা কখনও জলে স্নান করে না। মাটিতে উলটপালট খাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ধুলা মাখিয়া ধুলা-স্নান করে।



ভরত পাখী

ভরত পাখীর গান খুব মিষ্ট। মাটি হইতে হঠাৎ গান গাহিতে গাহিতে ইহারা উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। কখনো কখনো এত উঁচুতে উঠে যে, সহজ চোখে দেখাই যায় না, অথচ ইহাদের সুমিষ্ট স্বর-লহরী কানে অমৃত ঢালিতে থাকে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের ছানা হয়। ইহারা একবারে ৩।৪টি ডিম পাড়ে। ডিমের রং সব্‌জেটে ধূসর; তাহার উপর কটা ছিট।

কাঠ-ঠোক্‌রা

কাঠ্‌-ঠোক্‌রা (Woodpecker) নানা রকমের হইয়া থাকে। অধিকাংশের শ্রী-ছাঁদ বেশ সুন্দর। মাথার রঙিন চূড়া এই পাখীর সৌন্দর্য্য অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে।



কাঠ ঠোকরা

বাঙ্গলাদেশে আমরা সচরাচর যে কয় রকম কাঠ্‌-ঠোক্‌রা দেখিতে পাই, তাহাদের এক জাত (Picus macei) লম্বায় ৬।৭ ইঞ্চির বেশী নহে; গায়ের বেশীর ভাগ পালকই কালো, তাহার উপর সাদা সাদা ডোরা এবং মাথায় লাল রঙের চূড়া (Indian Spotted Woodpecker)।

আর এক জাতের (Brachypternus bengalensis) পিঠের উপরিভাগ গাঢ় হল্‌দে, বাকি অংশ ক্রমশঃ হল্‌দে ও কালোতে মেশানো, গলার দুই পাশ সাদা, মাঝখানে ডোরা; বুকেও কিছু কিছু ডোরা আছে এবং লেজ কালো। ইহাদের (Golden-backed Woodpecker) পুরুষ জাতির মাথার ঝুঁটি খুব জমকালো। লম্বায় ইহারা প্রায় এক ফুট।

কাঠ্‌-ঠোক্‌রার ঠোঁট্‌ ও জিভ খুব লম্বা, পা জোরালো, নখ ধারালো এবং লেজের পালক বেশ শক্ত। গাছের গুঁড়িতে ও ফাটা ছালের ভিতরে পিঁপড়া, উই প্রভৃতি যে সব কীট বাস করে, তাহারাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। দুই পায়ে ও লেজে ভর দিয়া গাছের গায়ে খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া ইহারা ঠোঁট দিয়া কাঠের উপর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করিতে থাকে; সেই শব্দে ভয় পাইয়া পোকারা যেই বাহিরে আসে বা এদিক্‌, সেদিক্‌ পলাইতে থাকে, অমনি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। কাঠ-ঠোক্‌রা কিন্তু অন্য পাখীর মত ঠোঁট

দিয়া পোকা ধরে না ; ইহাদের জিভের আগায় আঠার মত পদার্থ থাকে, পোকা-মাকড় দেখিলেই লম্বা জিভ বাড়াইয়া তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া মুখের মধ্যে টানিয়া আনে।

বাসা বাঁধিবার জন্য কাঠ-ঠোক্‌রার খড়-কুটার দরকার হয়-না। শক্ত ও ধারালো ঠোঁট দিয়া গাছের গুঁড়িতে গর্ত্ত করিয়া ইহারা তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে ; ইহাদের ডিমের রং সাদা এবং ডিমের সংখ্যা তিনটি।

বসন্ত-বউরি বা বেনেবৌ

বসন্ত-বউরি (Crimson-breasted Barbet বা Coppersmith) খুব ছোট পাখী— লম্বে সাড়ে ৬ ইঞ্চির বেশী নহে। ইহাদেরই অপর নাম 'বেনেবৌ'। ইহাদের গায়ের পালক বেশীর ভাগ সবুজ ; মুখের দুই পাশ ও ডানার শেষ দিক্ হল্‌দে ; বুক টুক্‌টুকে লাল এবং ঠোঁট খুব মোটা ও কালো। বাঙ্গলার কোথাও কোথাও ইহাদিগকে 'বসন্ত গুড়্‌গুড়ি' বলে। ইহা ছাড়া আমাদের দেশে আরেক জাতীয় (Cyanops Asiatica) বসন্ত-বউরি দেখা যায়। তাহারা লম্বায় ৯ হইতে ১০ ইঞ্চি হয় এবং ইহাদের গলার রঙ উজ্জ্বল নীল। ইহাদের 'বড় বসন্ত-বউরি' (Blue-throated Barbet) বলে।

হিমালয় প্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় আর সব জায়গায় এবং সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বসন্ত-বউরি আছে। ইহারাও খুব বেশী বন জঙ্গল পছন্দ করে না ; পল্লীর আশে পাশে ছোট বড় গাছে, বাগান-বাগিচায়, এমন কি, সময় সময় ঘরের চালে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা রকম ফলই ইহাদের প্রধান খাদ্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল পাকিলে, ইহারা দলে দলে জড় হয় এবং ডালে ডালে লাফালাফি করিতে করিতে সেই ফল খাইয়া থাকে। ফলের অভাবে কখনো কখনো কখনো ইহাদিগকে পোকা-মাকড়ও খাইতে দেখা গিয়াছে।



বসন্ত-বউরি

এই পাখীর স্বর তেমন মিষ্ট নহে ; সারাদিন পাতার আড়ালে বসিয়া ইহারা সেকরার হাতুড়ী ঠোকার ন্যায় আপন আপন মনে---"ঠঙ্-ঠঙ্ ঠঙ্-ঠঙ্-ঠঙ্"—

শব্দে গান করে এবং সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা এমনভাবে একবার বামে একবার দক্ষিণে হেলাইতে থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, ইহাদের তালমান বোধ খুব বেশী।

টিয়া ও কাঠ্-ঠোক্রার মত ইহারা গাছের গুঁড়িতে গর্ত্ত করিয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং এক একবারে ২।৩টি করিয়া সাদা রঙের ডিম পাড়ে।

বৌ-কথা-কও আদি

বৌ-কথা-কও পরিবারভুক্ত কোন পাখীই—অর্থাৎ বৌ-কথা-কও, পাপিয়া এবং কোকিল, ইহারা নিজের বাসা বাঁধিয়া ডিমে তা' দিয়া বাচ্চা ফুটাইবার কষ্ট সহ্য করে না। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, অন্য পাখীর বাসায় লুকাইয়া ডিম পাড়িয়া পলায়ন করে। অপরে নিজের ডিম মনে করিয়া তা' দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের 'পরভৃৎ'-পক্ষী বলে। এই গোষ্ঠীর কয়েক জাতীয় পক্ষী আবার বাসা বাঁধিয়া নিজেরাই ডিম ফুটাইয়া থাকে।

বৌ-কথা-কও

বৌ-কথা-কও (Indian Cuckoo) লম্বে প্রায় এক ফুট। ইহাদের মাথা, ঘাড় ও পিঠ্ গাঢ় ধূসর ; গলা ও বুক ফিকে ধূসর ; পেট ধোঁয়াটে-শাদা, তাহার উপর ডোরা ডোরা। ছোটবেলায় এই পাখীর গায়ে সাদা ও কালো ফুট্‌কি দেখা যায়। ইংরাজিতে ইহাদেরই 'কুক্কু' বলে ; কোকিলের ইংরাজি 'কুক্কু' নয়।



বৌ-কথা-কও

এ দেশের সর্ব্বত্র না হইলেও অধিকাংশ স্থানেই বৌ-কথা-কও আছে। দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। গ্রীষ্মকালে নিম্নবঙ্গেও যথেষ্ট দেখা যায়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। শীতকালে একটি পাখীকেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন নানা রকম ফল পাকিয়া উঠে, তখন ইহারা ছোট ছোট দলে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দেখা দেয় এবং সুমিষ্ট 'বৌ-কথা-কও' রবে সকলের কর্ণ

শীতল করিতে থাকে। সেই ডাকের অনুকরণেই ইহাদের 'বৌ-কথা-কও' নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহারা ছোট ছোট পোকা-মাকড় এবং নানা রকম ফল খাইয়া জীবনধারণ করে। এই বংশের অন্যান্য পাখীর মত ইহাদের স্ত্রী-জাতিও অপর পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। ফিঙ্গা, টুনটুনি ও রেণের বাসায় ইহাদের ডিম পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় ইহারা ডিম পাড়িবার জন্য বাসা না পাইয়া শূন্যে উড়িতে উড়িতে ডিম পাড়িয়া যায়।

পাপিয়া

গ্রীষ্মকালে বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি পল্লী 'পাপিয়া'র (Hawk-Cuckoo) সুমিষ্ট 'চোখ-গেল' রবে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে। একবার ডাকিতে আরম্ভ করিলে, ইহারা সহজে থামে না; ক্রমশঃ উচ্চে স্বর চড়াইয়া একসঙ্গে ৫।৭ বার 'চোখ্ গেল' 'চোখ গেল' রবে পল্লীবাসীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পরে এইভাবে সারাদিনই ইহাদের গান চলে। এমন কি, রাত্রেও ইহাদের গানের বিরাম নাই। এইজন্যই ইংরাজিতে ইহাদের অপর নাম 'ব্রেণ-ফিভার বার্ড' (Brain-fever Bird)

পাপিয়া দেখিতে কতকটা শিক্‌রে পাখীর মত। ইহাদের মাথা, ঘাড় ও পিঠ্ ধোঁয়াটে-কটা। ডানা ও লেজের চাইতে গলা, বুক ও পেটের রং ফিকে। শিক্‌রে ভ্রমে কোন কোন পাখী ইহাদিগকে যথেষ্ট নির্য্যাতন করিয়া থাকে।

পাপিয়া বেশ শান্ত পাখী; অতি সহজেই পোষ মানে। পোষা পাখী যখন তখন ডাকে না বটে, কিন্তু বুনো পাপিয়ার ডাক শুনিলে, আর একদণ্ডও চুপ্ করিয়া থাকিতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ইহাদের ছানা হয়। কোকিলের মত ইহারাও অপর পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। সাধারণতঃ ইহারা ছাতারের বাসাতেই ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিমের রঙ নীল।

কোকিল

কোকিল (Koel) দেখিতে সুন্দর না হইলেও সু-কণ্ঠে ইহারা সকলকেই মোহিত করে। বৌ-কথা-কও, পাপিয়া এবং কোকিল, ইহাদের কাহারো স্ত্রী-জাতির ডাক কিন্তু একটুও মিষ্ট নহে। ভারতবর্ষের বাহিরে— সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশেও কোকিল আছে।

পুরুষ কোকিলের সর্ব্বাঙ্গ নীলাভ কালো; ঠোঁট ফিকে সবুজ; চোখ লাল এবং মুখের ভিতরটাও লাল। স্ত্রী-কোকিলের গায়ের পালক খয়েরি ও ধূসরে

মেশানো, তাহার উপর ছিট্ ছিট্ এবং ডানা ও লেজ ডোরাযুক্ত। লম্বে পুরুষ-জাতির চাইতে স্ত্রী জাতি ২ ইঞ্চি বড়।



কোকিল

একই গাছে অনেক সময় ৫।৭টা কোকিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে না ; প্রায়ই একা একা ঝুপীর মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের মুখে টুঁ শব্দটি নাই, কিন্তু উড়িতে আরম্ভ করিলে আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারে না,—ঘন ঘন ডাকাডাকি করিতে থাকে। অনেক সময় ভোরের বেলায়ও ইহারা সাড়া দেয় ; কিন্তু যে 'কু—উ—' 'কু— উ—' রবে কোকিল সকলকে মুগ্ধ করে, তাহা কেবল শীতের শেষে বসন্ত-কালেই শুনিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের ডাকের সময় অসময় নাই ; দিনেও ডাকে, রাতেও ডাকে, দিনের চাইতে রাতেই বরং বেশী করিয়া ডাকে। বসন্ত ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সেই মিষ্ট ডাকও শেষ হয়। বর্ষা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ইহারা ডাকিয়া থাকে বটে, কিন্তু ডাকের মিষ্টত্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে।



স্ত্রী-কোকিল

ডিম পাড়িবার সময় যতই কাছে আসে প্রায় সব পাখীতেই তত ব্যস্ত হইতে দেখা যায়। বাসার জায়গা ঠিক করা, খড়-কুটা সংগ্রহ করা, বাসাগুলি মনের মত করিয়া তৈয়ারি করা—এ সব কম হাঙ্গামা নয়। কোকিল-পাপিয়ারা কিন্তু এ সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত। চুরি করিয়া অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া আসা ছাড়া ইহাদের স্ত্রী জাতির আর কিছুই করিতে হয় না। এমন কি, বাচ্চা পালনের ভারও অন্য পাখীর উপরে !

তোমরা বোধ হয় জান, স্ত্রী-কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা একটা কাকের বাসায় সবগুলি ডিম না পাড়িয়া, কয়েকটা বাসায় একটি একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। নির্ব্বোধ কাক আপনার ডিমের সহিত কোকিলের ডিমে তা' দিয়া উহা ফুটাইয়া তুলে। ছোটবেলায় কোকিলের ছানা কাকের দ্বারাই পালিত হয়। ইহাদের ডিমের রঙ প্রায় কাকেরই মতন, কেবল আয়তনে ছোট।

তেলাকুচা, পেঁপে, কলা এবং বট ও অশ্বথের ফল ইহাদের প্রধান খাদ্য।

শুক আদি

এই পরিবার-ভুক্ত পাখীদের শরীরের বাঁধুনী বেশ দৃঢ় এবং গড়ন বেশ সুন্দর ; ঠোঁট খুব ধারালো ; উপরের ঠোঁট লম্বা ও বাঁকা, তাহার দ্বারা নীচের ঠোঁট প্রায় ঢাকা পড়ে ; জিভ্ ছোট, মোটা ও মাংসল ; ডানা ও লেজ বড় ; কোন কোন জাতের ডানা ও লেজ আবার শরীরের চাইতেও লম্বা ; পায়ে ৪টি করিয়া আঙ্গুল—১ম ও ৪র্থটি পিছনদিকে এবং ২য় ও ৩য়টি সম্মুখদিকে প্রসারিত। এইজন্য ইহারা ডালে চড়িতে এবং ডালের উপর তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিতে ইহারা মাঝে মাঝে ঠোঁটেরও সাহায্য লইয়া থাকে। ইহারা আবার একটি পায়ে, মানুষের হাতের মতন, খাদ্য লইয়া মুখে তুলিয়া খাইয়া থাকে ; ইহা অন্য কোন পাখীতে করে না।

শুকপাখী আকারে নানা রকমের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ছয়টি জাতিতেই ইহাদের বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাদের কোন কোন জাতি খুব বড়, কোন কোন জাতি মাঝারি, আবার কোন কোন জাতি নেহাৎ ছোট। গায়ের পালকের রং কোনটির খুব জমকালো, কোনটির বেশ সুন্দর, কোনটির বা একেবারে চাক্‌চিক্যহীন।

ইহারা শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গরম দেশই বেশী পছন্দ করে। ফল, পাতা কুঁড়ি ও নানারকম শস্য ইহাদের খাদ্য।

শুকপাখীর স্বাভাবিক স্বর কর্কশ, কিন্তু ভাল রূপ শিখাইতে পারিলে, ইহাদের কোন কোন জাতি বেশ কথা বলিতে ও নানা প্রকার শব্দের সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

আমাদের দেশে তোতা বা কাকাতুয়া জাতীয় (Parrot) পাখী নাই, কেবল টিয়া জাতীয় (Parakeet) পাখীই আছে। তবে এই পরিরারের অন্তর্গত এক জাতীয় পাখী আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা তোতার খুবই নিকট সম্পর্কীয় ; ইহাদের বাঙ্গলায় 'লটকন্' (Loriculus. vernalis) বলে।

এই পরিবারের সব পাখীরই ডিমের রঙ সাদা হইয়া থাকে।

টিয়া

এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া নানা জাতীয় টিয়ার (Parakeets) জন্মস্থান। ইহাদের বেশীর ভাগের গায়ের পালক সবুজ এবং ঠোঁট টুকটুকে লাল। মাঝে মাঝে গোলাপী, কটা এবং ধূসর রং-এর টিয়াও চোখে পড়ে, ইহাদের উড়িবার শক্তি খুব বেশী। কিন্তু ভালরূপ উড়িতে পারে না, অষ্ট্রেলিয়াতে এমন টিয়াও আছে। তাহারা ফেঝ্যান্ট্ প্রভৃতি পাখীর মত দলে দলে মাটিতে চরিয়া বেড়ায় এবং ভয় পাইলে, তাড়াতাড়ি ফাঁকা মাঠ হইতে ঝুপীর মধ্যে গিয়া লুকায়।



ভারতবর্ষে যে কয় রকম টিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে টিয়া (Rose-ringed Parakeet) ছাড়া চন্দনা (Alexandrine Parakeet), কাজলা (Red-breasted Parakeet), ফুলটুসী (Blosom-headed Parakeet), মদনা (Slaty-headed Parakeet), এবং ফৈরিদি আমাদের খুব পরিচিত। ফৈরিদি (Rose-headed Parakeet) ছাড়া আর সবগুলিই আকারে বেশ বড়। ইহাদের কোন কোন জাতের ডানার কতকটা লাল, কোন কোন জাতের গলায় লাল কাঁটি, কাহারো কাহারো বা বুকে লালের ছাপ্। গা-ভরা সবুজের উপর মাঝে মাঝে এই রকম লালের ছটা পাখীগুলির সৌন্দর্য্য যে কতখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রং-এর এই যে বাহার, ইহা কেবল পুরুষ পাখীতেই বেশী দেখা যায়।

ফৈরিদি সাধারণ টিয়ার চাইতে আকারে ছোট। তাহাদের গায়ে রং-এর তেমন চাক্‌চিক্য নাই বটে, কিন্তু তাহাদের মাথা, ঘাড়, পিঠ ও ডানার পালকগুলি এমন সুন্দর করিয়া থাকে থাকে সাজানো যে, দু-দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। এই পাখীর স্বভাব বেশ মিষ্ট।

টিয়াপাখী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। নানা রকম ফল ও শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেতে, খামারে ও ফলের বাগানে পড়িয়া ইহারা কৃষকের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। ডিম পাড়িবার সময় টিয়া পাখী কোনরূপ বাসা তৈয়ারী না করিয়া, গাছের কোটরে বা পাহাড়ের ফোকরে আশ্রয় লয়। একবারে ইহাদের ৩।৪টি ডিম হয়, সেগুলির রং সাদা। ছানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা মানুষ কিংবা পশু কাহারো সঙ্গে লড়িতে ভয় পায় না।

ম্যাক্

দক্ষিণ-আমেরিকার 'ম্যাক্' (Macaw) শুক-পরিবারের সব পাখীর চাইতে আকারে বড় এবং দেখিতে সুন্দর। লেজশুদ্ধ লম্বে ইহারা দুই হাত বা কখনও তাহার উর্দ্ধেও হইয়া থাকে। লাল, নীল, সবুজ ও সোনালি রং-এ ইহাদের বুক, পিঠ, ডানা এবং লেজ এমন রঞ্জিত যে, দেখিলেই মোহিত হইতে হয়।



ম্যাক্

ইহারাও দল বাঁধিয়া বিচরণ করে; আহারের চেষ্টায় যখন ঝাঁকে ঝাঁকে শস্যের ক্ষেতে ও ফলের বাগানে প্রবেশ করে, তখন কয়েকটা পাখী দূরে থাকিয়া পাহারা দেয়। হঠাৎ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, তাহাদের ইঙ্গিতমত সমস্ত দলই চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া পালায়। ইহাদের কর্কশ স্বর প্রায় এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়।

ধূসর তোতা



ধূসর তোতা

আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে ধূসর তোতার (Grey Parrot) বাস। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূসর, কেবল লেজ লাল ও ঠোঁট কালো। এই জাতীয় তোতা শুধু যে শোনা কথাই আবৃত্তি করে, তাহা নহে, অনেক সময় ইহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে বেশ বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তোতা জাতীয় পাখীদের মধ্যে এই পাখী শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্রই ইহাদের খুব আদর।

কাকাতুয়া

অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার কাছাকাছি কতকগুলি দ্বীপে নানা জাতীয় কাকাতুয়া (Cockatoo) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথায় বড় বড় ঝুঁটি থাকে। জাতি-ভেদে কোন কোনটার ঝুঁটি গোলাপী, কোন কোনটার লাল, কোন কোনটার বা হল্‌দে। কাকাতুয়ার ঝুঁটি স্বাভাবিক অবস্থায় মাথার পালকের সহিত মিলাইয়া থাকে। ইহারা কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তখন উহাকে খাড়া করিয়া তুলে। নিউগিনি প্রদেশে এক রকম কাকাতুয়া আছে, তাহাদের পালকের রং কালো এবং ঝুঁটি খুব জমকালো।



কাকাতুয়ার ঝাঁক

কাকাতুয়া খুব বড় বড় দলে বাস করে। অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে সময় সময় হাজার, দেড় হাজার কাকাতুয়াকে ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িতে দেখা যায়। যখন এইরূপ প্রকাণ্ড দল একসঙ্গে চীৎকার করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তখন দুই হাতে কাণ চাপিয়াও নিস্তার পাওয়া কঠিন।

যদি এক ঘরে দুই তিনটি পোষা কাকাতুয়া থাকে, তবে বার বার 'কাকাতুয়া' 'কাকাতুয়া' এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ইহারা খুব আমোদ পায়। সেখানে হঠাৎ কোন দর্শক উপস্থিত হইলে, ডাকের মাত্রা সপ্তমে চড়াইয়া যেন পাল্লা দিয়া এ উহাকে হারাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ইহাদের অনুকরণ-শক্তিও অদ্ভুত। কুকুর-বিড়ালের ডাকের ইহারা এমন সুন্দর নকল করে যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।



কাকাতুয়া

লালমোহন ও হীরামোহন কাকাতুয়ারই

জাত-ভাই। পুরুষ ও স্ত্রী-ভেদে ইহাদের রং ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পুরুষগুলি সবুজ, তাহাদিগকে 'হীরামোহন' বলে; আর স্ত্রীগুলি লাল, তাহাদিগকে 'লালমোহন' বলে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের চেহারাই বেশ সুন্দর। ইহারা অতি সহজে পোষ মানে এবং বেশ কথা বলিতে শিখে।

লাভ বার্ড

দক্ষিণ-আফ্রিকা 'লাভ্ বার্ড'-এর (Love-Bird) জন্মস্থান। লম্বে ইহারা ৫।৬ ইঞ্চির বেশী নহে। ইহাদের স্বভাব যেমন শান্ত-শিষ্ট, চেহারাও তেমনি সুন্দর। ইহাদের এক জাতিকে (Psittacula) দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়।



লাভ্ বার্ড

এই পাখী স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে সর্ব্বদাই এক সঙ্গে থাকে এবং নানা প্রকারে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। সেই জন্যই ইহাদের নাম হইয়াছে 'লাভ বার্ড' বা 'প্রেমিক পক্ষী'। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের একটি মরিয়া গেলে, অপরটি শোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কখন কখন অনাহারে শুকাইতে শুকাইতে প্রাণত্যাগ করে।

আমাদের দেশেও প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতীয় পাখী আছে। বাঙ্গলায় উহাদের 'লটকন' (Loriquet) বলে। ইহারা সাধারণতঃ ঘন জঙ্গলই ভালবাসে। রবার ও কফি চাষের বাগানে এদের বেশী দেখা যায়। তালগাছে বাঁধা রসের হাঁড়ি হইতে রস খাইতেও ইহারা খুব পটু। ইহারা অতি সহজেই পোষ মানে।

এই সব জাতি ছাড়া, আরেক জাতীয় পক্ষীকে 'প্রেমিক পক্ষীর' দল-ভুক্ত করা হইয়া থাকে, তাহাদের নাম 'বদরিকা' (Budgerigar)। ইহাদের আদি জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া। বন্দী অবস্থায় খাঁচার মধ্যেই ডিম দিয়া ছানা ফুটাইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের এখন সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

'প্রেমিক পক্ষী' এই নাম পক্ষী-ব্যবসায়ী এবং পক্ষী-পালকেরই দেওয়া, আসলে কোন বিশেষ পক্ষীর এই নাম না দেওয়াই ভাল।

নীলকণ্ঠ

এশিয়া ও আফ্রিকা 'নীলকণ্ঠ পাখী'র (Roller বা Blue Jay) জন্মস্থান। আমাদের দেশের নানা স্থানেই এই পাখী দেখা যায়, কিন্তু নিম্নবঙ্গে খুবই কম।

ইহাদের মাথা, ঘাড়, গলা ও বুকের কতকটা লাল্‌চে খয়েরি; ডানা ও লেজ

নীল; ডানার মাঝামাঝি বেগুনি ডোরা এবং চোখের পাতা হল্‌দে।

নীলকণ্ঠ বন জঙ্গল অপেক্ষা ফাঁকা স্থান বেশী পছন্দ করে। অনেক সময় ইহাদিগকে বাঁশঝাড়ের মাথায়, গাছের মরা ডালে, টেলিগ্রাফের তারের উপর এবং এই রকম সব খোলা জায়গায় বসিয়া পোকা-মাকড়ের জন্য অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। শিকার নজরে পড়িলে অমনি উড়িতে উড়িতে গিয়া ডিগ্‌বাজি খাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।



নীলকণ্ঠ

এই পাখীর মেজাজ খুব কড়া। নিজের নিজের সঙ্গী ছাড়া আর কোন পাখীর সহিত ইহাদের বনি-বনাও হইতে দেখা যায় না। স্বজাতি হউক বা ভিন্ন জাতিই হউক, বাসার কাছে যাহাকে দেখে, তাহাকেই তাড়া করিয়া কামড়াইতে যায় আর চীৎকারে দেশ মাতাইয়া তুলে।

ডিম পাড়িবার সময় ইহারা দেওয়ালের গর্ত্তে অথবা নালা-নর্দ্দমার ভিতরে আশ্রয় লয়। বর্ষার প্রথমেই ইহাদের ছানা হইয়া থাকে। ইহারা ৪।৫টি সাদা রঙের ডিম পাড়ে।

মাছরাঙা

'মাছরাঙা' (Kingfisher) নাই এমন দেশ পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ রকম মাছরাঙার কথা জানা গিয়াছে। লাল, নীল, সবুজ, খয়েরি প্রভৃতি রঙে অধিকাংশ পাখীর ডানা, লেজ ও চূড়া এমন সুন্দর করিয়া চিত্রিত যে, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে আমরা সচরাচর যেগুলিকে দেখিতে পাই, তাহাদের এক জাতির (Alcedo bengalensis) গায়ের বেশীর ভাগ পালকই নীল, লেজ গাঢ় নীল, পিঠের নীচের দিক্ ম্যাজেন্টা, চোখ লাল এবং ঠোঁট লম্বা ও কালো। লম্বে ইহার ৫।৬ ইঞ্চির বেশী হয় না। ইহাদিগকে 'ছোট মাছরাঙা' (Common Kingfisher বলে।

আর এক জাতির (Halcyon fuscus) মাথা খয়েরি, ডানা ও লেজ নীল, গলা ও বুক সাদা এবং পা ও ঠোঁট লাল। লম্বে ইহারা প্রায় ১ ফুট্। ইহাদিগকে 'সাদা-বুক মাছরাঙা' (White-breasted Kingfisher) বলে।



মাছরাঙা

জলাশয়ের পাশে কোন গাছের ডালে বসিয়া ইহারা মাছ প্রভৃতির সন্ধান করিতে থাকে। সুবিধামত গাছ না থাকিলে, জলে ভাসা ডাল-পালায় বসিয়া অথবা জলের উপর উড়িতে উড়িতেই শিকারের চেষ্টা করে এবং শিকার দেখিতে পাইলে অমনি তীরবেগে তাহার উপর গিয়া পড়ে। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

তৃতীয় আর এক জাতি (Ceryle rudis) মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তাহাদের গায়ে লাল, নীল, সবুজের নামগন্ধও নাই; শুধু সাদা ও কালো পালকে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। এমন কি, চুড়াটিতে পর্য্যন্ত অন্য কোন রং দেখা যায় না। ইহাদিগকে 'ফুট্‌কি মাছরাঙা' (Pied Kingfisher) বলে।

ইহাদের উড়িবার শক্তি অদ্ভুত। জলের ২০।২৫ হাত উপরে ঠিক একই জায়গায় স্থির হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া উড়িতে উড়িতে ইহারা লক্ষ্য স্থির করে; তার পর যখন ঝপাং করিয়া জলে পড়ে, একটি মাছ কিংবা চিংড়ি না লইয়া সহজে উঠে না।

মাছরাঙার প্রধান খাদ্য মাছ; কিন্তু ঝড়-বাদলের সময় ইহাদিগকে মাঠের কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খাইতেও দেখা গিয়াছে।

ইঁহারা মাটিতে ইঁদুর প্রভৃতির পরিত্যক্ত গর্ত্তে অথবা কোন সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা তৈয়ারি করে। জাতি-ভেদে ইহাদের ৪টি হইতে ৭টি পর্য্যন্ত ডিম হয়; ডিমগুলির রং লাল্‌চে।

ধনেশ

এশিয়া ও আফ্রিকা এই পাখীর জন্মস্থান। ভারতবর্ষের নানা স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 'ধনেশ' (Hornbill) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের স্বাভাবিক ঠোঁটের উপর আর একটি ঠোঁটের মত বস্তু উল্টাভাবে বসানো থাকে। জাতি-ভেদে কোন কোন ধনেশের এই অতিরিক্ত ঠোঁটটি এত ছোট যে, প্রায় দেখা যায় না; আবার

কোন কোনটির বা ইহা স্বাভাবিক ঠোঁটের মতই প্রকাণ্ড !

তোমরা হয় তো আশ্চর্য্য হইবে যে, ইহারা এত বড় ও এত মোটা ঠোঁটের ভার বহন করে কিরূপে ? কিন্তু আসল কথা এই,—দেখিতে প্রকাণ্ড হইলেও ইহাদের ঠোঁটের ভার অতি সামান্য। কারণ, উহা যতটা পুরু, তাহার সবটাই মৌচাকের ন্যায় খোপ কাটা এবং উহার ভিতর ও বাহিরের আবরণ কাগজের ন্যায় পাত্‌লা ; ধনেশের ঠোঁট্ কিন্তু বেশ শক্ত।



ধনেশ

ইহারা খাড়া ভাবে গাছে চড়িতে ও ডালে ডালে যে ভাবে ইচ্ছা লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে পারে। মাটিতে চরিবার সময় চড়াই পাখীর মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলাই ইহাদের স্বভাব।

ইহাদের স্বরও কর্কশ ; যখন ডাকিতে আরম্ভ করে, তখন আর তাহার বিরাম নাই। টুকানের মত ঠোঁটে ঠোঁট ঘসিয়া ইহারাও বিকট শব্দ করিয়া থাকে। ইহারা দুইটি তিনটি করিয়া সাদা রঙের ডিম পাড়ে। ইহারা গাছের কাণ্ডের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাসা বাঁধে এবং ডিম পাড়িবার সময় স্ত্রী-ধনেশকে ঐ বাসায় রাখিয়া পুরুষটি গর্ত্তের মুখ কাদা দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। খাদ্য সরবরাহ করার জন্য কেবলমাত্র ছোট একটি ছ্যাঁদা রাখে। ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার পর, মাটির প্রলেপ ভাঙিয়া স্ত্রী-ধনেশ বাহিরে আসে।

আফ্রিকার ধনেশ প্রায়ই মাংসাশী হইয়া থাকে। জীব-জন্তুর গলিত মাংসও তাহারা তৃপ্তির সহিত খায় ; সেইজন্য দুর্গন্ধে তাহাদের কাছে ঘেঁসা যায় না ; কিন্তু এশিয়ার ধনেশ নিরামিষভোজী ; নানা রকম ফল খাইয়াই তাহারা জীবন-ধারণ করে। ইহাদের ফল খাওয়ার ধরণটা বড় অদ্ভুত। গাছ হইতে ঠোঁটে করিয়া ফল পাড়িয়া, ফলটিকে শূন্যে ছুঁড়িয়া দেয় এবং পরে বিকটাকার হাঁ করিয়া সেটিকে লুফিয়া খায়।

এ দেশে ধনেশের মাংস মানুষের খাদ্যের মধ্যে গণ্য।

টুকান

মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকায় 'টুকান'-এর (Toucan) বাস। ইহাদের ঠোঁটের দিকে চাইলে অবাক্ হইতে হয়। পাখীগুলি আকারে যত বড়, তাহার চাইতেও যদি ছয় গুণ বড় হইত, তবেই এই ঠোঁট মানাইত।



টুকান

জাতি-হিসাবে এই পাখীর ঠোঁট ছোট, বড়, মাঝারি—নানা রকমের হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের ও ঠোঁটের রং খুব জমকালো ; গায়ের রং বরাবর একই রকম থাকে, কিন্তু ঠোঁটের রং মাঝে মাঝে ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে।

ধনেশের ন্যায় টুকানের ঠোঁটও যতটা পুরু, তাহার সবটাই মৌচাকের মত খোপ্-কাটা এবং উহার দুই দিকের আবরণও কাগজের মত পাত্‌লা। সেই জন্য এতবড় ঠোঁটের বোঝা বহিতে ইহাদের একটুও কষ্ট হয় না। ধনেশের মত ঠোঁট হইলেও পণ্ডিতগণের বিচারে টুকান 'হুপো'রই নিকট জ্ঞাতি।

ইহারা ছোট বড় দলে, গাছের ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের স্বর খুব কর্কশ। দলের সকলগুলাতে মিলিয়া যখন চীৎকার করিতে থাকে, তখন প্রায় এক মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঠোঁটে ঠোঁট্ ঘসিয়াও ইহারা এক প্রকার বিকট শব্দ করিয়া থাকে।

ঘুমের সময় টুকান এই প্রকাণ্ড ঠোঁট কাঁধের বড় বড় পালকের মধ্যে লুকাইয়া রাখে।

হুপো

আফ্রিকার উত্তরে, এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র 'হুপো' (Hoopoe) দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও হুপো আছে। বাঙ্গলাদেশে

ইহাদের একমাত্র শীতকালেই দেখা যায়। হিন্দিতে ইহাদের "হুদ্‌হুদ্‌" বলে।

জাতি ভেদে লম্বায় ইহারা ১০ হইতে সাড়ে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের ঠোঁট লম্বা ও বাঁকানো, ডানা গোল, লেজ বড়, পা ছোট এবং আঙুলের নখ খুব শক্ত।



হুপো

পালকের চাক্‌চিক্যে ইহারা কাঠ্‌-ঠোক্‌রার চাইতে কোন অংশে হীন নহে। ইহাদের মাথার উপর চূড়ার আকারে দুই সারি পালক শোভা পায়; এই সকল পালকের রং লাল্‌চে হলুদ—কেবল শেষদিক্‌ একটু কালো; মাথার দুই পাশ এবং ঘাড় ও বুক হল্‌দেটে বেগুনি। এই পাখীর ডানা ও লেজ ডোরাযুক্ত।

কীট-পতঙ্গ ও তাহাদের ডিম হুপোর একমাত্র খাদ্য। সাধারণতঃ ইহারা মাটিতে চরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে; আবার কাঠ-ঠোক্‌রার মত গাছের ফাটা ছালের মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলে কীটাদিও ধরিয়া থাকে। মাটি হইতে খুঁটিয়া খাইবার সময় ইহাদের ঝুঁটি মাথার ওপর পাতিয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু যেমনি উহারা সোজা বা উত্তেজিত হয়, অমনি উহাদের ঝুঁটি খাড়া হইয়া উঠে।

ঘাস, খড়, পালক ও পশুর লোম দিয়া গাছের ফোকরে, পুরাতন বাড়ীর বা মাটির দেওয়ালের ভাঙ্গা গর্ত্তে হুপো বাসা তৈয়ারি করে এবং একবারে ৪টি হইতে ৬টি পর্য্যন্ত ফিকে নীল রঙের ডিম পাড়িয়া থাকে।

পোষ মানাইলে ইহারা অতি সহজেই পোষ মানে এবং পালকের খুব অনুগত হয়।

ঠুক্‌ঠুকিয়া

'ঠুক্‌ঠুকিয়া'র (Nightjar) চেহারা অনেকটা পেঁচার মত, কিন্তু পেঁচার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ দেখিতে প্রায় একই রকম, কেবল পুরুষ জাতির ডানার কতকটা ও লেজের শেষদিক্‌ সাদা। এই পাখীর ঠোঁট খুব চওড়া; তাহার উপরে ও নীচে বড় বড় লোম জন্মে।



ঠুক্‌ঠুকিয়া

দিনের বেলায় ইহারা প্রায়ই বাহির হয় না ; সন্ধ্যা হইয়া আসিলে, অল্প অল্প অন্ধকারে বাহির হইয়া নানা রকম কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। যে সকল পোকার অত্যাচারে ক্ষেতের শস্য ও গাছের ফল-পাকুড় রক্ষা হওয়া ভার, ঠুক্‌ঠুকিয়া সেই সকল পোকার যম। সুতরাং কৃষকের এমন উপকারী বন্ধু আর নাই বলিলেই হয়।

ইহারা রীতিমত বাসা তৈয়ারি না করিয়া, কোন নির্জ্জন স্থানে মাটির উপরেই ২টি করিয়া ডিম পাড়ে ; সেই ডিমের রং ফিকে লাল, তাহার উপর পাট্‌কিলের ছিট্‌।

পেঁচার ডাক শুনিলে নানা দেশের অজ্ঞ লোকে যেমন ভয় পায়, ঠুক্‌ঠুকিয়ার ডাকেও সেইরূপ ভয় পাইয়া থাকে। সেই ডাকের অনুকরণেই ইহাদের নাম হইয়াছে 'ঠুক্‌ঠুকিয়া'।

মাংসাশীবর্গ

পেচক, শকুন, বাজ, ঈগল, চিল ইত্যাদি এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই মাংসাশী। ইহাদের কেহ পশু বা পক্ষী শিকার করিয়া খায়, কেহ বা গলিত পচা ধ্বসা মৃতজীব খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকের পায়ের তিনটি আঙ্গুল সামনের দিকে এবং পিছন দিকে একটি। ইহাদের ঠোঁট খুব শক্ত ও অগ্রভাগ বাঁকা এবং মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী করিয়া গঠিত। ইহাদের নখ ধারালো, পায়ের তলা শুক-আদির মত মাংসল এবং পায়ের পাঞ্জার জোর অন্য বর্গের পাখী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। আয়তনে ইহারা ছোট বড় নানা রকমের হইয়া থাকে। অন্যান্য বর্গের পাখীর তুলনায় ইহাদের সাহস ও বিক্রম বেশী। তোমাদের হয়ত ধারণা, সাহসে মাংসাশী-বর্গের মধ্যে ঈগল পাখীই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা ভুল। বাজ পাখীদের সাহস এই বর্গের সকল পাখীকেই ছাড়াইয়া যায়।

ইহাদের স্ত্রী-জাতি পুরুষ-জাতি অপেক্ষা আকারে বেশ বড় হইয়া থাকে এবং সন্তান পালনের ভার তাহার উপরই ন্যস্ত হয়।

পেচক আদি



পেঁচা প্রায় ২০০ জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন জাতি লম্বে ৬ ইঞ্চির বেশী নহে, কোন কোন জাতি এক ফুট, আবার কোন কোন জাতি প্রায় ২৮ ইঞ্চি। পেঁচার মাথা প্রকাণ্ড, চোখ বড় ও গোল, ঠোঁট বাঁকা ও তীক্ষ্ণ এবং নখ শক্ত ও ধারালো। ইহাদের পায়ের থাবা ছোট ছোট জন্তু আঁকড়িয়া ধরিবার উপযুক্ত।

পেঁচার সর্ব্বাঙ্গ ঘন পালকে ঢাকা। এই সকল পালক খুব নরম ও ফুলানো। ইহাদের ডানার পালক কোমল ঝালরবিশিষ্ট। উড়িবার সময় ঈগল, চিল প্রভৃতির ডানা হইতে শন্ শন্ শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু পেঁচার ডানা এরূপ ভাবে তৈয়ারি যে, ইহারা একেবারে নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। সেই জন্য ইঁদুর প্রভৃতি শিকার করিতে ইহাদিগকে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে একত্র শিকার করিয়া বেড়ায়।

পশুদের মধ্যে যেমন বিড়াল, পাখীদের মধ্যে তেমনি পেঁচা। এই দুই প্রাণীর মুখে ও চোখে যেমন সাদৃশ্য, উভয়ের স্বভাবেও তেমনি মিল দেখা যায়। বিড়ালের মত পেঁচার চোখের তারাও বড় বড়। তাহাদের ভিতর খুব বেশী পরিমাণ সূর্য্যের কিরণ প্রবিষ্ট হয় বলিয়া, ইহারা দিনের বেলা ভালরূপ দেখিতে পায় না; চক্ষু মেলিবামাত্র একেবারে ঝল্সিয়া যায়। বিড়াল-বংশীয় প্রাণীদের মত পেঁচাও সূর্য্যাস্তের পর বেশ দেখিতে পায় এবং নিতান্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার না হইলে, সারারাত শিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পেঁচার স্বর খুব কর্কশ। ইহারা দেওয়ালের ফাটলে, গাছের কোটরে অথবা পাহাড়ের ফোকরে সারাদিন কাটাইয়া, সূর্য্যাস্তের পর খাবার চেষ্টায় বাহির হয়। ইঁদুর ছুঁচা প্রভৃতি ছোট ছোট জন্তু, নানা জাতীয় পাখী, সাপ, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, গিরগিটি এবং কীট-পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য। কোন কোনটা আবার মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া খাইতেই বেশী ভালবাসে।

অপেক্ষাকৃত বড় বড় প্রাণী মারিয়া ইহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া খায়, কিন্তু ছুঁচা, ইঁদুর প্রভৃতি ছোট ছোট জন্তু ধরিয়া একেবারে আস্ত গিলিয়া ফেলে। চামড়া, হাড় প্রভৃতি যে সকল জিনিস সহজে হজম হইবার নহে, সেগুলি মুখ দিয়া ডেলা ডেলা উদ্গিরণ করিয়া থাকে। ইহাদের বাসার মধ্যে এইরূপ ডেলা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ডেলা ক্রমে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া নরম গদির মত হয়।

পেঁচা তাহার উপর ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিম গোল, রং সাদা।

লক্ষ্মী-পেঁচা

কাল্-পেঁচার যেমন অখ্যাতি, 'লক্ষ্মী-পেঁচা'র (Barn বা Screech-Owl) তেমনি আদর। বাড়ীতে একটা বা এক-জোড়া লক্ষ্মী-পেঁচা আসিয়া বসিলে, লোকে সেটা খুব শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু কাল্-পেঁচার উপর সকলের কেন যে এত রাগ এবং লক্ষ্মী-পেঁচাই বা কিসে এত আদরের, তাহার বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।



লক্ষ্মী পেঁচা

পৃথিবীর নানা স্থানেই লক্ষ্মী-পেঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশ-ভেদে ইহাদের আকার-প্রকার এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, সকলকে এক জাতীয় বলিয়া মনে করা কঠিন। সাধারণত ইহারা পুরাতন ভাঙ্গা অট্টালিকা, মস্‌জিদ, কবরখানা বা মন্দিরের আশে পাশে কিম্বা তাহার ভিতর বাসা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের লক্ষ্মী-পেঁচা লম্বে প্রায় এক ফুট। ইহাদের পালকের রং লাল্‌চে ধূসর; মুখের দিক্ সাদাটে, চোখ জ্বল্‌জ্বলে। ইহারা দিনের বেলা ভাঙ্গা পরিত্যক্ত বাড়ীর অন্ধকারময় কোটরে বা গাছ-পালার মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া সূর্য্যাস্তের পর স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে এক সঙ্গে খাবারের চেষ্টায় বাহির হইয়া থাকে।

ছুঁচো, ইঁদুর এবং চড়াই প্রভৃতি পাখী ইহাদের প্রধান খাদ্য। এমন ক্ষিপ্রতার সহিত ছোঁ মারিয়া ইহারা ইঁদুর ধরে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মেঠো ও গেছো ইঁদুরের অত্যাচারে যাহারা বিপন্ন, লক্ষ্মী-পেঁচার মত এমন উপকারী বন্ধু তাহাদের আর নাই।

ইহাদের ডিমের কোনও হিসাব নাই; কখনো ৩টিও হয়, কখনো বেশীও হয়। সাতটি পর্য্যন্ত ডিম হইতে দেখা গিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ডিমে তা' দিয়া থাকে।

ঈগল-পেঁচা

পেচক-জাতির মধ্যে ইহারা আকারে বড় এবং বল-বিক্রমে শ্রেষ্ঠ। 'ঈগল-পেঁচা' (Eagle-Owl) প্রায় ১৯।২০ জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে এশিয়া ও

ইউরোপের ঝুঁটিধারী ঈগল-পেঁচাই প্রধান। সামান্য ছুঁচা, ইঁদুরে সন্তুষ্ট না হইয়া, ইহারা অনেক সময় খরগোস্, হরিণছানা প্রভৃতি ছোট ছোট জন্তু এবং ময়ূর, ফেঝ্যান্ট্ প্রভৃতি বড় বড় পাখী মারিয়া উদর পূর্ণ করে। ইহারা উত্তেজিত অবস্থায় ডানা বিস্তার করিয়া যখন গর্জ্জিতে থাকে, তখন সেই আওয়াজ শুনিলে আর ইহাদের রক্তবর্ণ চক্ষুর দিকে চাহিলে, মনে বাস্তবিকই ভয়ের সঞ্চার হয়।

হুতুম-পেঁচা

'হুতুম-পেঁচা' (Brown Fish-Owl) দুই জাতীয়। এক জাতির (Ketupa ceylonensis) বাস ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি। ইহাদের চোখ হল্‌দে এবং কাণের উপর হইতে বড় বড় দুইটি পালকের ঝুঁটি খাড়া হইয়া উঠে। আর এক জাতির জন্মস্থান আফ্রিকা। তাহাদের এ রকম ঝুঁটি থাকে না।



হুতুম পেঁচা

ভারতবর্ষের হুতুম পেঁচা আকারে গোদা চিল অপেক্ষা বড়। ইহাদের পালকের রং কাল্‌চে বাদামি; বুক ও পেট ফিকে হল্‌দে; ডানা ও লেজ ছিটযুক্ত এবং পা ফিকে কালো।

হুতুম-পেঁচা সংখ্যায় তেমন বেশী নহে; পল্লীর মাঝে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায় না। সময় সময় পল্লীর আশে-পাশে কোন গাছে আসিয়া বসে এবং গভীর অন্ধকার রাত্রিতে 'হুম্' 'হুম্' শব্দ করিয়া গৃহস্থকে ভয় দেখাইতে থাকে।

ইহারা সূর্য্যাস্তের পর আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। সেই জন্য খাল, বিল, অথবা পুকুরের ধারেই অনেক সময় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছের কোটরে এবং পাহাড়-পর্ব্বতের ফাটলে ইহারা ডিম পাড়ে; ডিমের সংখ্যা ১টি বা ২টি; রং সাদা।

কাল্-পেঁচা

'কাল্-পেঁচা' (Brown Hawk-Owl) নামটা যেমন বিশ্রী, ইহাদের ডাকও তেমনি বিদ্‌ঘুটে। বাড়ীর কাছে একটা কাল্-পেঁচার ডাক শুনিলে গৃহস্থ অস্থির হইয়া পড়েন; যতক্ষণ না সেটাকে তাড়ানো হয়, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। ইহাদের ডাক অনেকটা বিড়ালের গলা টিপিয়া শ্বাসরোধের সময়কার আওয়াজ বা ছোট ছেলের

কান্নার মতন।

লম্বে ইহারা এক ফুট মাত্র। ইহাদের গায়ের রং আগাগোড়া কটা, কেবল মাথার দিক্ ফিকে ধূসর। ভারতবর্ষের নানা স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রাত্রিচর হইলেও অনেক সময় বেলা থাকিতে থাকিতে ইহারা আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে। তাহার ফলে কাক ও ফিঙের ঠোকর খাইতে খাইতে ইহারা অস্থির হইয়া পলাইবার পথ পায় না।

পোকা-মাকড়, ইঁদুর-ব্যাঙ্‌ ও ছোট ছোট সরীসৃপ ইহাদের খাদ্য। ইহারা সাদা রঙের তিন চারিটি ডিম একবারে দিয়া থাকে।

কোটরে-পেঁচা

সিংহল ছাড়া ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই এক জাতীয় ছোট পেঁচা দেখা যায় ইহাকে বাঙ্গলায় 'কোটরে-পেঁচা' (Spotted Owlet) বলে।

ইহাদের গায়ের রঙ ফিকে ধূসর-পাট্‌কিলে এবং প্রত্যেকটি পালকের উপর ছুইটি করিয়া সাদা ছিট্। লম্বে ইহারা বড় জোর ৮ হইতে ৯ ইঞ্চি হয়।

মানুষের বসতির নিকট পল্লীর আশ-পাশে তেঁতুল, বট বা আম গাছের উপর ইহারা বাসা করে। সাধারণতঃ ইহারা জোড়ায় থাকে, কখন কখন খুব ছোট দলেও ইহাদের দেখা যায়। অন্যান্য পেঁচাদের মত ইহারা কেবলমাত্র রাত্রেই বাহির হয় না, ছুপুরবেলাতেও ইহাদের টিক্‌টিকি গিরগিট ধরিয়া খাইতে দেখা যায়।

কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে ইহাদের ছানা হয়। ডিমের সংখ্যা ৩।৪টি, রঙ সাদা।

শকুন আদি

'শকুন' (Vulture) খুব বড় পাখী। পৃথিবীর নানা স্থানে কমপক্ষে ৫০০ জাতীয় শকুন আছে। ইহাদের ঠোঁট শক্ত ও বাঁকা, পা লম্বা ও জোরালো এবং নখ বেশ বড় বড়।



জানোয়ারের মধ্যে যেমন হায়না, পাখীদের মধ্যে তেমনি শকুন। পচা গলিত মাংসও ইহারা তৃপ্তির সহিত আহার করে। সজীব পশু মারিবার শক্তি ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ক্বচিৎ ছুই একটা ছুর্ব্বল পশু মারিতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় অপরের মারা পশুর টাট্‌কা অথবা পচা মাংসেই ইহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়।

শকুনের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। শূন্যে উড়িতে উড়িতে বহু উচ্চস্থান হইতে পশু-পক্ষীর মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া, ইহারা দলে দলে তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় এবং যতক্ষণ এক টুক্‌রা মাংসও বাকি থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই নড়িতে চাহে না। তাড়া করিলে ডানা বিস্তৃত করিয়া লাফাইতে লাফাইতে একটু দূরে গিয়া বসে ; ইট, পাথর ছুড়িতে আরম্ভ করিলে, মাথা ডানার মধ্যে লুকাইয়া পিট পাতিয়া মার খায়, তবু কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করে না।

রাজ শকুন

সচরাচর আমাদের দেশে দুই জাতীয় শকুন দেখিতে পাওয়া যায় ;—'রাজ শকুন' ও 'সাধারণ শকুন'।

'রাজ শকুন' (King বা Pondicherry Vulture) লম্বে সাধারণ শকুন অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের ডানা ও লেজের বেশীর ভাগ পালকই গাঢ় খয়েরি, কেবল ডানার কতকটা এবং বুক ও পেট সাদা ; মাথা, ঘাড়, গলা ও পায়ের শেষদিক্ লাল্‌চে ; মাথার দুই পাশ হইতে মোরগের ঝুঁটির মত দুই খানা গোলাপী পাতা ঝুলিয়া পড়ে এবং গলার চারিদিকে গালপাট্টার আকারে পালকের গুচ্ছ শোভা পায়।

রাজ শকুন ভারতবর্ষের নানা স্থানেই আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। সাধারণ শকুনের কাছে ইহাদের সম্মান খুব বেশী। হয় তো একটা মরা জানোয়ার লইয়া ২০।২৫টা সাধারণ শকুনে টানাছেঁড়া চলিতেছে, মারামারি চেঁচামেচির শেষ নাই ; হঠাৎ যেমনি একটা রাজ শকুন দেখা দিল, সকলে অমনি তটস্থ ! খাওয়া-দাওয়া মাথায় থাক, সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। যতক্ষণ না রাজ শকুনের ভোজ শেষ হয়, ততক্ষণ কাহারো মুখে 'টুঁ' শব্দটি নাই। রাজ শকুন চলিয়া গেলে বাকী হাড় ও মাংস লইয়া শকুনদের মধ্যে আবার কামড়া-কামড়ি চলিতে থাকে।

ইহারা বট, পিপুল প্রভৃতি গাছের উঁচু ডালে বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ১টি, তাহার রং সাদা। ডিম ফুটিতে ৪৫ দিন সময় লাগে।

ভারতবর্ষীয় শকুন

'সাধারণ শকুনের (White backed বা Bengal Vulture) পিঠের শেষদিক্ ও লেজের গোড়া সাদা ; ডানা ও গায়ের অন্যান্য পালকের রং ঘন ধূসর। ঘাড়, গলা ও মাথা পর-শূন্য। এই শকুন লম্বে দেড় হাতের কাছাকাছি। ইহাদের ডানাও প্রায় দুই হাত। ডানা বিস্তার করিলে, উহার প্রসার সাড়ে চারি হাতের কম নহে। ভাগাড়ের যত পচা-ধ্বসা পশু-পক্ষীর দেহই ইহাদের উপাদেয় খাদ্য।



ভারতবর্ষীয় শকুন

এই সব নোংরা জিনিস খায় বলিয়া দুর্গন্ধে শকুনের কাছে ঘেঁসা যায় না; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, শেয়াল-শকুনে যদি সেই সব পচা জিনিষ খাইয়া শেষ না করিত এবং গ্রামের আশে পাশে সেগুলি ক্রমান্বয়ে জমিত, তাহা হইলে আমাদের স্বাস্থ্যের কি উপায় হইত? ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাল, নারিকেল প্রভৃতি বড় বড় গাছের মাথায় এবং অশ্বত্থ ও বটের উঁচু উঁচু ডালে ইহারা বাসা তৈয়ারি করে। একবারে ইহাদের একটির বেশী ডিম হয় না।

সাদা শকুন

ইহাদিগকে 'সাদা শকুন' বা 'মিশর দেশীয় শকুন' (White Scavenger Vulture বা Pharaoh's Chicken) বলে, কিন্তু দক্ষিণ-ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে এই শকুন দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও আছে।

ইহাদের গায়ের পালক আগাগোড়াই সাদাটে, কেবল ডানার বড় বড় কয়েকটা 'কুইল' পালক কাল্‌চে; মুখ, ঠোঁট ও পা হল্‌দে। আকারে ইহারা বেশী বড় হয় না।

দেশের যত কিছু ময়লা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে ইহারা অদ্বিতীয়।

কণ্ডর

শকুন-গোষ্ঠীর যত রকম পাখী আছে, তাহাদের মধ্যে আমেরিকার 'কণ্ডর' (Condor) সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহারা লম্বে ৪ ফুটের কম নহে। ইহাদের ডানার প্রসারও প্রায় ৬ হাত।



কণ্ডর

কেরাণী শকুন

আফ্রিকাদেশ 'কেরাণী পাখী'র (Secretary-Bird) জন্মস্থান। আকারে সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ইহারাও শকুন-গোষ্ঠীভুক্ত। মাথায় কয়েকটি বড় বড় পালক বাহির হয় বলিয়া এই পাখীকে ঠিক কাণে-কলম-গোঁজা কেরাণীর মত দেখায়। সেই জন্যই ইহাদের নাম 'কেরাণী পাখী' বা 'কেরাণী শকুন'। এই জাতীয় শকুনের পা বেজায় লম্বা। উচ্চতায় ইহারা প্রায় ৪ ফুট।


কেরাণী শকুন

ইহারা সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি খাইতে ভালবাসে। ইহাদের কাছে খুব বিষধর সাপেরও নিস্তার নাই। সাপ দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ডানার আঘাতে তাহার প্রাণবধ করে এবং বেশী বড় না হইলে, একেবারে আস্ত গিলিয়া ফেলে।

বাজ আদি

ইউরোপ ও এশিয়ার অরণ্য-বহুল স্থানে এবং ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলে, বাজ (Goshawk) দেখা যায়। কখনো কখনো দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পাহাড়েও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজ নানা জাতিতে বিভক্ত। সাধারণতঃ ইহাদের দুইটি বড় ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যাহাদের ডানা ছোট এবং ডানার অগ্রভাগ ছুঁচ্‌ল নহে, তাহাদের 'হক' (Hawk); আর যাহাদের অগ্রভাগ ছুঁচ্‌ল, তাহাদের 'ফকন' (Falcon) বলে।



বাঙ্গলা দেশে সচরাচর যেগুলিকে দেখা যায়, তাহাদের গলা, বুক ও পেট সাদা, তাহার উপর পাটকিলের ছিট। তাহাদিগকে 'লগ্‌গর' (Falco jugger) বলে। ইহাদের স্ত্রী-জাতি লম্বে প্রায় ২০ ইঞ্চি, পুরুষ-জাতি ৩।৪ ইঞ্চি ছোট। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের রং ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষ-জাতির রং সবুজ

আভাযুক্ত ধূসর ; তাহাদের চোখের উপর সাদা রেখা এবং লেজে কয়েকটি ডোরা থাকে। স্ত্রী-জাতির রং ফিকে কটা। আমাদের দেশে বহেরি (Peregrine Falcon), শাহিন (Shahin Falcon), স্যাকার (Saker Falcon), লগ্‌গর (Laggar Falcon), তুরম্‌তী (Merlin), ধুতি (Hobby), পোকামারা (Kestrel), শিক্‌রে ইত্যাদি নানা জাতীয় বাজ দেখা যায়।

ইহারা পায়রা, ঘুঘু, হাঁস প্রভৃতি পাখী এবং ছোট জাতীয় হরিণ ও খরগোস শিকার করিতে খুব পটু। সুবিধামত পাইলে সাপ মারিয়া খাইতেও ছাড়ে না। কখনো পিছন পিছন তাড়া করিয়া, কখনো বা লুকাইয়া ছোঁ মারিয়া শিকার ধরা ইহাদের স্বভাব। খরগোস ধরিবার সময় বাজ একখানা পা মাত্র ব্যবহার করে। পাছে টানিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে অন্য পা দিয়া গাছ-পালা আঁকড়াইয়া থাকে।

ইহারা গাছের খুব উঁচু ডালে বাসা তৈয়ারি করে। একবারে ইহাদের ৩।৪টি করিয়া সাদা রংএর ডিম হয় ; সাদার উপর লাল্‌চে ছিট্। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে বহু পুরাকাল হইতে ইহাদের পুষিয়া ও শিক্ষা দিয়া পশু-পক্ষী শিকার করানো হয়। ইহাদের শিকার দেখিবার বস্তু। এই শিকার-খেলা রাজা-বাদশার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এখনও দুই চার জন রাজা-মহারাজের এই সখ বজায় আছে। ইতালীর বেনিতো মুসলিনীরও বাজ পোষার খুব সখ ছিল, এবং তিনি নিজের হাতে বাজ লইয়া শিকার খেলিতেন।

শিক্‌রে



শিক্‌রে

শিক্‌রে (Sparrow Hawk) এক জাতীয় বাজ পাখী। ইহারা আকারে বেশী বড় হয় না ; স্ত্রী-জাতি ১৪।১৫ ইঞ্চি, পুরুষ-জাতি ১ ফুট। শিক্‌রের ডানা ও লেজের পালকের রং ধূসর কিন্তু বুক, পেট ও গলা সাদাটে ; তাহার উপর কালো কালো ডোরা। চোখ হল্‌দে ; চাহুনি এমন কট্‌মটে যে, ইহাদের দিকে চাহিতেই ভয় হয়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শিক্‌রে দেখা যায়। ইহারা গুপ্ত ভাবে ঘুঘু, শালিক প্রভৃতি পাখীর

অনুসরণ করে এবং সুযোগ বুঝিয়া তীরবেগে ছোঁ মারিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। আকারে ছোট হইলেও ইহাদের সাহস খুব বেশী। বড় বড় পাখীকেও আক্রমণ করিতে ইহারা ভয় পায় না। চৈত্র, বৈশাখ মাসে শিক্রের ছানা হয়। সচরাচর ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৪টি এবং ডিমের রং ফুট্‌ফুটে শাদা।

ঈগল

তোমরা অনেকেই হয় তো 'ঈগল' (Eagle) দেখ নাই। চিল ও ঈগল একই বংশের



পাখী, কিন্তু আকারে ঈগল অনেক বড়। আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এবং এশিয়ার উত্তরাংশে ইহাদের বাস। আমেরিকায়ও ঈগল আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। ইহাদের ঠোঁট বাঁকা, শক্ত ও খুব ধারালো। ডানা প্রকাণ্ড; প্রতি পায়ে ৪টি করিয়া তীক্ষ্ণ নখযুক্ত আঙ্গুল; তাহার ৩টি সম্মুখদিকে, ১টি পিছনে।

ঈগলের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। বহু উচ্চ স্থান হইতেও শিকার লক্ষ্য করিয়া ইহারা বিদ্যুদ্বেগে নামিয়া আসে এবং ছোঁ মারিয়া ধরিয়া ফেলে। ইহাদের পায়ে এত জোর যে, বেশ বড় বড় ছাগল ও মেষের ছানা লইয়া উড়িতে উড়িতে বহু দূরে যাইতেও ইহারা ক্লেশবোধ করে না।

উড়িবার সময় ইহারা চিলের মত ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে অনেক উচ্চে উঠে। তখন ইহাদের ডানা ক্রমাগত নাড়িবার প্রয়োজন হয় না। একবার নাড়িয়া লইলে, ইহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডানা না নাড়িয়া স্থিরভাবে উড়িতে বা আকাশে ভাসিতে পারে। দ্রুত উড়িবার সময় বায়ুর প্রতিঘাতে ইহাদের ডানা হইতে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে থাকে। সেই সময় ইহাদের বেগ ঘণ্টায় ৫০ মাইলের কম নহে।

ঈগল মাংসাশী পাখী। ছাগল, ভেড়া, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি ছোট ছোট জানোয়ার এবং নানাজাতীয় ছোট বড় পাখী ইহাদের খাদ্য। নিজে মারিতে না পারিলে, অনেক সময় ইহারা মরা জীবজন্তুর মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ইহাদের কোন কোন জাতি টাট্‌কা অপেক্ষা পচা মাংসই বেশী ভালবাসে; এবং কোন কোন জাতি কেবল মাছ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই ঘন জঙ্গলাবৃত স্থানে এক রকমের ছোট জাতীয় ঈগল দেখা যায়, তাহাদের বাঙ্গলায় 'তিলে বাজ' (Crested Serpent-Eagle) বলে। ইহাদের প্রধান খাদ্য সাপ।

বাসাগুলি গুছাইয়া সুন্দর করিয়া তৈয়ারি করিবার জন্য এই বর্গের কোন পাখীরই তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। ঈগলের বাসা এক বোঝা ডাল-পালামাত্র।

স্বর্ণ-ঈগল

যত রকম ঈগল পাখী আছে, তাহাদের মধ্যে স্বর্ণ-ঈগল (Golden Eagle) আকারে বড় এবং দেখিতে জমকালো। সিংহকে যে কারণে পশুদের রাজা বলা হয়, এই ঈগলকেও ঠিক সেই কারণেই পাখীদের রাজা বলা যাইতে পারে। ইহাদিগকে ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, উত্তর-আমেরিকার আলাস্কা হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত এবং এশিয়ার মধ্য ও উত্তরাংশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ঈগল হিমালয় পর্ব্বত ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও বড় দেখা যায় না।

ইহাদের স্ত্রী-জাতি, মাথা হইতে লেজের শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় ৩ ফুট, কিন্তু পুরুষ-জাতি লম্বে ২।৩ইঞ্চি ছোট। স্বর্ণ-ঈগল পক্ষ বিস্তার করিলে উহার প্রসার ৬ হাতের কম হয় না।



স্বর্ণ-ঈগল

ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মাথা, ঘাড়, গলা ও বুকের পালকের রং সোনালী. লাল। রৌদ্র পড়িলে সেই সকল পালক স্বর্ণের আভায় ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকে। সেই জন্যই ইহাদিগকে গোল্ডেন্ বা স্বর্ণ-ঈগল বলে। ইহাদের গায়ের অন্যান্য পালকের রং গাঢ় ধূসর।

স্বর্ণ-ঈগল বেজায় সাহসী। নানা জাতীয় পাখী ও ছোট ছোট জানোয়ার

ইহাদের প্রধান খাদ্য হইলেও, অনেক সময় ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ইহারা বাছুর, হরিণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বড় বড় প্রাণীদিগকেও আক্রমণ করে এবং সুযোগ পাইলে, ঘরের ছোট ছেলে-পিলের উপর পড়িয়াও তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কখনো কখনো খরগোস শিকার করিতে ইহারা আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়। খরগোস প্রায়ই ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। তাই দুইটা ঈগল এক জোটে তাহাকে ধরিতে যায়। একটা কিছু দূরে গাছ-পালার আড়ালে লুকাইয়া থাকে আর একটা বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া, ডানার দ্বারা ঝোপের উপর আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে ভয় পাইয়া খরগোস যেই পলাইতে চেষ্টা করে, অমনি অপর ঈগলটা আড়াল হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

স্বর্ণ-ঈগলকেও বাজ পাখীর ন্যায় পোষ মানাইয়া শিকার-খেলা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মধ্য ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে স্বর্ণ-ঈগল পোষার চলন আছে।

স্বর্ণ-ঈগল পর্ব্বতের উচ্চস্থানে রাশি রাশি ডাল-পালা দ্বারা বাসা প্রস্তুত করে এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত একই স্থানে বাস করে। প্রতি বৎসর ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে বাসাগুলি ভাল করিয়া মেরামত করিয়া লয়। এইরূপ মেরামত করিতে করিতে ইহাদের এক একটি বাসা উঁচুতে প্রায় ৬ হাত হইয়া উঠে।

স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে বরাবর একত্র থাকে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ২টি। মাঝে মাঝে ৩টি ডিম-ও যে না হয়, এমন নহে। উভয়ে পালাক্রমে ডিমে তা দেয় এবং বশেষ যত্নে সন্তান পালন করে।

ইম্পিরিয়াল ঈগল

এই জাতীয় (Imperial Eagle) ঈগল আকারে স্বর্ণ-ঈগল অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহাদের শরীরের বাঁধুনী খুব দৃঢ়; ডানা বেশ বড়, কিন্তু লেজ্ তেমন বড় নহে। ডানা গুটাইয়া রাখিলে তাহার বড় বড় কুহল পালকগুলি লেজ ছাড়াইয়া খানিক বাহির হইয়া পড়ে; পালকের রং ঘন কটা, কেবল মাথা ও ঘাড় ফিকে হল্‌দে; লেজের পালকগুলি ধূসর, তাহার উপর ডোরা ডোরা।

ইউরোপের দক্ষিণাংশে এবং এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই ঈগল দেখিতে পাওয়া



ইম্পিরিয়াল ঈগল

যায়। শীতকালে ইহারা হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের উচ্চ-প্রদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া সমতল ক্ষেত্রে বাস করে। শীত ফুরাইলেই আবার উপরে চলিয়া যায়। হিন্দিতে ইহাদের 'জুমিজ্' বা 'জুম্বিজ' বলে।

হার্পি ঈগল

হার্পি ঈগল (Harpy Eagle) আমেরিকা-বাসী। ইহাদের মাথায় কাকাতুয়ার মত ঝুঁটি বাহির হয়। এই ঝুঁটি সহজ অবস্থায় মাথার পালকের সহিত মিলাইয়া থাকে, কিন্তু কোন কারণে ইহারা উত্তেজিত হইলে অমনি খাড়া হইয়া উঠে। হার্পি ঈগলকে কৌশলে বাছুর, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় জন্তুও মারিয়া খাইতে দেখা গিয়াছে। কোন জন্তু মারিবার সময় ইহারা ছোঁ মারিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা অগ্রে উহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, তার পর ডানার দ্বারা ক্রমাগত মাথায় আঘাত করিতে থাকে। প্রহারের যাতনায় বেচারা ছুটাছুটি করিতে করিতে শেষে মারা পড়ে।



হার্পি ঈগল



মাছমৌরল

মাছমৌরল বা কোড়াল

মৎস্য-শিকারী ঈগলের মধ্যে আমাদের দেশের 'মাছমৌরল' বা 'কোড়াল' (Ring-tailed Fishing-Eagle) খুব প্রসিদ্ধ। লম্বে ইহারা প্রায় আড়াই ফুট। ইহাদের মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা ও

পিঠের উপরদিক পাটকিলের উপর ধোঁয়াটে সাদা এবং লেজ ধূসর কালো, তাহার মাঝে সাদা বড় দাগ ; গায়ের আর সব পালকের রং খয়েরি।

আমাদের দেশে অপর এক জাতীয় (Pandion haliætus) মাছমৌরলও (Osprey) খুব দেখা যায়। ইহাদের পিঠ ও লেজ ঘন পাট্‌কিলে, মাথা ও গলা সাদায় পাট্‌কিলে মিশানো, বুক ও পেট সাদা। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ২।৩টি।

মাছমৌরল খাল, বিল, নদী অথবা পুকুরের পাড়ে কোন গাছে বসিয়া মাছের সন্ধান করিতে থাকে ; শিকার দেখিতে পাইলে, নিঃশব্দে উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া ফেলে। সময় সময় ইহারা এমন প্রকাণ্ড মাছ শিকার করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মাছ ছাড়া হাঁস, পানকৌটি ডাহুক এবং অন্যান্য জলচর পাখীও ইহাদের খাদ্য। এই ঈগল প্রহরে প্রহরে ডাকে।

উত্তর-আমেরিকায় একজাতীয় ঈগল (H. leucocephalus) আছে, মাছই তাহাদের প্রধান খাদ্য, কিন্তু মাছ ধরিবার জন্য পরিশ্রম করিতে তাহারা রাজী নহে। অপর পাখীর মুখ হইতে মাছ কাড়িয়া লইয়া উদর পূর্ণ করিতে তাহারা বিলক্ষণ পটু।

চিল

চিল (Kite) বাজ ও ঈগলবংশের পাখী, কিন্তু আকারে ঈগল অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহারা কয়েক জাতিতে বিভক্ত। সচরাচর আমরা যে দুই রকম চিল দেখিতে পাই, তাহারা 'শঙ্খ চিল' ও 'গোদা চিল' নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ছাড়া আমাদের দেশে আরেক জাতীয় (Elanus) চিল দেখা যায়। উহারা আয়তনে দাঁড়কাক অপেক্ষা বড় হইবে না। উহাদের চোখ লাল ; গায়ের রঙ সাদা, কেবল ডানা কালো ও পিঠ হাল্কা ধূসর রঙের। হিন্দিতে ইহাদের 'কাপাসী' (Black-winged Kite) বলে।

চিলের ঠোঁট ও নখ তেমন বড় না হইলেও, ছোট ছোট প্রাণী শিকার করিবার পক্ষে বেশ উপযোগী। ইহারাও বাজ ও ঈগল পাখীর মত ছোঁ মারিয়া পায়ের ছুঁচ্‌ল নখ দিয়া শিকার ধরিয়া ফেলে এবং ধারালো ঠোঁট দিয়া মাংস কাটিয়া কাটিয়া খায়।

পোকা, মাকড়, ইঁদুর, ব্যাঙ, মাছ, চিংড়ি ইহাদের খাদ্য। পচা গলিত মাংসও ইহারা তৃপ্তির সহিত খায়।

শঙ্খ চিল

শঙ্খ চিল (Brahminy Kite) লম্বায় ২১ ইঞ্চি। ইহাদের ডানা প্রায় ১৭ ইঞ্চি, কিন্তু লেজ ৬।৭ ইঞ্চির বেশী নহে। ডানা মুড়িলে উহা লেজ ছাড়াইয়া কতকটা বাহির হইয়া পড়ে। এই চিলের মাথা, ঘাড়, গলা ও পেটের কিয়দংশ সাদা। গায়ের অন্যান্য পালকের রং পাট্‌কিলে লাল।

শঙ্খ চিল আমাদের দেশে শীতকালেই বেশী দেখা যায়। গোদা চিলের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা অনেক কম। ইহারা তাহাদের মত হিংস্রও নহে এবং তত পেটুকও নহে। শঙ্খ চিল জিনিস-পত্রের লোভে ছোঁ মারিয়া কাহারো হাত রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে, এমন কথা কখন শুনা যায় না।

মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া ইহাদের প্রধান খাদ্য। সেই জন্য ইহাদিগকে খাল, বিল ও পুকুরের ধারে গাছের ডালের উপর বসিয়া থাকিতে ও মাঝে মাঝে ছোঁ মারিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে শঙ্খ চিলের ছানা হয়। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ২টি ; রং ধোঁয়াটে সাদা।

গোদা চিল

বাঙ্গলা দেশে এই চিলের (Pariah Kite) আরো কয়েকটি নাম আছে, যেমন, 'ডোম চিল', 'ভুঁড়ো চিল' ইত্যাদি। লম্বায় ইহারা প্রায় দুই ফুট। স্ত্রী-জাতি আকারে দুই এক ইঞ্চি বড়। গোদা চিলের এক একখানা ডানা দেড় ফুটের কম নহে। ইহাদের ডানা ও লেজের পালক খয়েরি ও কটায় মেশানো।

কাক-চড়াই-শালিকের ন্যায় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব সাহসী ও হিংস্র। পথে ঘাটে কোন জিনিস হাতে করিয়া একটু অসাবধানে চলিলে, ইহাদের গ্রাস হইতে তাহা রক্ষা করা কঠিন। এমন কি, ঘরের আঙ্গিনার মধ্যেও কোন খাদ্য-সামগ্রী দেখিলে ইহারা ছোঁ মারিতে ছাড়ে না। ইহাদের ছোঁ মারার ভঙ্গীটি বড় সুন্দর। খুব ভীড়— লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়া, ট্রাম-ইলেকট্রিক-টেলিফোনের তার ইত্যাদির ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যখন একটি মরা ইঁদুর বা অন্য কোন বস্তু তুলিয়া লয়, তখন ইহাদের ঐ সাবলীল গতি বিশিষ্ট



গোদা চিল

সাহসী ভঙ্গীটি বড়ই ভাল লাগে। গোদা চিল মাছ, চিংড়ি, ইঁদুর, ব্যাং, পোকা-মাকড় —সবই খায়।

ইহারা হাঁস-মুরগী এবং পায়রা-শালিকের ছানার যম। ইহাদের গ্রাস হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়।

প্রতি বৎসর ভাদ্র হইতে চৈত্র মাসের ভিতর গোদা চিলের ছানা হয়। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ২ হইতে ৪টি ; রং সাদাটে, তাহার উপর খয়েরি ছোপ্।

কপোতবর্গ

ঘুঘু ও পায়রা যে একই বর্গের পাখী, তাহা সহজে মনে হয় না বটে, কিন্তু একটি গোলা পায়রা ও একটি ঘুঘুর ঠোঁট, ডানা, লেজ ও অন্যান্য অঙ্গ পরীক্ষা করিলে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।



ইহাদের ঠোঁট ছোট ; উপরের ঠোঁটের শেষদিক্ বাঁকানো ও গোড়ার দিক্ ফুলানো ; পায়ের ৪টি আঙ্গুলের মধ্যে ১টি পিছনদিকে ও ৩টি সম্মুখদিকে প্রসারিত। ডানা এরূপ জোরালো যে, বহুক্ষণ ধরিয়া উড়িয়া বেড়াইলেও ইহারা ক্লান্ত হয় না।

প্রায় প্রতি মাসেই ইহারা ২টি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে প্রতিবারেই ১টি পুরুষ ও ১টি স্ত্রী-ছানা হইতে দেখা যায়। ইহাদের ডিমের রং সাদা। ইহাদের কোন কোন জাতি আবার একটি মাত্র ডিম প্যাড়িয়া থাকে।

ঘুঘু ও পায়রার ছানা যখন ডিমের ভিতর হইতে বাহির হয়, তখন তাহাদের চোখ মুদিত থাকে এবং গায়ে পালক থাকে না। ধাড়ী পাখী নিজ নিজ ঠোঁট তাহাদের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য উগ্‌রাইয়া তাহাদিগকে খাওয়ায়। এই ভাবে আহার পাইতে পাইতে ক্রমে তাহারা বড় হইয়া উঠে।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। নানা প্রকার শস্য ইহাদের প্রধান খাদ্য।

হরিয়াল



হরিয়াল

এক রকম সবুজ রং-এর পায়রাকে 'হরিয়াল' (Common Green Pigeon) বলে। ইহাদের পালকের রং ঠিক সবুজ নহে—সবুজে ও হলুদে মেশানো। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা মধ্যভারত, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা বেশী। পাতার রং-এর সহিত হরিয়ালের পালকের রং-এর এত বেশী মিল যে, বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিলে, ডাল-পালার ভিতর হইতে ইহাদিগকে খুজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহারা সর্ব্বদাই ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে।



নানা জাতীয় পায়রা

পায়রা

পোষা পায়রা মাত্রেই 'বুনো পায়রা'র (Rock-Pigeon) বংশধর। ইহাদের মধ্যে 'মুখ্‌খী', 'লক্কা', 'সেরাজু', 'গৃহবাজ', 'পরপাঁউ', 'গলা-ফুলা' প্রভৃতি প্রধান। মাথা পিছনে হেলাইয়া 'মুখ্‌খী'র ঘাড় কাঁপানো, পুচ্ছ বিস্তার করিয়া 'পর-পাঁউ'-এর নাচ এবং ঘুরিয়া ডিগবাজী খাইতে খাইতে 'লক্কা'র উপরে উঠা—বাস্তবিকই দেখিবার মত।

দ্রুত উড়িবার জন্য আমাদের দেশের 'গৃহবাজ' পায়রাই প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইউরোপে এক জাতীয় পায়রাকে পত্রবাহকের কাজ শিখানো হয়, তাহাদের উড়িবার শক্তি অদ্ভুত। ঐ জাতীয় পায়রাকে 'হোমার' বলে। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন পত্রবাহক পায়রা ঘণ্টায় দেড় শত মাইল পথও অতিক্রম করিতে পারে। গত দুই যুদ্ধে এই জাতীয় পায়রাকে পত্রবাহকের কার্য্যে খুবই ব্যবহার করা হইয়াছে।

দেশভ্রমণকারী পায়রা

দেশভ্রমণকারী (Passenger Pigeon) পায়রা উত্তর-আমেরিকাবাসী। ইহাদের চেহারা অনেকটা আমাদের দেশের সাধারণ ঘুঘুর মত, কেবল লেজ বেজায় লম্বা। এই পায়রার সংখ্যা এত বেশী যে, পেটের জ্বালায় অনেক সময় ইহাদিগকে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যখন দেশভ্রমণে বাহির হয়, তখন কত লক্ষ পায়রা যে এক একদলে থাকে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। লম্বে ১০০।১৫০ এবং চওড়ায় ২০।২৫ মাইলের মধ্যে পায়রা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ইহা অপেক্ষাও বড় বড় দলের কথা শুনা গিয়াছে।



দেশভ্রমণকারী পায়রা

মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য ইহাদিগকে কোন জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হয়। সেই জঙ্গল যথেষ্ট বড় না হইলে, স্থানের অভাবে একই গাছে এত বেশী পায়রাকে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিতে হয় যে, ইহাদের ভারে মোটা মোটা ডাল পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে পথ দিয়া ইহারা যায়, সেইদিকে চাহিলে মনে হয়, যেন ঝড়ের বিষম দাপটে জঙ্গলটা ছারখার হইয়াছে।

ঘুঘু

'ঘুঘু'র (Dove) মত এমন নিরীহ—এমন শান্ত-শিষ্ট পাখী খুবই কম আছে। জাতি-হিসাবে ইহারা আকারে যেমন ছোট, বড়, মাঝারি হইয়া থাকে, ইহাদের গায়ের রং-ও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন জাতির মাথায় আবার বুলবুলির মত ঝুঁটি বাহির হয়।

এ দেশে সচরাচর যে কয় রকম ঘুঘু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে তিলে ঘুঘু (Spotted Dove), রাম ঘুঘু (Bronze-winged Dove) ও শ্যাম ঘুঘু (Rufus Turtle-Dove) প্রধান। বাড়ীর আনাচে-কানাচে, বাগান-বাগিচায় আমরা যে জাতীয় ঘুঘু সর্ব্বদাই দেখি, তাহাদের নাম 'তিলে ঘুঘু'। তিলে ঘুঘু আকারে একটি গোলা পায়রার চাইতেও ছোট। আরো ছোট এক জাতীয় ঘুঘু (Ring Dove) মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাহাদের গলায় কাঁটি থাকে। 'রাম ঘুঘু' ও 'শ্যাম ঘুঘু' লোকালয়ে

বেশী দেখা যায় না ; বড় বড় মাঠে বা জঙ্গলের ধারে খোলা জায়গায় কখনো কখনো চোখে পড়ে। আকারে ইহারা গোলা পায়রার মত বড়।

রাম ঘুঘু (Chalcophaps indicus) অন্যান্য ঘুঘুদের তুলনায় মাটিতে বিচরণ করে বেশী। কেবল রাত্রের আবাস ও আশ্রয়ের জন্য গাছে চড়ে। এই কারণে ইহাদের চূড়াধারী ঘুঘু ও নিকোবর পায়রার নিকট সম্পর্কীয় জাতির ভিতর ধরা হয়।

এই বর্গের অন্যান্য পাখীদের মত ঘুঘুও দুইটি করিয়া সাদা রঙের ডিম পাড়িয়া থাকে। বাসা প্রস্তুত ও ডিম হইতে ছানা ফুটাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ দুইজনাই পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে।



চূড়াধারী ঘুঘু

চূড়াধারী ঘুঘু

নিউগিনি ও তাহার নিকটস্থ দ্বীপ সমূহে 'চূড়াধারী ঘুঘু'র (Crown Pigeon) জন্মস্থান। আকারে ইহারা প্রায় একটি ময়ূরের মত। ইহাদের পালকের রং পাঁশুটে এবং চোখ টুকটুকে লাল ; মাথায় চিনাপাখার মত সুন্দর একটি চূড়া। সেইজন্যই ইহাদিগকে 'চূড়াধারী ঘুঘু' বলে।

নিকোবর পায়রা

নিকোবর দ্বীপে ইহাদের (Nicobar Pigeon) বাস। এই জাতীয় পায়রার পিঠ ও ডানার উপরি ভাগ বেগুনি ও সবুজে মেশানো ; গলার দুই পাশ হইতে খোঁচা খোঁচা পালকের গুচ্ছ বাহির হয় ; ঐ সকল পালকের রং গাঢ় বেগুনি। আকারে ইহারা প্রায় একটি পেরুর মত। কপোত-গোষ্ঠীর মধ্যে এত বড় পাখী আর নাই। ইহারা একবারে একটিমাত্র ডিম পাড়িয়া থাকে।



নিকোবর পায়রা

কর্ষকবর্গ

এই বর্গের প্রায় ৪০০ বংশের পাখীর বিষয় জানা গিয়াছে। গৃহপালিত মুরগীর সহিত ইহাদের সকলেরই অল্পাধিক সাদৃশ্য আছে। খাদ্য অন্বেষণে ইহারা পা দিয়া মাটি খোঁড়ে বা কর্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'কর্ষক' পক্ষী বলে।

ইহাদের চেহারা বেশ সুন্দর এবং শরীর বেশ জোরালো ; শরীরের তুলনায় পা ছোট ; পায়ের ৪টি আঙ্গুলের মধ্যে ৩টি সম্মুখদিকে এবং ১টি পিছনদিকে। পিছনের আঙ্গুলটি পায়ের কিছু উপরে সংলগ্ন।

কর্ষক-বর্গের পাখীর ডানা তেমন বড় হয় না। সেই জন্য ইহারা ভালরূপ উড়িতে পারে না এবং এক সঙ্গে বহুক্ষণও উড়িতে পারে না। সচরাচর ইহাদের পুরুষ-জাতির মাথা, ঘাড়, গলা, ডানা এবং লেজ খুব বাহারযুক্ত হইয়া থাকে।

কর্ষক-পক্ষী মাত্রেই মাটিতে বাসা তৈয়ারি করে। ডিমে তা দিয়া ছানা ফুটাইতে এবং ছানাগুলিকে পালন করিতে পুরুষ-পাখীর কোনই যত্ন দেখা যায় না।

ইহাদের ছানা ডিম হইতে বাহির হইয়াই বেশ চট্‌পটে হইয়া উঠে এবং ছুটাছুটি করিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য অন্বেষণ করিতে থাকে ; কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, চোখের নিমিযে ছুটিয়া আসিয়া মায়ের ডানার তলে আশ্রয় লয়।

নানাবিধ শস্য এবং ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য।

ময়ূর

ময়ূর (Peafowl) প্রধানতঃ ভারতবর্ষের পাখী। নিম্নবঙ্গে বিরল হইলেও মেদিনীপুর, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের অভাব নাই। উড়িষ্যার জঙ্গলেও যথেষ্ট ময়ূর আছে। মধ্যভারত, রাজপুতানা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এত বেশী ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। এ দেশের লোকে ময়ূর হত্যা মহাপাপ মনে করে। আপনারা তো বধ করেই না, অপরকেও বধ করিতে দেয় না। এই কারণে ঐ সকল অঞ্চলে ময়ূরের বংশ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে। এক এক দলে ৩০।৪০টি হইতে কখনো কখনো ১০০০।১৫০০ পর্য্যন্ত ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কখনও বা পাঁচ ছয়টির ছোট একটি দল বিচরণ করে।

ময়ূর যখন বড় বড় পালক বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখায়। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ময়ূর আপনার পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে, ইহা কিন্তু ঠিক নহে।


ময়ূর

ময়ূরের পুচ্ছ অতি সামান্য, নাই বলিলেই হয়। যে পালকগুলি বিস্তার করিয়া ইহারা নৃত্য করে, তাহাদিগকে 'পেখম' বলে। ঐ গুলি পুচ্ছ-সংলগ্ন হইলেও, প্রকৃত পুচ্ছের সহিত সেগুলির কোনই সম্পর্ক নাই এবং তদ্দ্বারা পুচ্ছের কোন কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। সেগুলি কেবল প্রদর্শনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

ময়ূরীর চেহারা তেমন সুন্দর নহে এবং তাহাদের পেখম ধরিবারও শক্তি নাই। ময়ূর তিন বৎসর বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তখন এই সুন্দর 'ময়ূর-পুচ্ছ' গজায়। দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ময়ূর ও ময়ূরীর আকারে কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে ইহাদের ছানা হয়। ময়ূরী মাটিতে বাসা তৈয়ারী করিয়া এক বারে ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে; ইহাদের ডিমের রং সাদা। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইতে ২৬ হইতে ২৮ দিন লাগে। নেহাৎ ছোট বেলা ময়ূরের ছানা কেবল শস্য খাইয়াই বাঁচে। বড় হইলে, ইহারা শস্যও খায় এবং কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও খাইয়া থাকে।

কোচিন-চায়না ও যাভাদ্বীপে দুই জাতীয় কালো ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়।

ফেঝ্যাণ্ট্

কর্ষক পক্ষীদের মধ্যে ময়ূর ও ফেঝ্যাণ্ট্ (Pheasant) আর সকলের চাইতে আকারে



ফেঝ্যান্ট্

বড় ও দেখিতে সুন্দর। ময়ূরের চাইতেও ফেঝ্যান্ট্ যে অনেক বেশী সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহাদের লেজ খুব বড় ও শোভাযুক্ত; শুধু লেজ কেন, ডানা এবং গায়ের বেশীর ভাগ পালকই লাল, কালো, সবুজ, বেগুনি, হলুদ ও খয়েরি রং-এর মিশ্রণে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত। ঠিক যেন সিল্কের ছাপা বুটিদার শাড়ী! রঙের ঔজ্জ্বল্যে একমাত্র আমেরিকার 'হামিং বার্ড'ই ইহার পাশে দাঁড়াইতে পারে।

চীন, ব্রহ্মদেশ, মলক্কা-দ্বীপ, এসিয়া-মাইনর এবং হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে নানা জাতীয় ফেঝ্যান্ট্ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে চীনদেশের 'স্বর্ণ ফেঝ্যান্ট্' (Golden Pheasant) সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। আমাদের দেশের 'কালিজ ফেঝ্যান্ট্'ও (Kalij Pheasant) সৌন্দর্য্যে কম যায় না।

ইহারা নির্জ্জন ঝুপীর মধ্যে মাটিতে বাসা তৈয়ারি করে। আশ-পাশের গাছপালার সহিত ফেঝ্যান্টের রং এমন মিলিয়া যায় যে, বাসার খুব নিকট হইতেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। একবারে ইহাদের ২০টি পর্য্যন্ত ডিম হয়।

মুরগী

মুরগী (Fowl) আমাদের বিশেষ পরিচিত পাখী। পুং-মুরগীকেই 'মোরগ' বলে। ইহাদের চেহারা খুব জমকালো। বেশীর ভাগ মোরগের মাথায় লাল রং-এর ঝুঁটি বাহির হয়। স্ত্রী-জাতি দেখিতে তেমন সুন্দর নহে এবং আকারেও অনেক ছোট। আমাদের দেশের কোন কোন পাহাড়ে জঙ্গলে বন-মুরগী (Jungle-Fowl)



গৃহপালিত মোরগ

দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত মুরগী তাহাদেরই বংশধর। পোষা মুরগী সাদা, কালো, হল্‌দে, লাল নানা রংএর হইয়া থাকে; কোন কোনটা আবার এই সব রং-এর মিশ্রণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। বন-মোরগ কিন্তু সেরূপ হয় না; এক জাতীয় সকল গুলারই চেহারা প্রায় এক রকমের।

পোষা মোরগ অপেক্ষা বন-মোরগ আকারে কিছু ছোট হইয়া থাকে। এদেশে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পোষা মোরগ আকারে বেশ বড় হয়, কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশের পোষা মোরগ আরো বড় এবং আরো বেশী সুন্দর। যাভাদ্বীপের এক জাতীয় বন-মোরগ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি।

মোরগের স্বভাব খুব হিংসুটে। এক দলে একটার বেশী সর্দ্দার জুটিলে আর রক্ষা নাই। দুইটা মোরগ একত্র হইলে অমনি মারামারি সুরু করিয়া দেয়। সে মারামারি খেলা নয়— রীতিমত রক্তারক্তি কাণ্ড! একটাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত না করিয়া অন্যটা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। কখনো কখনো দুইটাতেই আধমরা হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।



বন-মোরগ

আমাদের দেশে দুই জাতীয় বন-মুরগী বেশী দেখা যায়। এক জাতির (Gallus gallus) বাস, পশ্চিম সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব্ব আসাম ছাড়া ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই। ইহাদের 'লাল বন-মুরগী' (Red Jungle-Fowl) বলে। ইহারা দেখিতে অনেকটা পোষা মোরগেরই মত। অপর জাতির (Gallus Sonneratii) বাস ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে আবু পর্ব্বত হইতে কেপ কমোরিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই। ইহাদের 'ধূসর বন-মুরগী' (Grey Jungle-

Fowl) বলে। লাল বন-মোরগ ও ইহারা আয়তনে ও দেখিতে একই রূপ; কেবলমাত্র ইহাদের বুকের পালক সাদা, তাহার উপরে কাল্‌চে লম্বাটে ডোরা দাগ।

তিতির

'তিতির' (Partridge) দেখিতে কতকটা ছোট মুরগীর মত। ইহারা প্রধানতঃ তিন জাতীয়। এক জাতি (Francolinus pictus) কটা ও ধূসরে মেশানো (Painted Partridge), দ্বিতীয় জাতি (Francolinus pondicerianus) ধূসর ও পাট্‌কিলে মেশানো (Grey partirdge) এবং অপর জাতি (Francolinus vulgaris) কালো। কালো তিতিরের (Black Partridge) ডানা ও লেজের চাক্‌চিক্য খুব সুন্দর। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদের কোন না কোন একটি জাতিকে দেখা যায়।

তিতির সারাদিন মাটিতে চরিয়া বেড়ায় এবং সকালে ও সন্ধ্যায় খুব বেশী ডাকাডাকি করে; ইহারা সামান্য গাছপালার মধ্যে এমন কৌশলে গা-ঢাকা দিয়া থাকে যে, ডাক শুনিয়াও ইহাদিগকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।



তিতির

ইহারা ঘাস, খড় ও পাতা দিয়া ঘাসের বনে বা কাঁটার ঝুপীর মধ্যে বাসা তৈয়ারি করে। স্ত্রী-পাখী একবারে ৪টি হইতে ৮টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের ডিমের রং হল্‌দে।

স্ত্রী-তিতির অতি যত্নে ছানাগুলিকে পালন করে। জন্মের পরেই তাহারা বেশ চট্‌পটে হইয়া উঠে। কোন শত্রু কাছে আসিলে, ছানাগুলি চোখের নিমেষে গাছ-পালার মধ্যে লুকায়, আর ধাড়ী পাখী যেন আহত হইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। শত্রু যত তাড়া করিয়া যায়, সে-ও ধরা দেয় দেয় করিয়া ক্রমে তাহাকে আরো দূরে লইয়া যায়। এই ভাবে শত্রুকে অনেক দূরে লইয়া গিয়া, হঠাৎ উড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয় এবং চুপি চুপি ছানাগুলির কাছে ফিরিয়া আসে।

ইহাদের মাংস খাইতে খুব সুস্বাদু। অতি সহজেই ইহারা পোষ মানে এবং পালকের এত বাধ্য হয় যে প্রভুভক্ত কুকুরের মত পিছন পিছন ঘুরে, প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় ও আজ্ঞা পালন করে। লড়াই-খেলার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই

ইহাদের খুব আদর। লড়াই-খেলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য খুব বাচ্চাবেলা হইতেই ইহাদের পুষিতে হয়।

কীট-পতঙ্গ, উই ও পিঁপড়ার ডিম এবং নানারকম শস্য, শাক্-শব্জি ইহাদের খাদ্য।

বটের

'বটের' (Quail) তিতির-বংশের পাখী। উভয়ের স্বভাবে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার নানা স্থানেই ইহাদের বাস। ভারতবর্ষেও ইহাদের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আমাদের দেশে ৫।৬ জাতীয় বটের আছে। তাহাদের মধ্যে কয়েক জাতি (Perdicula) আকারে ছোট। উহাদের হিন্দিতে 'গির্জা' বা 'লোয়া' (Bush-Quail) বলে।



বটের

ইহারাও ঠিক তিতিরের মত সর্ব্বদা গা-ঢাকা দিয়া চলে। কাহারো পায়ের শব্দ পাইলে এমনভাবে লুকায়, যে কোন মতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিকারী কুকুর যে এত চালাক-চতুর, তাহারাও ইহাদের দুষ্টামীর কাছে হার মানিয়া যায়। অনেক সময় কুকুরের দৃষ্টি এড়াইয়া বটের এত নিকট হইতে উড়িয়া পালায়, যে মনে হয়, যেন তাহাদের পায়ের নীচেই সে লুকাইয়া বসিয়া ছিল।

এই পাখী মাটিতে কোন গর্ত্ত দেখিলে, তাহার ভিতর খড়-কুটা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং একবারে ৪টা হইতে ১৪টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিমের রং হল্‌দের উপর পাটকিলের ছিট।

বটের এক স্থানে বেশী দিন বাস করে না। ইউরোপে যাহারা গ্রীষ্মকাল কাটায়, শীতকালে অনেক সময় তাহাদিগকে আফ্রিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইহারা শীতকালেই চরিতে আসে।

গিনি-ফাউল

অনেক কাল আগে 'গিনি-ফাউল' (Guinea-Fowl) শুধু পশ্চিম-আফ্রিকাতেই পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন ইহারা মানুষের কল্যাণে গৃহপালিত হইয়া নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশেও যথেষ্ট গিনি-ফাউল আছে। বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে 'চিনা মুরগী' বলে।

ইহাদের গায়ের রং নীলচে, তাহার উপর ফুটকি; মাথায় একটি চূড়া থাকে

এবং চোখের দুই পাশ হইতে মোরগের ঝুঁটির মত দুইখানি লাল পাতা ঝুলিয়া পড়ে।



গিনি-ফাউল

বহুকাল হইতে গৃহপালিত হইলেও গিনি-ফাউল কিছুতেই ভালরূপ পোষ মানিতে চাহে না। বিশেষতঃ ডিম পাড়িবার সময় বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যে পলাইয়া ডিম দিয়া আসে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। ইহারা একবারে ১০টি হইতে ২০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

গিনি-ফাউলে খায় না, এমন জিনিস নাই; সব রকম শস্য ও তরকারী; ফল, ফুল, লতা, পাতা এবং পোকা-মাকড় ইহাদের খাদ্য।

টার্কি বা পেরু

উত্তর-আমেরিকা এই পাখীর আদিম বাসস্থান; কিন্তু এখন গৃহপালিত হইয়া প্রায় সব দেশেই 'টার্কি' বা 'পেরু' (Turkey) আছে। ইহাদের গায়ের পালক যেমন সাজানো-গুছানো, সেগুলির রং-চংও তেমনি সুন্দর। পুরুষ-পেরুর বুক হইতে যে শিথিল চর্ম্মের পাতা ঝুলিয়া পড়ে, তাহাও তেমনি শোভাযুক্ত।



পেরু

ইহাদের নাচ দেখিবার মত জিনিস। নাচিবার সময় ইহারা লেজের পালকগুলি পাখার মত বিস্তার করিয়া রাখে এবং ডানার পালকগুলি কখনো ফুলাইয়া, কখনো গুটাইয়া, কখনো বা নানাভাবে হেলাইয়া-দুলাইয়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে।

বুনো টার্কি খুব নির্জ্জন স্থানে বাসা তৈয়ারি করে এবং প্রায় প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সেই বাসায় যাতায়াত করিয়া থাকে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই এই কৌশল! তথাপি যদি শত্রু আসিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে ইহারা নানা

ছল-চাতুরীর দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া, বাসা হইতে দূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা ইহাদের স্বভাব।

ডিম ফুটিয়া ছানা হইবামাত্র, স্ত্রী-পক্ষী তাহাদিগকে লইয়া খাবারের চেষ্টায় বাহির হয়। ইহাদের পুরুষ-জাতি খুব রাগী, সর্ব্বদাই ছানাগুলিকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কেবল পক্ষিণীর কৌশলে তাহারা রক্ষা পায়। পেরু দলে দলে বাস করিতে ভালবাসে।

দীর্ঘজঙ্ঘবর্গ

এই বর্গের প্রায় সব পাখীরই গলা, পা ও আঙ্গুল খুব লম্বা। অধিকাংশের



ঠোঁটও বড় বড়। ইহাদের ৪টি আঙ্গুলের মধ্যে ১টি পিছনদিকে ও ৩টি সম্মুখদিকে; আঙ্গুলগুলি সন্তরক পক্ষীদের মত চামড়া দিয়া জোড়া নহে।

ইহাদের কতকগুলি খাল, বিল ও পুকুরের ধারে চরিয়া বেড়ায় আর কতকগুলি স্যাঁৎসেতে নোংরা জায়গা বেশী পছন্দ করে। জোলো ইঁদুর, ব্যাঙ, মাছ, চিংড়ি ও জলের পোকা ইহাদের খাদ্য।

ডিম ফুটিবামাত্র ইহাদের ছানাগুলি বেশ চট্‌পটে হইয়া উঠে এবং প্রয়োজনমত আপন আপন আহার সংগ্রহে ব্যস্ত হয়।

খৈরি, জলপিঁপি, পান-মোরগ, ডাহুক, স্নাইপ্ প্রভৃতি কাদাখোঁচা দলের অন্তর্গত। ইহারা খাল, বিল অথবা পুকুরের ধারে হোগ্‌লা প্রভৃতির জঙ্গলে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। সচরাচর এই সকল পাখীর ঠোঁট লম্বা হইয়া থাকে। সেই ঠোঁট দিয়া কাদার ভিতর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে 'কাদাখোঁচা'।

এই দলের অধিকাংশ পাখীই দেশভ্রমণকারী। শীতকালে এদেশে যত রকম কাদাখোঁচা দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে তাহার সিকিও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

ডাহুক

পাড়াগাঁয়ের বড় বড় পুরাতন দীঘি ও পুকুরের ধারে হোগ্‌লা, বেনা প্রভৃতি জঙ্গলে এবং বাঁশবনে 'ডাহুক' বা 'ডাক' (White-breasted Waterhen) দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাখী আকারে এক একটি তিতিরের মত। ইহাদের বুক, গলা ও

মাথা সাদা ; গায়ের আর সব পালক গাঢ়-ধূসর ও খয়েরি ; পায়ের পাতা জোড়া না হইলেও, ইহারা পানা ও কল্মীদলে ভরা পুকুরে সাঁতার দিয়া অনেক সময় খাদ্য-সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ডাহুকের স্বর খুব কর্কশ। সময় সময় অনেক গুলাতে একসঙ্গে মিলিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের ছানা হয়। ইহারা ৬।৭টি ফিকে হলুদ বা ফিকে লালের উপর লাল্‌চে পাট্‌কিলের ছোপযুক্ত ডিম পাড়িয়া থাকে।

পান-মোরগ

'পান-মোরগ' (Moorhen) দেখিতে অনেকটা হাঁসের মত। ইহাদের গায়ের রং কালো, কেবল লেজের ভিতর-পিঠ, ও ডানার দুই চারিটি পালক সাদা ; আঙ্গুল খুব বড় ও ঝালরযুক্ত বলিয়া ইহারা প্রায় হাঁসেরই মত সাঁতার দিতে পারে।



পান-মোরগ

পান-মোরগের ঠোঁটের উপর একটি সাদা তিলক দেখা যায়। ইহারা নানা জাতের হয়। 'কায়েম' (Purple Moorhen বা Purple Coot) বলিয়া ইহাদের এক জাতি (Porphyrio poliocephalus) দেখিতে খুব সুন্দর।

এই পাখী নির্জ্জন পচা পুকুরে ও জঙ্গলে ভরা খালে-বিলেই থাকে এবং জলের গাছেই বাসা তৈয়ারি করে। কখনো কখনো এমন হয় যে, জোর বাতাসে ডাল-পালা হইতে খসিয়া পড়িয়া সেই বাসা জলের উপর ভাসিতে থাকে। তখন ইহাদিগকেও ভাসিতে ভাসিতে বাসায় বসিয়া ডিমে তা' দিতে দেখা যায়।

জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ইহারা ৫টি হইতে ১২টি ফিকে হলুদের উপর ঘন লাল্‌চে পাট্‌কিলের ছোপযুক্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম হইতে ছানা ফুটিতে ২১ দিন সময় লাগে।

জলপিঁপি

ইউরোপ ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সকল দেশেই 'জলপিঁপি' (Bronze-winged Jacana) আছে। আমাদের দেশের পচা পদ্ম-পুকুরে ও খালে-বিলে অনেক সময় ইহাদিগকে দেখা যায়। জলপিঁপির গায়ের পালক প্রায় আগাগোড়াই কালো, কেবল ডানা কাল্‌চে সবুজ। আমাদের দেশে আরেক জাতীয় (Hydrophasianus chirurgas) জলপিঁপি দেখা যায়, বাঙ্গলায় উহাদের 'জল-ময়ূর' (Pheasant-tailed Jacana) বলিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রঙ সাদা ও ঘন কাল্‌চে পাট্‌কিলে এবং লম্বা ঝুঁটির মতন লেজ থাকে।



জলপিঁপি

জলপিঁপির পা বেজায় লম্বা; আঙ্গুল আবার এত লম্বা যে, মাটিতে ইহারা ভাল রকম চলিতেই পারে না, কিন্তু জলে পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতির পাতার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে। আঙ্গুল খুব লম্বা বলিয়া একসঙ্গে ৩।৪টি পাতার উপর ইহাদের শরীরের ভার পড়ে। সেইজন্য পাতাগুলি একেবারে তলাইয়া না গিয়া, কতক ডুবিয়া যায় মাত্র। সেই অবস্থায় দেখিলে মনে হয়, এই পাখী যেন জলের উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়াছে।

ইহারা জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ৪টি ডিম পাড়িয়া থাকে।

স্নাইপ্ বা কাদাখোঁচা

কাদাখোঁচা-দলে 'স্নাইপ্' (Common Snipe) ছাড়া আরো অনেক পাখী আছে, কিন্তু বাঙ্গলায় স্নাইপ্‌কেই বিশেষ করিয়া কাদাখোঁচা বলা হয়। ইহাদের ঠোঁট খুব লম্বা ও কোমল। সেই ঠোঁট দিয়া কাদা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে 'কাদাখোঁচা'। উড়িবার সময় ইহারা কখনো সোজাভাবে যায় না। একবার এদিক্, একবার উঁচু, আবার নীচু—এইরূপ ঢেউ-খেলানো ভাবে উড়িতে

উড়িতে ক্রমাগত 'চিক্-চিক্—চিকা-চিকা-চিকা' রবে ডাকিতে থাকে। গরম দেশ ইহারা একেবারেই পছন্দ করে না। আমাদের দেশে কেবল শীতকালেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্নাইপের একবারে ৪টি করিয়া ডিম হয়; ডিমের রং ফিকে বাদামী।



স্নাইপ্ বা কাদাখোঁচা

কোন কারণে ভয় পাইলে বা বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে ইহার কৌশলে ছোট ছোট ছানাগুলিকে লইয়া বহুদূরে পলায়ন করে।

খৈরি

জলার ধারে নল-খাগ্ড়া প্রভৃতির বনে 'খৈরি' (Spotted Rail) এমন কৌশলে লুকাইয়া থাকে যে, সহস্র চেষ্টাতেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেশী রকম তাড়া দিলে, নিঃশব্দে ডুব দিয়া বহুদূরে চলিয়া যায় এবং লুকাইয়া অন্য জঙ্গলে আশ্রয় লয়। খৈরির বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে শিকারী কুকুরকেও হার মানিতে হয়। নানা জাতীয় পোকা, মাকড়, জোঁক, গেঁড়ি, শামুক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য।



খৈরি

ইহারাও শীতকালে আমাদের দেশে আসে। ইহারা ৮টি হইতে ১২টি ফিকে গোলাপী রঙের ডিম পাড়িয়া থাকে।

সারস

ভারতবর্ষের পক্ষীর মধ্যে 'সারস'ই (Sarus Crane) সর্ব্বোচ্চ। আকারে সাদৃশ্য দেখিয়া পূর্ব্বে লোকে ষ্টর্ক্ ও সারসকে এক জাতীয় পাখী বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু এই উভয় পাখীর কঙ্কাল, কোন কোন অঙ্গ এবং পালকের সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া এই স্থির হইয়াছে যে, ষ্টর্ক্ ও সারস দীর্ঘজঙ্ঘের অন্তর্গত হইলেও, সম্পূর্ণ ভিন্ন গণের বা দলের পাখী।



সারস

সারস (Crane) প্রায় ১৫।১৬ জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন জাতি উঁচুতে ২ হাতেরও কম, আবার কোন কোন জাতি ৬ হাত। পালকের রং—কোন কোনটার সাদা, কোন কোনটার ধূসর, কোন কোনটার বা কতক ধূসর, কতক সাদা ও কতক লাল। কাহারো লেজ সাদাসিধা ধরণের, কাহারো বা বেশ বাহারযুক্ত। আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে এক জাতীয় সারস আছে, তাহাদের লেজের পালকগুলি বড় হইয়া চামরের মত ছড়াইয়া পড়ে; আর এক জাতির মাথায় সুন্দর ঝুঁটি বাহির হয়।

সারস পাখী দলে দলে বাস করে এবং প্রতি বৎসর দেশ-ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে শত শত পাখী একত্র জড় হয় এবং বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উড়িতে আরম্ভ করে। উড়িবার সময় ইহারা লম্বা পা-গুলি পিছনের দিকে বাড়াইয়া সোজা করিয়া রাখে।

ষ্টর্কের মত সারস পাখীও জলা মাঠ এবং স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করে। ইহারা পোকা, মাকড়, গিরগিটি প্রভৃতিও খায় এবং নানা রকম শস্যও খায়।

প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহাদের ছানা হয়; একবারে ২টি ছানা হইয়া থাকে। সারসের ডিমের রং ফিকে সবুজ বা গোলাপী আভাযুক্ত সাদা।

ষ্টর্ক

ষ্টর্ক (Stork) উঁচুতে ২।২½ হাতের কম নহে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে 'হাড়গিলা' প্রায় ৩¼ হাত। ষ্টর্কের গায়ের অধিকাংশ পালক সাদা, কেবল ডানার শেষদিক্ ও লেজ কালো। ইহাদের ঠোঁট, পা ও আঙ্গুলের রং লাল।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার উত্তরভাগ ইহাদের জন্মস্থান। ভারতবর্ষের সম্বর, চিল্কা প্রভৃতি হ্রদে সময় সময় অসংখ্য ষ্টর্ক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা দেশ ভ্রমণকারী পাখী। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে, হাজার হাজার ষ্টর্ক্ একত্র জড় হয় এবং কয়েকটা সর্দ্দার পাখীর অধীনে সকলে এক সঙ্গে সারবন্দিভাবে উড়িতে উড়িতে দূর দেশে চলিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যাহারা ইউরোপে বাস করে, অনেক সময় শীতকালে তাহাদিগকে আফ্রিকায় আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে।



ষ্টর্ক্

ইঁদুর, ব্যাঙ্, গির্‌গিটি, ছোট ছোট সাপ এবং নানা জাতীয় জলের পোকা ইহাদের খাদ্য। সেই জন্য শুষ্ক মাঠ অপেক্ষা ইহারা নোংরা স্যাঁৎসেতে স্থান বেশী পছন্দ করে। কারণ, ঐরূপ স্থানেই ইহাদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সব ছাড়া, সকল প্রকার পচা গলিত মাংস এবং ছোট ছোট জীব-জন্তুর মৃতদেহ খাইয়া, ইহারা মানুষের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে।

রাশি রাশি ডাল-পালা সংগ্রহ করিয়া, ইহারা গাছের ডালে, ছাদের কার্ণিসে কিংবা কল-ঘরের চিম্‌নির উপর প্রকাণ্ড বাসা তৈয়ারি করে। স্ত্রী-পক্ষী একবারে ২টি হইতে ৫টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে; ইহাদের ডিমের রং সাদা। ছানার প্রতি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান যত্ন দেখা যায়।

হাড়গিলা

ষ্টর্ক-দলের সব পাখীর মধ্যে 'হাড়গিলা' (Adjutant Stork) আকারে বড় এবং দেখিতে কুৎসিত। উঁচুতে ইহারা ৩½ হাতের কম নহে।

ইহাদের মাথা প্রায় নেড়া, ঠোঁট বেজায় বড় ও পা বেজায় লম্বা; ঠোঁটের রং লাল্‌চে; ডানা লেজ ও পা কালো এবং বুক, পেট ও গলা সাদা। এই পাখীর গলা হইতে একটা চামড়ার থলি ঝুলিয়া পড়ে।

কলিকাতা সহরের নানা স্থানেই আগে বুনো হাড়গিলা দেখা যাইত। পুরাতন কলিকাতায় আবর্জ্জনা ফেলার স্থান বা গাড়ী ছিল না; ইহারাই ময়লা খাইয়া আবর্জ্জনা সাফ্ করিত। সেইজন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সীলমোহরে ইহাদের ছবি ব্যবহৃত হয়। এইরূপ সর্ব্ব-ভুক্ পাখী আর নাই বলিলেই হয়।

মাংস, হাড়, চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি সবই ইহাদের কাছে উপাদেয়; টাট্‌কা, পচা কিছুতেই অরুচি নাই। হাড়গিলার গলার ছিদ্র এত বড় যে, একটি আস্ত বিড়াল ইহারা অক্লেশেই জলযোগ করিতে পারে। একটা পোষা হাড়গিলার কথা শুনা গিয়াছে, খুব বড় ভেড়ার আস্ত একখানা পা গিলিতে তাহার কোনই কষ্ট হইত না। আর একটার পেটে আড়াই সের ওজনের একটি ছোট কুকুর পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৩।৪টি; রং সাদা।



হাড়গিলা

মাণিকজোড়

এক রকম ষ্টর্ক্‌কেই এ দেশে 'মাণিকজোড়' (White Stork) বলে। ইহাদের মাথা, ঘাড়, গলা, বুক, পেট ও ডানার উপরদিক্ সাদা, গায়ের আর সব পালকই কালো। আমাদের দেশে ইহাদের আরেক জাতিকে (C. leucocephala) দেখা যায়। তাহাদের গলাটা শুধু সাদা, আর বাকি অংশ মাথা, পিঠ, বুক সব কালো (White-necked Stork)। এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই পাখী দেখিতে পাওয়া যায়; ছোট-নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খুব বেশী। সেখানে ইহাদিগকে 'জাং-হিল' বলিয়া থাকে।



মাণিকজোড়

উড়িবার সময় ইহারা

লম্বা লম্বা পা-গুলি এমন কৌশলে গুটাইয়া রাখে যে, সামান্য ৫০।৬০ হাত দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, শকুন উড়িতেছে।

আইবিস

এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা 'আইবিস'-এর (Ibis) জন্মস্থান। জাতি-ভেদে ইহারা নানা রকমের হইয়া থাকে। কোন কোনটার মাথা, ঘাড়, গলা ও লেজ বাদে গায়ের আর সব পালক সাদা (White Ibis); কোন কোনটার গায়ের বেশীর ভাগ পালক কালো (Black Ibis); কোন কোনটার ডানার শেষ দিক্‌টাই কালো (Ibis leucocephalus); আবার কোন কোনটার ঘাড়, মাথা, গলা, পিঠ সব বাদামী লাল কেবল ডানা ও লেজের শেষভাগ ঘন সবুজ (Glossy Ibis)। ইহাদের মধ্যে যে জাতি সব চাইতে সুন্দর, তাহাদের বাস আমেরিকায়। তাহাদের পালকের রং টুকটুকে লাল (Scarlet Ibis)।

প্রতি বৎসর ইহারা দেশভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মিশর দেশের লোকে ইহাদের আগমণ সৌভাগ্যের লক্ষণ ভাবিয়া ইহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে।

আইবিস্ উঁচুতে প্রায় ২ হাত। ষ্টর্কের মত ইহারাও নোংরা স্যাঁৎসেতে স্থানে ও জলামাঠে বাস করিতে ভালবাসে এবং ইঁদুর, ব্যাঙ্, সাপ প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে। তবে, যে সকল পাখী জলা হইতে অনেক দূরে বাস করিতে বাধ্য হয়, নানাজাতীয় পোকা-মাকড় খাওয়া ছাড়া তাহাদের আর উপায় নাই।



আইবিস্

গাছের খুব উচু ডালে ইহারা বাসা বাঁধে। সচরাচর ইহাদের ডিমের সংখ্যা ২টি, কখনো কখনো ৪টি ডিমও দেখা যায়। ডিমের রং সব্‌জে বা নীলাভ সাদা।

বড় বক বা কাঁক্

এক জাতীয় (Ardea cineria) খুব বড় বকের নাম 'কাঁক্ (Grey Heron)। উঁচুতে ইহারা ২ হাতের কম নহে। ইহাদের ডানার প্রসারও প্রায় ৩ হাত। এই বকের পিঠ ও ডানার পালকের রং ধোঁয়াটে সাদা, ঠোঁট হল্‌দে, পা ফিকে সবুজ; মাথা হইতে কয়েকটি লম্বা লম্বা কালো পালক ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া পড়ে। ইহারা কোন কারণে উত্তেজিত হইলে, ঐ সকল পালক খাড়া হইয়া উঠে।



কাঁক্

কাঁকের ঠোঁট খুব লম্বা, ছুঁচ্‌ল ও শক্ত। কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলে, ইহারা সর্ব্বাগ্রে ঠোঁটের খোঁচা মারিয়া তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করে; এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত বড় বড় পাখীকেও জখম করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে ইহাদের আরেক জাতিকে (Ardea purpurea) দেখা যায়, তাহাদের লাল কাঁক (Purple Heron) বলে। ইহাদের মাথা ও ঝুঁটি সবুজের আভাযুক্ত কালো, বুক, পিঠ ও ডানার কিয়দংশ লাল। কোঁচ্-বকের মত ইহারাও খাল, বিল প্রভৃতির ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং মাছ, চিংড়ি; ব্যাঙ ও ছোট ছোট সরীসৃপ খাইয়া জীবনধারণ করে। আহারের চেষ্টায় যখন স্থিরভাবে অপেক্ষা করে, তখন ইহাদিগকে প্রায়ই একখানা পা গুটাইয়া রাখিতে দেখা যায়।

ইহাদের বাসা কতকগুলি ডাল-পালার স্তূপ বলিলেই হয়। প্রতি বৎসর বাসা না বদলাইয়া ইহারা প্রয়োজনমত পুরানো বাসা মেরামত করিয়া লয়। বসন্তকাল পড়িতেই ইহাদের এক একবারে ৩।৪টি করিয়া ছানা হয়। কখন কখন ৬টিও হইতে দেখা যায়।

গো-বকা

'গো-বকা' (Cattle Egret) লম্বে প্রায় এক ফুট। ইহাদের পালকের রং ধপ্‌ধপে সাদা; ঠোঁট লাল ও পা কালো। শিকারের সময় কোঁচ্-বকের মত একা একা না থাকিয়া ইহারা দলে দলে থাকে। হিন্দিতে ইহাদের 'সুরখিয়া' বলে।

নানা রকম পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গই গো-বকার খাদ্য। ইহারা প্রায়ই গরু-মহিষের পালের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এবং উহাদের চরিবার সময় ঘাসের ভিতর হইতে যে কীট-পতঙ্গ বাহির হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আহার করে। কখনো কখনো গরু-বাছুরের পিঠে চড়িয়াও তাহাদের গায়ের পোকা খাইয়া থাকে।

ইহারা শস্যাদিও ভালবাসে। ধান কাটিবার পর ক্ষেতের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে জড় হইয়া ইহাদিগকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ ইহারা ৪।৫টি করিয়া ফিকে নীল্‌চে সবুজ রঙের ডিম পাড়িয়া থাকে। কখনও কখনও ৬টি ডিমও দেখা যায়।

বক

বক নানা জাতিতে বিভক্ত। বাঙ্গলাদেশে সচরাচর ৫।৭ রকম বক দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সাধারণ বক বা 'কোঁচ্-বক' (Pond Heron বা Paddy Bird) আমাদের খুব পরিচিত। কেহ কেহ ইহাদের 'কানা বক'ও বলে। লম্বে ইহারা ৯ ইঞ্চির বেশী নহে।


বক

ইহাদের পালকের রং ফিকে বাদামী, তাহার উপর সবুজের আভা; কিন্তু মাঝে মাঝে খয়েরি ও ধোঁয়াটে ছোপ্ থাকায় রংটা ঠিক বাদামী বলিয়া বুঝা যায় না। উড়িবার সময় আবার ইহাদের পালকের সাদা রংটাই বেশী চোখে পড়ে। বকের ঠোঁট খুব লম্বা, শক্ত ও ধারালো। শিকার ধরিতে এই ঠোঁটের যেমন প্রয়োজন, কাহাকেও আক্রমণ করিতে হইলেও সেইরূপ। ইহাদের ঠোঁটের আঘাতে মানুষকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

পাড়াগাঁয়ে খাল, বিল, নালা অথবা পুকুরের ধারে ইহারা কেমন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে। এমন শান্তশিষ্ট, নিরীহ পাখী যেন আর দুইটি নাই। কিন্তু একটি ছোট মাছ বা চিংড়ি কাছে আসুক্ দেখি, অমনি ঘাড়টি বাড়াইয়া খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। এই ভাবে সমস্ত দিনই ইহাদের শিকার চলে। শিকারের সময় ইহারা একা একাই থাকে; সন্ধ্যা হইয়া আসিলে দল বাঁধিয়া বাসায় ফিরে।

ইহারা অনেকগুলাতে একই গাছে বাসা তৈয়ারি করে। প্রতি বৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের ছানা হয়। বকের ডিমের সংখ্যা ৩টি হইতে ৫টি, রং বাদামী-কটা।

বাচ্‌কা

আর এক রকম বড় জাতের বক্‌কে 'বাচ্‌কা' (Night Heron) বলে। কোথাও কোথাও ইহাদের 'অকা' বা 'নীল বগ্‌লা' নামও চলিত আছে। এই বক উঁচুতে প্রায় ২ ফুট। ইহাদের মাথা, ঘাড় ও পিঠ কালো; বুক, পেট, গলা ও চোখের চারিপাশ সাদা; ডানা ও লেজ ধোঁয়াটে; চোখ টুকটুকে লাল।



বাচ্‌কা

এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বাচ্‌কা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা রাত্রিচর ; সন্ধ্যার পর আহারের চেষ্টায় বাহির হইয়া 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ করিতে করিতে জলার নিকট উপস্থিত হয় এবং প্রায় সারারাত শিকার করিয়া বেড়ায়। ভোর না হইতে আবার সেইরূপ ডাকিতে ডাকিতে বাসায় ফিরিয়া আসে। ইঁদুর, ব্যাঙ্, চিংড়ি, মাছ, কাঁকড়া ও নানা রকম পোকা-মাকড় ইহাদের খাদ্য। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে বাচ্‌কার ছানা হয়। সচরাচর ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৪।৫টি, রং সবুজাভ নীল।

কান্ঠুঁটি

এই পাখীর ঠোঁট দেখিতে অনেকটা কাণের মত বলিয়া লোকে ইহাদিগকে 'কাণঠুঁটি' (Flamingo) বলে। ইহাদের চেহারা দীর্ঘজঙ্ঘ পাখীদেরই মত ; অথচ হাঁসের সহিত ইহাদের খুব নিকট সম্বন্ধ। সেই জন্য কোন কোন পণ্ডিত কাণঠুঁটিকে দীর্ঘজঙ্ঘ ও সন্তরক-বর্গের মাঝামাঝি এক জাতীয় পাখী বলিয়া মনে করেন।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি প্রায় সকল দেশেই কাণঠুঁটি



কাণঠুঁটি

আছে; আমাদের দেশেও যথেষ্ট আছে। শীতকালে মাদ্রাজের নানাস্থানে এবং দাক্ষিণাত্যের নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে কাণঠুঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছের 'রাণ', উড়িষ্যার 'চিল্কা' ও রাজপুতানার 'সম্বর' হ্রদে সময় সময় এত বেশী কাণঠুঁটি জড় হয় যে, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

উঁচুতে এই পাখী প্রায় ৪ হাত। ইহাদের পা যেমন লম্বা তেমনি সরু, ঘাড় ঠিক সাপের মত লিক্‌লিকে। ইহারা ইচ্ছা করিলে, গলা ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া নিজ নিজ শরীরকে বেষ্টন করিতে পারে। কাণঠুঁটির গায়ের রং লাল্‌চে। দেশ-ভেদে কোন কোন পাখী উজ্জ্বল লাল, কোন কোন পাখী গোলাপী। ইহাদের ঠোঁটের গোড়ার দিক্ হল্‌দে, শেষদিক্ কালো।

ইহারা সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া অল্প জলে মাথা ডুবাইয়া যখন খাদ্য সংগ্রহ করে, তখন এমন ভাবে পা-গুলি নাড়িতে থাকে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন শত শত পাখী একসঙ্গে নৃত্য করিতেছে। কাদায় যে সকল জীবাণু অথবা ছোট ছোট উদ্ভিদ্ সংলগ্ন থাকে, তাহাই ইহাদের খাদ্য। ঘাড় উল্টাইয়া উপরের ঠোঁট মাটিতে রাখিয়া খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা কাণঠুঁটির স্বভাব।

ইহারা খুবই সতর্ক। যখন আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে অথবা বিশ্রাম করে, তখন দলের দুই চারিটিকে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত রাখে। বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখিলে, উহারা এক প্রকার শব্দ করে। সেই ইঙ্গিতে দলের সব পাখী উড়িয়া পালায়। উড়িবার সময়ও ইহারা প্রহরীর নির্দ্দেশমত চলে।

কাণঠুঁটি ডাল-পালা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে না, মাটি ও বালির উঁচু উঁচু ঢিপি বানাইয়া, শরীরের চাপে সেগুলি বেশ মোলায়েম করিয়া লইয়া তাহাদের উপর দুইটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে। এক সঙ্গে ইহাদের সারি সারি অনেক বাসা দেখা যায়।

সন্তরকবর্গ

এই বর্গের পাখী প্রায় ৬০০ ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভক্ত। অধিকাংশই শীতপ্রধান দেশবাসী। ইহাদের প্রতি পায়ে ৪টি করিয়া আঙ্গুল থাকে—সম্মুখে ৩টি, পিছনে ১টি। পিছনের অঙ্গুলটি ছোট। কাহারো আবার পিছনের আঙ্গুলটি একেবারেই থাকে না। সাধারণতঃ সন্তরক পক্ষীর সম্মুখের ৩টি আঙ্গুল পাত্‌লা চাম্‌ড়া দিয়া জোড়া থাকে। কোন কোন জাতির চারিটি আঙ্গুল এইরূপ জোড়া দেখা যায়।

ইহাদের পা প্রায়ই ছোট হইয়া থাকে। পা-গুলি শরীরের অনেকখানি

পশ্চাতে সংলগ্ন; সেই জন্য ইহারা মাটিতে ভালরূপ চলিতে পারে না।

ইহাদের কোন কোন পাখীর ছানা ডিম হইতে ফুটিয়াই আহার অন্বেষণে বাহির হয়, আবার কেহ বা উড়িতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত পিতামাতা কর্ত্তৃক পালিত হয়।

এই বর্গের কোন কোন পাখীর ডানা খুব বড়। তাহারা উড়িতে উড়িতে দিনের পর দিন কাটাইয়া দেয়, তবুও ক্লান্ত হয় না। আবার কোন কোন জাতির ডানা নামমাত্র থাকে। তাহারা একেবারেই উড়িতে পারে না। সাধারণতঃ ইহারা সমুদ্রোপকূলে বাস করে এবং ঝাঁপ দিয়া জলের তলায় সাঁতার দিয়া আহার অন্বেষণ করিয়া ফিরে।

ইহাদের মধ্যে একটি জাতি মাত্র নিরামিষভোজী, আর বাকী সকলেই মাছ, শামুক, গুগ্‌লি ও নানাবিধ জলজ পোকা-মাকড় খাইয়া থাকে।

অ্যাল্‌বাট্রস্‌

পৃথিবীর দক্ষিণ মহাসাগরের উপকূলে 'অ্যাল্‌বাট্রস্‌' (Albatross) দেখিতে পাওয়া যায়। লম্বে এই পাখী ৫ ফুটের কম নহে। সন্তরক পক্ষীদের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহাদের গায়ের রং কটা, কেবল ডানার কয়েকটি পালক কালো। ডানা প্রকাণ্ড বলিয়া ইহারা ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন তীর হইতে শত শত মাইল দূরে সমুদ্রের উপর উড়িতে থাকে। প্রবল ঝড়ের সময়ও ইহাদের উড়িবার শক্তি কমে না এবং সাঁতার দিবার সময় সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গেও ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে না।



অ্যাল্‌বাট্রস্‌

এই পাখী একেবারে সর্ব্বভুক্‌। মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি তো খায়ই, এমন কি, জাহাজ হইতে ছাল-চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি, হাড়, তরকারীর খোসা, চটের টুক্‌রা, ছেঁড়া জুতা প্রভৃতি

ভালমন্দ যাহা কিছু ফেলিয়া দেওয়া হয়, সবই ইহারা আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। একবারে ২।৩ সের মাংস বা চর্ব্বির ডেলা গিলিয়া ফেলিতে ইহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

গাং-চিল

'গাং-চিল' (Tern) নানা রকমের হইয়া থাকে। সচরাচর আমাদের দেশে যেগুলিকে দেখা যায়, তাহাদের এক জাতের (Sterna aurantia) মাথা, ঘাড়, পিঠ, ডানা, ও লেজ কালো এবং গলা, বুক ও পেট সাদা (River Tern)। আর এক জাতের সর্ব্বাঙ্গই ধোঁয়াটে সাদা (Gull-billed Tern)।


গাং-চিল

ইহাদের পায়ের তলা জোড়া ; ঠোঁট শক্ত ও লম্বা এবং ডানা খুব বড়। একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া উড়িয়া বেড়াইলেও ইহারা ক্লান্ত হয় না।

এই পাখী নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের তীরে বাস করে এবং প্রায় সারাক্ষণই শিকারের চেষ্টায় জলের উপরে উপরে উড়িতে থাকে। ইহারা এমন ক্ষিপ্রতার সহিত ছোঁ মারিয়া মাছ ধরে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় ; সাঁতার দিতে দিতে যখন দলে দলে ঢেউয়ের সঙ্গে উঠিতে-নামিতে থাকে, তখনকার সেই দৃশ্য বড়ই চমৎকার !

গাং-চিলের প্রধান খাদ্য মাছ, কিন্তু জলাশয়ে প্রবল ঝড় উঠিলে ইহারা ক্ষেতে পড়িয়া পোকা-মাকড় ধরিয়াও খায়। ডিম পাড়িবার সময় ইহারা কোন দ্বীপে বা পর্ব্বতে আশ্রয় লয় এবং জলজ উদ্ভিদের দ্বারা বাসা তৈয়ারি করে।

গগনভেড়

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাস্থানে 'গগনভেড়' (Pelican) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। আমাদের এই ভারতবর্ষেই চার



গগনভেড়

রকম গগনভেড় আছে। লম্বে ইহারা কোন কোন জাতি ৪ ফুটেরও বেশী। হিন্দিতে ইহাদের 'হাওয়াসিল' বলে। আমাদের দেশের সন্তরক পক্ষীদের ভিতর ইহারাই আয়তনে বৃহৎ।

এই পাখীর গায়ের রং ধূসর ও সাদা; ঠোঁট খুব লম্বা এবং নীচের ঠোঁটের তলদেশে—গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত—একটা প্রকাণ্ড থলি থাকে; ঐগুলি ইহাদের মাছ ধরিয়া রাখিবার ঝুড়ি। ঝুড়িগুলি ভরিয়া উঠিলে, ইহারা অবসরমত তাহা খায় এবং ছানাগুলিকে খাওয়ায়। গগনভেড় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং শত শত পাখী একত্রে নদী অথবা জলাশয়ে সারবন্দিভাবে বসিয়া, মাছ শীকার করিয়া থাকে। সুন্দরবনে ও পূর্ব্ব-বাঙ্গলার বড় বড় নদীতে অনেক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্‌মোর‍্যাণ্ট্

অ্যাল্‌বাট্রসের মত 'কর্‌মোরাণ্ট্'ও (Cormorant) দলে দলে সমুদ্র-উপকূলে বাস করে। গ্রীণলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ও চীনদেশে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাখী আকারে এক একটি ছোট রাজহাঁসের মত। ইহাদের ডানার রং কটা, গায়ের আর সব পালকই নীল্‌চে কালো।

কর্‌মোর‍্যাণ্ট্ খুব পেটুক পাখী। রাশীকৃত মাছ খাইলেও ইহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ইহারা কেবল যে উড়িতে উড়িতে এবং সাঁতার দিতে দিতে শিকার করে, তাহা নহে, উদ্বিড়ালের মত ডুবিয়া, মাছের পিছু পিছু তাড়া করিয়াও মাছ ধরিয়া থাকে। ইহাদের সম্মুখে পড়িলে একটি মাছেরও পলাইবার উপায় থাকে না।



কর্‌মোরাণ্ট্

চীনদেশে এই পাখীর দ্বারা কৌশলে মাছ ধরাইবার রীতি আছে। চীনেরা এইজন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ছোটবেলা হইতে পাখীগুলিকে শিকারের কৌশল শিক্ষা দেয়। তার পর শিক্ষিত পাখীর গলায় সূতা

বাঁধিয়া, মৎস্য শিকারে বাহির হয়; সূতা এমন করিয়া বাঁধে যে, পাখী চেষ্টা করিলেও ধরা মাছ গিলিয়া ফেলিতে পারে না। মাছ খুব বড় হইলে, ২।৩টি পাখী একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া নৌকার উপর উঠাইয়া আনে।

পানকৌটি

'পানকৌটি' (Cormorant) গরম দেশের পাখী। ইহারা আমাদের দেশের 'কর্‌মোর‍্যাণ্ট্'। সমুদ্র উপকুলের 'কর্‌মোর‍্যাণ্ট'-এর জ্ঞাতি ভাই। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং বোর্ণিও পর্য্যন্ত ইহাদের দেখা যায়।

ইহারা তিন জাতীয়— বড় (Large Cormorant), মেজ (Indian Shag) এবং ছোট (Little Cormorant)। ইহাদের ছাঁদ লম্বাটে; গলা খুব লম্বা; ঠোঁট খুব বড় ও ছুঁচ্‌ল; গায়ের রং প্রায় আগাগোড়াই কাল্‌চে, কেবল ডানা ও পা ধূসর। এই তিন জাতিকে কখন কখন একসঙ্গে বাস ও বিচরণ করিতেও দেখা যায়।

ইহারা ছাড়া ইহাদের সঙ্গে আরেক জাতীয় (Anhinga melanogaster) পাখী দেখা যায়, তাহারা ইহাদেরই দলভুক্ত। তাহাদের গলা সাপের বা বকের মত লম্বাটে ধরণের। উহাদের গায়ের রঙ ঘন কালচে পাট্‌কিলে। বাঙ্গলায় ইহাদের 'গয়ার' (Darter বা Snake-bird) বলে।

সারাদিনই খাবারে চেষ্টায় ইহারা ব্যস্ত। খাল, বিল বা পুকুরের ধারে বসিয়া হয় তো একটা মাছ দেখিতে পাইল, অমনি তীরবেগে উড়িয়া গিয়া ঝপাং করিয়া তাহার পিঠে পড়িল। শিকার হঠাৎ যদি ফস্‌কাইয়া যায়, তবু ইহারা ছাড়ে না—পিছন পিছন জলে ডুবিয়া ভোঁদড়ের মত তাড়া করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। এইভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের শিকার চলে।


স্নেকবার্ড বা গয়ার

জল ছাড়া পানকৌটির এক দণ্ডও চলে না। সারাদিন জলে বাস, জলে

আহার, জলে-ভাসা ডাল-পালার উপরে বিশ্রাম। কেবল রাতের কয়েক ঘণ্টা ইহারা জলের ধারে কোন গাছে আশ্রয় লয়, আর বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়িবার সময় দিনের বেলাতেও ইহাদিগকে গাছের ডালে দেখা যায়। জলে চলাফেরা পানকৌটির পক্ষে এমন স্বাভাবিক যে, ইহারা যে স্থলের পাখী তাহা মনেই হয় না।

হংস

পৃথিবীর নানাস্থানে কমপক্ষে ২০০ রকম হাঁস আছে। ইহাদের প্রায় সকল জাতিই স্বাধীনভাবে বনে-জঙ্গলে, নদী-হ্রদে ও খাল-বিলে চরিয়া বেড়ায়। সামান্য কতকগুলা মাত্র পোষা হইয়া মানুষের ঘরে বাস করে।



পাতিহাঁস

হাঁসের পা শরীরের খুব পিছনে থাকে, সেই জন্য ইহারা মাটিতে তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না, কিন্তু আঙ্গুলগুলি চামড়া দিয়া জোড়া বলিয়া স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিতে পারে। ইহাদের ঠোঁট চেপ্টা এবং উহার দুই পাশ করাতের দাঁতের মত খাঁজ্ কাটা। হাঁস যখন জল-কাদা ও পাঁকের ভিতর হইতে ঠোঁটের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, তখন সমুদয় জল ও কাদা সেই খাঁজের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়। হাঁসের সর্ব্বাঙ্গে ঘন কোমল 'পর' থাকে, তাহাদের উপর আবার বড় বড় পালকের আবরণ। সেই সকল পর ও পালক এমন ভাবে সজ্জিত যে, এক বিন্দু জলও তাহাদের উপর দাঁড়াইতে পারে না।

বাঙ্গলাদেশে সচরাচর যে সকল হাঁস গৃহে পালিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে 'পাতিহাঁস' (Domestic Duck) বলে। পাতিহাঁসের গড়ন-পেটন, চাল-চলন খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জানিতে কিছু বাকি নাই। এ দেশের কোথাও কোথাও 'চিনা হাঁস'-এরও (Chinese Goose) যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়। চিনা হাঁস (Cygnopsis cygnoides) আকারে গৃহপালিত হাঁসের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহাদের পুরুষ জাতির ঠোঁটের উপরে মোরগ্-জটা ফুলের মত এক একটি চূড়া বাহির হয়। ইহা ছাড়া গৃহপালিত হাঁসের মধ্যে 'মাস্কোভি' (Muscovy), 'পিকিন' (Pekin), 'রুয়েন' (Rouen) ও 'রাণার' (Runner) খুব প্রসিদ্ধ।

পোষা হাঁস মাত্রেই বুনো হাঁসের বংশধর। কিন্তু এই উভয়ে কত তফাৎ। বুনো হাঁস আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। আগেও ইহাদের পূর্ব্ব-

পুরুষেরা হাজার হাজার মাইল পার হইয়া— হিমালয়ের মত উঁচু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, এখনকার বুনো হাঁসও ঠিক তেমনি ঘুরিয়া বেড়ায়; আর মানুষের ঘরে থাকিতে থাকিতে পোষা হাঁস ক্রমে এমন অকর্ম্মণ্য



বন্য হংস

হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি শিয়াল কিংবা কুকুরের গ্রাস হইতে উড়িয়া আত্মরক্ষা করিবে, তাহাদের সে ক্ষমতাটুকুও নাই।

আমাদের দেশে শীতকালে যে সকল বুনো হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে বালিহাঁস (Cotton-Teal), দিগ্‌হাঁস (Pintail Duck), সরাল্ (Whistling-Teal), চকাচকি (Ruddy Sheldrake বা Brahminy Duck) প্রভৃতি প্রধান। সমুদয় শীতকাল ইহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাস করে, শীত কমিয়া আসিলে তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি ঠাণ্ডা দেশে চলিয়া যায়। এই সকল বুনো হাঁস নানা আকারের ও নানা রং-এর হইয়া থাকে। অধিকাংশের মাথা, ঘাড়, গলা, বুক, ডানা ও লেজের চাক্‌চিক্যে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বুনো হাঁস খুব সাবধানে চলাফেরা করে। হঠাৎ ভয় পাইলে, বা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে, ইহাদের দলপতির আদেশে এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া সমস্ত দল একসঙ্গে উড়িয়া, শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইহাদের কোন কোন জাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অতি প্রবল আকর্ষণ জন্মে। 'চকাচকি'র (Casarca ferruginea) দাম্পত্য-প্রেম প্রসিদ্ধ।

রাজহংস

রাজহাঁস (Swan) প্রায় ৯।১০ জাতিতে বিভক্ত। আমাদের ভারতবর্ষে 'সোয়ান' জাতীয় রাজহাঁস দেখা যায় না। বাঙ্গলাদেশে যে দুই রকম রাজহাঁস (Goose) সচরাচর দেখা যায়, তাহাদের এক জাতি (Grey Goose) বন্য এবং আকারে কিছু ছোট; তাহাদের গলাও ছোট এবং পালকের রং ফিকে ধূসর বা বাদামী। আর এক জাতি (Domestic goose) বেশ বড়; তাহাদের গলা খুব লম্বা এবং পালকের রং সাদা। ইহারা গৃহপালিত এবং প্রথম বন্য জাতি (Anser cinerus) হইতেই ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। এই বন্য জাতীয় রাজহাঁসের উড়িবার কায়দা কিন্তু খুব সুন্দর। ইহারা যখন দল বাঁধিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শূন্যে উড়িয়া চলে, তখন নীচ হইতে ইংরাজি 'ভি র (V) ন্যায় দেখায়।



রাজহংস

'সোয়ান' রাজহাঁসের গলা খুব লম্বা। অনেকটা ইংরাজি 'এস্' (S)-এর ন্যায়। ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। লম্বা গলা হেলাইয়া দুলাইয়া যখন ইহারা দলে দলে জলের উপর সাঁতার দিতে থাকে, তখন ইহাদের ভাবভঙ্গী বাস্তবিকই সুন্দর; ডাক শুনিলে কিন্তু কাণে হাত চাপা দিতে ইচ্ছা হয়।

সাধারণতঃ যে সাদা রাজহাঁস (Mute Swan) আলিপুরের চিড়িয়াখানায়

বা সৌখিন লোকের সরোবরে দেখিতে পাই, তাহাদের জন্মস্থান উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাংশে। পুরাকালে ইংলণ্ডে রাজার হুকুম ব্যতীত কেহ এই জাতীয় (Cygnus olor) রাজহাঁস গৃহে পুষিতে পারিত না।

কিছুকাল আগে কালো রাজহাঁসের (Black Swan) অস্তিত্বে কেহই বিশ্বাস করিত না, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক জাতীয় রাজহাঁস (Cygnus atratus) আছে, তাহাদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গই মিশ মিশে কালো। আলীপুরের বাগানেও এই হাঁস আছে।

রাজহাঁস খুব বড় বড় দলে দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যখন হাজার হাজার রাজহাঁস একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিয়া আকাশের খুব উচ্চ প্রদেশ দিয়া উড়িয়া যায়, তখন এক একটা পাখীকে পৃথকভাবে বুঝা যায় না, সমস্ত দলটাকে একখণ্ড সাদা মেঘের মত দেখায়, কিন্তু অত দূর হইতে ইহাদের গলার আওয়াজ বেশ কাণে আসিতে থাকে।

নদী, হ্রদ অথবা জলাশয়ের ধারে কোন নির্জ্জন স্থানে, ডাল-পালা ও ঘাস-খড় জড় করিয়া ইহারা প্রকাণ্ড বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা ৬।৭টি, রং ফিকে সবুজ। বাচ্চার প্রতি রাজহাঁসের ভালবাসা খুব বেশী।

পেঙ্গুইন

পৃথিবীর দক্ষিণ-মহাসাগরের তীরে 'পেঙ্গুইন' (Penguin) বাস করে। ইহাদের ডানা নাই বলিলেই চলে, সেইজন্য উড়িতে পারে না, কিন্তু সেই নামমাত্র ডানার সাহায্যে ইহারা স্থলের উপর ও জলের মধ্যে বেশ তাড়াতাড়ি যাতায়াত করিতে পারে। স্থলে ডানা ও পায়ের সাহায্যে ইহারা ঠিক চতুষ্পদ জন্তুর মত চলে। জলে সাঁতার দিবার সময় ডানার দ্বারা নৌকার দাঁড়ের মত জল সরাইতে থাকে।

পেঙ্গুইন নানা জাতিতে বিভক্ত। ইহারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সময় সময় এক এক দলে অসংখ্য পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। পা দুইখানা একেবারে পুচ্ছের নিকটে সংলগ্ন বলিয়া ইহারা বেশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সমুদ্রের তীরে সারি সারি দাঁড়াইয়া যখন শিকারের সন্ধান অথবা বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন দূর হইতে ইহাদিগকে সজ্জিত সৈন্যশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হয়।

ইহাদের প্রধান খাদ্য মাছ। কৌশলে মাছ ধরিয়া নিজেরা খায় এবং ছানাগুলিকে খাওয়ায়। ছানাদের খাওয়াই- বার সময় ইহারা বেশ মজা করে; কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া, এমন ভাবে মাথা ও ঘাড় নাড়িতে



পেঙ্গুইন

থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, ঠিক যেন বক্তৃতা করিতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটাইয়া মুখ নীচু করিয়া হাঁ করে, আর ছানাগুলি অমনি সেই মুখের মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া আহার সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। তারপর আবার তাহাদের আগের মত বক্তৃতার ভঙ্গী চলে এবং ছানাগুলিও ঠিক আগের মত উপায়ে আহার সংগ্রহ করে। এইরূপে যতক্ষণ না ছানাদের পেট ভরিয়া উঠে, ততক্ষণ ধাড়ী পেঙ্গুইনের বক্তৃতা থামে না।

ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে ইহারা এমন হট্টগোল বাধাইয়া দেয় যে, দেখিলে মনে হয়, কি যেন একটা মহা ব্যাপারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত আছে। একবারে ইহাদের ২টি মাত্র ডিম হয়। ডিমে তা' দিবার সময় কেহ যদি তাড়া দেয়, তবে স্ত্রী-পক্ষী ডিম দুইটি দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সেই অবস্থায় পলাইতে চেষ্টা করে।

পেঙ্গুইনের ন্যায় অপর এক জাতীয় (Alcidæ) পাখী উত্তর মহাসাগরের তীরে বা উহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে বাস করে। তাহাদের নাম 'অক' (Auk)। পেঙ্গুইন যেমন একেবারেই উড়িতে পারে না, ইহারা কিন্তু তেমন নয়, কেহ কেহ অল্পবিস্তর উড়িতে পারে। তবে ইহাদের এই উড়া খুবই নামমাত্র, না উড়ারই সামিল। অক পেঙ্গুইনের মত জলের ধারে, পাথরের খোঁদলে বা বালির ভিতর ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের ডিমের সংখ্যা একটি ; কদাচিৎ দুইটি হইতে দেখা যায়। অকের ঠোঁট খুব মোটা, তিন কোণা এবং বসা ধরণের।

ইংলণ্ডের উত্তর উপকূলে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অকের এক নিকট জ্ঞাতিকে (Fratercula) দেখা যায় ; ইহাদের 'পাফিন্' (Puffin) বলে। ইহাদের ঠোঁট খুব উজ্জ্বলবর্ণের হইয়া থাকে।

পেঙ্গুইন, অক ও পাফিন্ জাতীয় পাখীদের ভিতর আরেক জাতিকে (Uriinæ) দেখা যায়। ইহাদের 'গিলমট্' (Guillemot) বলে।

ইহারা কিন্তু বেশ ভালই উড়িতে পারে এবং অন্যান্য জ্ঞাতি ভাইদের মত ইহারা আবার জলের ভিতর ডুবিয়া ডুব সাঁতার দিতেও খুব ওস্তাদ। ইহাদের ঠোঁটের ধরণ পায়রা-ঘুঘুর ন্যায়। বৎসরে ইহারা একবার একটি মাত্র খুব বড় ডিম পাড়ে। এই ডিমের রং নানা বর্ণের হইয়া থাকে, তবে বেশীর ভাগ সবুজের উপর নানা রঙের গাঢ় ছোপ থাকে।

ধাবকবর্গ

এই বর্গের পাখী মাত্রেই আকারে বড়। ইহারা নিম্নশ্রেণীর পাখী। ইহাদের নামমাত্র ডানা আছে বটে, কিন্তু তাহা উড়িবার পক্ষে যথেষ্ট নহে ; অন্যান্য পাখীদের ন্যায় ইহাদের বুকের মাঝখানের হাড় উঁচু নয়, ইহাদের বুক চ্যাপ্টা বা চ্যাটালো ধরণের। পা খুব দৃঢ়, সে জন্য বেশ তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারে ; পায়ের গড়ন অনেকটা পশুদের পায়ের মত ; লেজ খুব ছোট। ইহারা কেহই ভারতবর্ষের পাখী নহে।

এই বর্গের পাখী আজ পৃথিবীর বুক হইতে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।



পোষা উট পাখী

উট পাখী

পাখীদের মধ্যে 'উট পাখী' বা 'অষ্ট্রিচ'-এর (Ostrich) মতো এত বড় পাখী আর একটিও নাই। 'মোয়া' (Moa) নামে একজাতীয় (Dinornithes) পাখীর বিষয় শুনা গিয়াছে, আকারে অষ্ট্রিচ্ অপেক্ষাও তাহারা অনেক বড় ছিল। তাহাদের জন্মস্থান ছিল নিউজিল্যাণ্ড্ দেশ ; কিন্তু এখন মোয়ার বংশ একেবারে লোপ পাইয়াছে। মোয়া নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল। কেহ ছিল বারো ফিট উঁচু (Dinornis Maximus), কেহ বা ছিল টার্কি বা পেরুর আকারে। এখন অষ্ট্রিচ্ই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় পাখী— উঁচুতে এক একটি ৫ হাতের

কম নহে।

অষ্ট্রিচ্ (Struthio camelus) প্রধানতঃ দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকা ভিন্ন সিরিয়া, আরব এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলে দলে মরুভূমিতে চরিয়া বেড়ায়। সময় সময় ইহাদের জেব্রা ও কৃষ্ণসারাদির দলের মধ্যে মিশিয়া বিচরণ করিতেও দেখা যায়।



মোয়া

অষ্ট্রিচের ঘাড়, গলা ও উরু প্রায় পরশূন্য। পুরুষ-জাতির গায়ের অধিকাংশ পালকই কালো, কেবল ডানা ও লেজের কয়েকটি পালক সাদা; স্ত্রী-জাতির সব পালকই ঘন ধূসর। ইহাদের মাথা কতকটা উটের মাথার মত এবং পায়ের গড়নও ঠিক সেইরূপ; পায়ের ৩য় ও ৪র্থ আঙ্গুল- বড়; অপর আঙ্গুলগুলির চিহ্ন-মাত্র নাই। উটের মত ইহাদের পায়ের তলাও পিণ্ডযুক্ত। সেইজন্য মরুভূমির বালির উপর চলা-ফেরা করিতে ইহারা কষ্টবোধ করে না। উটের সহিত নানা বিষয়ে এইরূপ সাদৃশ আছে বলিয়াই, বাঙ্গলায় ইহাদিগকে 'উট পাখী' বলা হয়।

উট পাখীর শরীরে ভয়ানক জোর। সাধারণতঃ শত্রুকে ইহারা লাথি মারিয়া জখম করিয়া ফেলে। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের এক লাথিতে ঘোড়ার পিঠের মোটা হাড় পর্য্যন্ত গুঁড়া হইয়া যায়। আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় ইহারা ঠোঁটও ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ এবং স্বর ঠিক সিংহের গর্জ্জনের মত ভয়ঙ্কর।

উট পাখী উড়িতে পারে না বটে, কিন্তু মাঠের উপর এত তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারে যে, আর কোন প্রাণী ইহাদের সহিত আঁটিয়া উঠে না। দৌড়ের পাল্লায় ঘোড়াকেও ইহাদের কাছে হার মানিতে হয়। কিন্তু এক দোষে ইহারা মারা পড়ে; ছুটিবার সময় সোজাভাবে না ছুটিয়া, ক্রমাগত বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়। সেই সুযোগে শত্রু সোজাসুজি ছুটিয়া

আসিয়া সহজেই ইহাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। খুব তাড়াতাড়ি ছুটিতে হইলে, ইহারা ডানা দুইখানা নৌকার পালের মত বিস্তার করিয়া রাখে।



উট পাখী

ইহাদের হজম-শক্তি অদ্ভুত। এই সর্ব্বভুক্ পাখী খায় না, এমন জিনিস নাই। সাধারণতঃ ছোট ছোট চতুষ্পদ জন্তু, পাখী, সাপ, গিরগিটি, পোকা-মাকড় ও নানা রকম ফল ইহাদের খাদ্য হইলেও, ইহারা কাঁকড়, পাথর, হাড় ও প্রায় সকল রকম ধাতুখণ্ড অক্লেশেই খাইয়া থাকে। মরা উট পাখীর পাকস্থলী হইতে অনেক সময় টাকা-পয়সা, চাবির থোলো, ছেঁড়া জুতা, বড় বড় প্রেক্ এবং চুরুটের নল পাওয়া যায়। নিকটে জল থাকিলে, ইহারা ঘন ঘন উহা পান করে, কিন্তু জল না পাইলেও ইহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।

বালিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাসা তৈয়ারি করে এবং এক বাসায় অনেকগুলি স্ত্রী-পক্ষী একত্র ডিম পাড়িয়া থাকে। রৌদ্রের উত্তাপে ফুটিবার উপায় থাকিলে, ইহারা ডিমে তা' দেয় না; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় বাসা হইলে স্ত্রী ও পুরুষ পাখী পালাক্রমে ডিমে তা' দেয়। কখনো কখনো একটি বাসায় ২০।২৫টি ডিমও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের এক একটি ডিম সাধারণ হাঁসের ডিমের প্রায় ২০ গুণ, রং ফিকে হল্‌দে।

রিয়া

দক্ষিণ-আমেরিকা 'রিয়া'র (Rhea) জন্মস্থান। ইহাদিগকে মার্কিণ দেশীয় অষ্ট্রিচ্ বলে। মোটামুটি দেখিতে কতকটা উট পাখীর মত হইলেও, এই দুই জাতীয় পাখীর মধ্যে অমিলও নেহাৎ কম নয়। (১) উট পাখী অপেক্ষা রিয়া আকারে

অনেক ছোট ; (২) উট পাখীর পায়ে ২টি আঙ্গুল, ইহাদের পায়ে ৩টি আঙ্গুল ; (৩) উট পাখীর ডানার তুলনায় ইহাদের ডানা বড় এবং (৪) উট পাখীর মাথা, ঘাড় ও গলা প্রায় পরশূন্য, ইহাদের ঐ সকল অঙ্গ পরযুক্ত। উট পাখীর ন্যায় ইহাদের গায়ের সাধারণ পালক কালো নয়, ইহাদের সব পালকই পাটকিলে বর্ণের।



রিয়া

সর্ব্বশুদ্ধ তিন জাতীয় রিয়ার অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। এক জাতির (Rhea americana) বাস দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়ে হইতে প্যাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত। ইহারাই তিন জাতীয় রিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দ্বিতীয় জাতির (R. darwini) বাস কেবল প্যাটাগোনিয়াতেই, এবং তৃতীয়ের বাস (R. macrorhyncha) উত্তর-পূর্ব্ব ব্রেজিলে।

রিয়া কখনো স্ত্রী-পুরুষ তুইটিতে, কখনো বা তিন চারিটি স্ত্রী লইয়া, আবার কখনো বা দলে দলে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং কটা ও ধূসর। আশ-পাশের দৃশ্যের সহিত রিয়ার রং-এর মিল এত বেশী যে, খুব নিকট হইতেও ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। উট পাখীর ন্যায় ইহারাও হরিণাদির দলের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে।

আক্রান্ত হইলে ইহাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে লোপ পায়; একবার বামে, একবার দক্ষিণে— এই ভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে। শত্রুও সুবিধা পাইয়া সহজেই ইহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ছুটিবার সময় ইহারা একখানা ডানা নৌকার পালের মত ছড়াইয়া রাখে।

রিয়া বেশ সাঁতার দিতে পারে। খুব রৌদ্রের সময় ইহাদিগকে জলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। নানা রকম গাছ-গাছড়া, ঘাস ও গাছের মূল ইহাদের প্রধান খাদ্য। সময় সময় ইহারা মাছও খাইয়া থাকে।

উট পাখীর মত ইহাদের স্ত্রীজাতিও অনেকগুলি একত্র এক বাসায় ডিম

পাড়ে। ইহাদের পুরুষ পাখীই ডিমে তা' দিয়া থাকে।

এমু

'এমু'র (Emu) জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া। আকারে উট পাখীর মত তত বড় না হইলেও, এমু এই বর্গের আর সকল পাখীর চাইতে বড়। রিয়ার মত ইহাদের পায়েও ৩টি করিয়া আঙ্গুল থাকে এবং নখও খুব ধারালো। এমুর পালকের রং কটা।

ক্যাসোয়ারীর সহিত এমুর খুব সাদৃশ্য আছে। তফাৎ কেবল ক্যাসোয়ারীর মাথায় যেমন চূড়া আছে ইহাদের তাহা নাই, তাহার বদলে ছোট ছোট চুল আছে; আর ইহাদের পায়ের তলায় অদ্ভুত ধরণের থাবা থাকে।

এই পাখীও খুব তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারে এবং উট পাখীর মত শত্রুকে লাথি মারিয়া জখম করিয়া ফেলে। উট পাখী কেবল সম্মুখদিকেই লাথি চালাইতে মজবুত, ইহারা কিন্তু সম্মুখে, পিছনে ও পাশে সমান জোরে লাথি চালাইয়া থাকে।



এমু

ইহারা খোলা জায়গায় বাস করিয়া থাকে। মানুষের অত্যাচারে ইহারা এখন লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে।

মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের ডিমের রং গাঢ় নীলাভ সবুজ এবং ৯টি হইতে ১৩টি ডিম পাড়িয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে পালাক্রমে ডিমে তা' দেয় এবং উভয়ে প্রায় সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে। ছোট বেলায় এমুর ছানার গায়ে শাদা-কালোর ডোরা দেখা যায়। ঘাস ও নানা রকম ফল, মূল ও শাক-সব্জি ইহাদের প্রধান খাদ্য।

ক্যাসোয়ারী

'ক্যাসোয়ারী' (Cassowary) ৭।৮ জাতিতে বিভক্ত। মলকা, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে ও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁচুতে ইহারা প্রায় ৩ হাত। এমু অপেক্ষা ইহারা আকারে অল্প ছোট হয়।



ক্যাসোয়ারী

এই পাখীর ঘাড় অনেকটা ছোট্ এবং ঘাড়ের কিয়দংশ পরশূন্য ; মাথা শিং-এর ন্যায় পদার্থ দিয়া চূড়াযুক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ মোটা মোটা চুলের মত পালকে আচ্ছাদিত। ইহাদের গায়ের রং— পিঠেরদিক্ ঘন কটা, পেটেরদিক্ চক্‌চকে কালো।

ক্যাসোয়ারী খুব লাজুক। দৌড়িবার অসম্ভব ক্ষমতা থাকায় ইহাদের খুবই শক্ত। খুব বাচ্চা অবস্থায় ইহাদের ধরিতে পারিলে, ইহারা তখন অতি সহজেই পোষ মানে এবং পালকের হাত হইতে বিনা দ্বিধায় খাদ্য খাইয়া থাকে।

এমুর মত ইহারাও স্ত্রী-পুরুষ দুইটিতে পালাক্রমে ডিমে তা' দেয় এবং বেশ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ছানাগুলিকে চরাইয়া বেড়ায়। ঘাস, খড়, শাক-সব্‌জি এবং নানা রকম ফল ইহাদের খাদ্য। কখন কখন ছোট চতুষ্পদ জন্তু মারিয়া খাইয়া থাকে। ইহারা উট পাখীরই মতন সর্ব্বভুক্ ও হজম-শক্তি সম্পন্ন।

কিউই বা আপ্‌টারিক্স্

উড়িবার পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও ধাবক-পক্ষী মাত্রেরই ছোট ছোট ডানা আছে, কিন্তু 'কিউই বা 'আপ্‌টারিক্স্' (Kiwi বা Apteryx) একেবারেই পক্ষহীন।

ইহারা নিউজিল্যাণ্ড্-দেশবাসী। আজ পর্য্যন্ত তিন জাতীয় কিউই-এর বিষয় জানা গিয়াছে। উঁচুতে কোন কোনটি সাধারণ মুরগীর মত, কোন কোনটি বা প্রায় ২ ফুট। ইহাদের গড়ন বেশ মোটাসোটা, কিন্তু পা খুব ছোট; প্রতি পায়ে ৪টি করিয়া নখযুক্ত আঙ্গুল। তাহাদের ৩টি সম্মুখে, ১টি পিছনে। আপ্টারিক্সের ঠোঁট বেজায় লম্বা, তাহার আগায় নাকের ছিদ্র দেখা যায়।



আপ্টারিক্স্

বিপদে পড়িলে ইহারা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে; শত্রু যদি একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঠোঁট ও নখ দিয়া দুই একটা খোঁচা মারিতে ছাড়ে না।

সমস্ত দিন গর্ত্তের মধ্যে অথবা গাছের শিকড়ের নীচে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিতে ইহারা আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। পোকা, মাকড়, কীট, পতঙ্গ ইহাদের খাদ্য।

ইহারা এখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। খুব অল্প সংখ্যকই ইহাদের দেখা যায়।

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৪৪

গ্রন্থ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত অবিস্মরণীয় গ্রন্থ পশুপক্ষী সম্পর্কে :

"বঙ্গভাষায় প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক খুব অল্প। এই পুস্তকখানি আমাদের সাহিত্যের ঐ বিভাগকে পুষ্ট করিবে। ইহাতে বিদেশী বহুবিধ জানা-অজানা পশুপক্ষীর বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অনেক পশুপক্ষী দেখি অথচ তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারেই কিছু জানি না। অনেকের নাম শুনি, চেহারা পর্যন্ত দেখি নাই। সেই সব অপরিচিত বা অল্প পরিচিত পশুপক্ষীর রূপ গুণ প্রকৃতির সহিত পরিচয় সাধনের ইহা উৎকৃষ্ট উপায়। বহু চিত্রে ভূষিত চিত্রগুলিও পরিষ্কার। ইহা শিশু ও বর্ষীয়াণ সকলেরই শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ। পুরস্কার ও উপহার দিবার মতো সুন্দর বই।'

প্রবাসী : ১৩১৮